বাংলার
কৃষি সমাজের গড়ন
দ্বিতীয় ভাগ
বিনয় ভূষণ চৌধুরী
রজত কান্ত রায়
রত্নলেখা রায়
চিত্তব্রত পালিত
৯৫৪.১৪
বি চৌঃ বাং
খ.২

বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন

(দ্বিতীয় ভাগ)

বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন
(দ্বিতীয় ভাগ)

বিনয় ভূষণ চৌধুরী   রজত কান্ত রায়

রত্নলেখা রায়   চিত্তব্রত পালিত

অনুবাদ

শুভ্রা চক্রবর্তী   সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী

রুমা চট্টোপাধ্যায়

আই সি বি এস, দিল্লীর পক্ষে

কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী

কলকাতা

Binay Bhushan Chaudhuri, Rajat Kanta Ray, Ratnalekha Ray and Chittabrata Palit— *Banglar Krishi Samajer Garan (Agrarian Social Structure of Bengal),* Vol. 2

ISBN 81-7074-170-X Set
ISBN 81-7074-171-8 Vol. 2
আই সি বি এস সিরিজ: ৯

প্রকাশক
আই সি বি এস, দিল্লীর পক্ষে
কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী
২৮৬ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০১২

টাইপসেটিং
প্রজ্ঞা প্রকাশনী
২৬৩ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১২

মুদ্রক
দে'জ অফসেট
৩/২ মঠেশ্বরতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪৬

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

'বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, সুগত বসুর 'বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বাংলার কৃষি-সমাজের কাঠামোর বৈশিষ্ট্যগত বিন্যাস', আন্দ্রে বেতেই-এর 'কৃষি ব্যবস্থায় শ্রেণীর স্বরূপ : জোতদারদের কথা' এবং বিনয় ভূষণ চৌধুরীর 'বাংলা ও বিহারে কৃষক উৎখাতের ইতিহাস—১৮৮৫-১৯৪৭ : চাষীর ভূমিস্বত্ব বদল প্রশ্নটির পুনরুত্থান'। এই লেখাগুলিতে গ্রাম বাংলার কৃষি ব্যবস্থার বিশেষ কতকগুলি সমস্যা আলোচিত হয়েছে, যেমন কৃষি ব্যবস্থার প্রকারভেদ, শ্রেণী সম্পর্ক, কৃষক উৎখাতের প্রশ্ন ইত্যাদি। এই বিষয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রয়েছে, নতুন তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। এই লেখাগুলির সঙ্গে পরিচয় না থাকলে, বাংলার কৃষি সমাজ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া কঠিন। তাই দ্বিতীয় খণ্ডে আরো কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হল যেগুলির সাথে প্রথম খণ্ডের আলোচনার যোগ রয়েছে, যেমন জোতদার-বর্গাদারের সম্পর্ক এবং গ্রাম বাংলায় জমিদারদের প্রভাব। এছাড়া, অন্য কয়েকটি বিষয়ও আলোচিত হয়েছে যেমন, উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে শ্রেণী সম্পর্কের যোগ, বিশেষ করে জমিদার, জোতদার বর্গাদারদের সাথে উৎপাদন ব্যবস্থার সম্পর্ক এবং গ্রাম বাংলায় ক্ষমতা কাঠামোর স্বরূপ।

বিনয় ভূষণ চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধে মূলত তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, গ্রামীণ বাংলার ক্ষমতা কাঠামোর মুখ্য উপাদান ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগুলির বিবর্তন এবং পূর্ব ভারতের কৃষি উৎপাদনে বিশেষ কতগুলি লক্ষ্যণীয় বিষয়। এই সব আলোচনা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-র পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে। বাংলার কৃষি ব্যবস্থায় জমিদার ও জোতদার শ্রেণীর প্রভাব প্রসঙ্গে বিতর্ক রয়েছে। বিনয় ভূষণ চৌধুরীর মতে, বাংলার কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় জমিদার শ্রেণীর প্রভাবকে উপেক্ষা করলে ভুল করা হবে। জমিদার শ্রেণী অধিক মুনাফার আশায় কখনো কখনো কৃষিকাজে মূলধন বিনিয়োগ করেছে। উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও এটা সম্ভব। বৃটিশ আমলে বাংলার কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় জোতদারদের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে জমিদারদের প্রভাব হ্রাসের সম্পর্কের কথা অনেকে উল্লেখ করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দর মাঝামাঝি বিশেষ কতগুলি কারণে অনেক জেলায় জমিদারদের প্রভাব কমে আসে। কিন্তু এর আসল কারণ হল বিভিন্ন আইন প্রচলন, যেমন ১৮৫৯ সালের প্রজাস্বত্ব আইন এবং কৃষকদের অধিকার সম্পর্কে এক নতুন চেতনার উন্মেষ। কয়েকটি জেলায় অবশ্য জোতদারদের প্রভাব ব্রিটিশ শাসনের গোড়া থেকেই রয়ে গিয়েছে, যেমন, জলপাইগুড়ি, ২৪-পরগণা, খুলনা, বাখরগঞ্জ। কৃষি ব্যবস্থায় জোতদারদের প্রভাব বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হল, উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে এদের সরাসরি সম্পর্ক। কিন্তু শতকরা কত ভাগ জমি এই জোতদার শ্রেণীর হাতে ছিল? আরোও একটা প্রশ্ন হল, জোতদার-বর্গাদার অথবা জোতদার-আধিয়ার ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে কতটুকু সফল

হয়েছে? জোতদারদের শোষণের যাঁতাকলে পরে বর্গাদার, আধিয়ারদের উৎপাদন ক্ষমতা কি পিছিয়ে পড়ে নি? জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ফসলের মূল্যের ওঠানামা ও নানা আইনি ব্যবস্থার প্রচলন কি উৎপাদন ও শ্রেণী সম্পর্ককে প্রভাবিত করে নি? এই ধরণের নানান প্রশ্নের আলোচনা করেছেন বিনয় ভূষণ চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধে।

রজত কান্ত রায় ও রত্নলেখা রায়-এর মতে ব্রিটিশ আমলে বাংলার কৃষি ব্যবস্থায়, বিশেষ করে শ্রেণী সম্পর্ক ও উৎপাদন ব্যবস্থায় খুব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। এর অনেক কারণ আছে। ব্রিটিশ প্রচলিত এবং নিয়ন্ত্রিত কৃষি পণ্য ও শস্যের বাণিজ্য মধ্য কৃষকদের ধনী কৃষকে পরিবর্তন করে নি। উদাহরণ হিসেবে পাট-চাষের ও বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পণ্য শস্যের যেটুকু বাণিজ্যিকরণ হয়েছে, তা কৃষি ব্যবস্থায় ধনতন্ত্র বিকাশে সাহায্য করে নি। এছাড়া, জোতদার প্রথা যখন ঋণ ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে যায়, তখন উৎপাদন ব্যবস্থা সীমিত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় কৃষি ব্যবস্থায় খুব বড় ধরণের পরিবর্তন আসা কঠিন ছিল। 'জোতদারদের পশ্চাদপসারণ' প্রবন্ধে রজত কান্ত রায় গ্রাম বাংলায় জমিদার, জোতদার শ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যে বিতর্ক রয়েছে, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

গ্রাম বাংলার জোতদারদের প্রভাব ভালো করে বুঝতে হলে জেলা ভিত্তিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে চিত্তব্রত পালিত ১৮০০ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত দিনাজপুর জেলায় জোতদারদের কথা লিখেছেন। তাঁর মতে পুরো উনিশ শতক জুড়ে এই জেলার কৃষি ব্যবস্থায় জোতদারদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়ে গিয়েছে। শস্য বাণিজ্য ও টাকা ঋণ দেওয়ার মাধ্যমে তারা কৃষি ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ এবং নিজেদের অবস্থাকে সংহত করেছিল। জমিদারদের তুলনায় কৃষিতে তাদের লাভ ছিল অনেক বেশি। বিশ শতকের গোড়াতেও জোতদারদের প্রভাব ছিল অটুট। জমিদার ও জোতদারদের প্রভাব প্রসঙ্গে আরোও অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ রয়েছে, যেগুলি এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হল না।

এই প্রবন্ধগুলি অনুবাদ করেছেন, শুভ্রা চক্রবর্তী, সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী ও রুমা চট্টোপাধ্যায়। রজত কান্ত রায় ও রত্নলেখা রায়ের প্রবন্ধ দুটির তর্জমা প্রকাশের অনুমতি দিয়েছে *Indian Economic and Social History Review*। বিনয় ভূষণ চৌধুরী ও চিত্তব্রত পালিত-এর লেখা দুটির অনুবাদ প্রকাশের অনুমতি দিয়েছে যথাক্রমে Oxford University Press, নিউ দিল্লী ও Progressive Publishers, কলকাতা। অনুবাদকদের সাহায্য করেছেন রজত কান্ত রায়, বিনয় ভূষণ চৌধুরী, চিত্তব্রত পালিত। বইটি প্রকাশের জন্য আর্থিক অনুদান দিয়েছে ICSSR-এর Indo-Dutch Programme on Alternatives in Development কর্তৃপক্ষ। বইটি সম্পাদনায় সাহায্য করেছেন শুভেন্দু দাশগুপ্ত। গ্রন্থটি আই.সি.বি.এস দিল্লীর পক্ষে প্রকাশনা ও পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছে কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী। এদের সকলকে অশেষ ধন্যবাদ।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৯৬

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

১

পূর্বভারতে গ্রামীণ ক্ষমতা-কাঠামো ও কৃষি উৎপাদন : ১৮৫৭-১৯৪৭

বিনয় ভূষণ চৌধুরী

কৃষি উৎপাদনে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর[১] সঠিক ভূমিকা নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে ইউরোপে এই বিষয়ে যে বিতর্ক হয়েছে, তার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় প্রাক-শিল্প যুগের অর্থনীতিতে দীর্ঘ মেয়াদি পরিবর্তনে কৃষি কাঠামোর ভূমিকা।[২] কয়েকজন ঐতিহাসিকের মতে এই পরিবর্তনের মূল কারণ সমসাময়িক কৃষি কাঠামোর মধ্যেই নিহিত ছিল। অন্য অনেকে অবশ্য বাজার ও জনতত্ত্বের ভূমিকাকে এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী করেন। ভারতে এই বিতর্কটি কৃষি উন্নয়নে ভূমি সংস্কারের অবদানের প্রশ্নটির সঙ্গে জড়িত। অনেকেই মনে করেন, কৃষি উন্নয়নে এই সংস্কার প্রক্রিয়ার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। যেমন, ১৭৯৩ থেকে বাংলা ও বিহারের কৃষি ব্যবস্থা যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, ১৯৪০ সালে বেঙ্গল ল্যাণ্ড রেভিনিউ কমিশন[৩] এই যুক্তির ভিত্তিতেই তা অবসানের জন্য সুপারিশ করে। কমিশনের মতে, স্বাধীনতা লাভের আগে বাংলার কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের জন্য জমিতে ভূস্বামীদের একচেটিয়া অধিকারের অবসান ঘটানো এবং কৃষি উদ্বৃত্তের পুনর্বিনিয়োগের প্রয়োজন ছিল (ইসলাম, ১৯৭৮ : ২০৩)। অনুন্নত দেশগুলিতে জমি বন্টনের বৈষম্যই যে কৃষি উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়, এ কথা অনেকেই স্বীকার করেন না (শুলৎস্, ১৯৬৪)। তাদের ধারণায় এই ধরণের কৃষি ব্যবস্থায় সমস্ত বাজারের কাঠামোই প্রায় ত্রুটিহীন ও উৎপাদনের উপাদান বন্টন সুষ্ঠ হয়ে থাকে এবং সেখানে বাড়তি বা বেকার চাষী থাকে না। এই মত অনুযায়ী, চাষীরা নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করলেই কৃষি উন্নয়ন সম্ভব। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের উত্তরপ্রদেশ নিয়ে একটি গবেষণায় ভূমি সংস্কারই কৃষি উন্নয়নের প্রধান 'কারণ' — এই মতটির বিরোধিতা করা হয়েছে[৪] (নীল, ১৯৬২ : ৪ এবং ১৫৬)। এই লেখাটিতে ভূমি সংস্কারের পক্ষের যুক্তির পূর্বানুমানগুলি সম্পর্কেই সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। সুষ্ঠ কৃষি-সংগঠন উন্নয়নের সহায়ক একথা স্বীকার করে নিয়েও তিনি সিদ্ধান্ত টানেন : "তার থেকে একথা প্রমাণ হয় না যে, জমিদাররা থাকার ফলেই, কিংবা ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় কতগুলি বিশেষ প্রণালী গৃহীত হয়েছিল বলেই এই অঞ্চলগুলি অনুন্নত রয়ে গিয়েছে। একথাও প্রমাণ হয় না যে, জমিদারি প্রথার অবসান ঘটলেই উন্নতির বাধাগুলি দূর হতো।"

এই বক্তব্যটি ব্রিটিশ শাসনকালে পূর্ব ভারতের, বিশেষ করে যে সব জায়গা চিরস্থায়ী

বন্দোবস্তের আওতায় ছিল, বাংলা ও বিহার, সেখানে কতখানি প্রযোজ্য, তা এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে।[৫] বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কে দুটি বিষয় প্রথমেই পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত। উৎপাদন সংক্রান্ত যথেষ্ট তথ্য আমাদের হাতে নেই। বিশেষ করে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর সঙ্গে কৃষি উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ের সম্পর্ক বিষয়ক তথ্য। আমরা এই আলোচনা প্রধানত গ্রামীণ ক্ষমতাগোষ্ঠীর সঙ্গে চাষাবাদের আয়তনের পরিবর্তনের সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব। চাষের জমির সম্প্রসারণ যে কৃষি উদ্যোগের সূচক, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। চাষের জমির সম্প্রসারণ নিয়ে সন্তোষজনক তথ্য পাওয়া যায়।

এই প্রবন্ধটি তিনটি অংশে বিভক্ত। এক, গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর প্রধান উপাদানগুলির এবং তাদের বিবর্তন বিশ্লেষণ করা, দুই, পূর্বভারতের কৃষি উৎপাদনের প্রধান বাধাগুলির ইঙ্গিত দেওয়া, তিন, ক্ষমতা কাঠামোর সঙ্গে "এই ধারাগুলি" কতখানি যুক্ত ছিল তার আলোচনা করা।

১

এই প্রবন্ধে আমরা মূলতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে সব অঞ্চলে ছিল, সেখানকার কৃষি সংগঠন নিয়েই আলোচনা করব। ইদানীং এ বিষয়ে আমাদের ধারণা অনেক পাল্টেছে। পুরনো পন্থীরা জমিদারদের ক্ষমতার উপর জোর দিয়েছিল।[৬] এর পিছনে ছিল জমিদারদের বিরাট ভূমিকা। পূর্বভারতের আর্থিক অবস্থার সম্প্রসারণ নির্ণয় করা, বিশেষ করে জমিদার ও প্রজার মধ্যে পরবর্তী দু'শ' বছর ধরে স্বত্বাধিকারের সম্পর্ক কতখানি বজায় ছিল তা এই কৃষি সংগঠনের প্রেক্ষিতেই বিচার করে দেখা হয়[৭] (ঘোষ অ্যাণ্ড ডাট, ১৯৭৭, ১ম অধ্যায়)। এই বক্তব্যে দুটি পরিবর্তনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রথমতঃ কৃষিতে জমিদারদের ক্ষমতা সম্পর্কে যে অনিশ্চয়তা ছিল তা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কেটে যায়। দ্বিতীয়তঃ এ সময় থেকে সরকার জমিদারদের আর কেবল খাজনা আদায়ের যন্ত্র (যাদের ইচ্ছে করলে রাখা বা তাড়িয়ে দেওয়া যায়) বলে গণ্য করত না। ১৭৯৩-এর বন্দোবস্তের পর জমিতে এদের অধিকার জন্মায়। ভূ-সম্পত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই খাজনা আদায়ের পরিমাণের একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করা হয়। সরকারি নিলামে যে সব ক্রেতা জমি কিনত, তাদের সঙ্গে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী মালিকানার চুক্তি করা হত।[৮] এদের মধ্যে বেশির ভাগই শহুরে ক্রেতা, যারা নিজেদের পয়সা উশুল করতে চাইত। জমিদারদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রজাদের জমিতে স্বত্বাধিকার হ্রাস পেতে থাকে এবং তারা নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। খাজনার পরিমাণ ক্রমশই বেড়ে যেতে থাকে এবং জমিদার কৃষির উন্নতি সাধনে ব্যয় বরাদ্দ বন্ধ করে দিতে থাকে। চাষীর অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হয়ে ওঠে।

আরেক দল ঐতিহাসিক মনে করেন, প্রজাস্বত্বের বাণিজ্যকরণের ফলে জমিদার ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে। বেশি খাজনা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক মধ্যবর্তী সম্প্রদায় জমিদারির অংশ বিশেষ সাময়িক স্বত্বাধীনে নিয়ে নেয়।[৯] এর ফলে চাষীর উপর খাজনার চাপ বাড়ে, কারণ

বাংলায় এই মধ্যবর্তী খাজনা আদায়কারীর (ইজারাদার) চাহিদা ও সংখ্যা যে দ্রুত হারে বেড়েছিল সে তুলনায় কৃষি উৎপাদন যথেষ্ট বাড়ে নি।

গ্রাম-সমাজের অধিপতি জমিদারের[১০] চেয়েও ধনবান আরেক শ্রেণীকে গ্রামের ক্ষমতা কাঠামোর প্রধান হিসেবে দেখা হয়। এ বিষয়ে দুটি বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ, ১৭৯৩-এর পর গ্রামাঞ্চলে জমিদারদের ক্ষমতা প্রভূত বেড়ে গিয়েছিল। একই সঙ্গে গ্রাম-সমাজে এক নতুন বিত্তবান শ্রেণী ধীরে ধীরে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। বিদগ্ধজনেরা মনে করেন যে, বিংশ শতাব্দর প্রথম দিকে গ্রাম-সমাজের শ্রেণী দ্বন্দ্বের কেন্দ্র পুরনো দিনের জমিদার-প্রজার থেকে আধুনিক কালের জমিদার জোতদার বনাম আধিয়ার ভাগচাষীর দ্বন্দ্বে সরে যায়[১১] (ঘোষ অ্যাণ্ড ডাট্, ১৯৭৭: ১৩৩)। দ্বিতীয়তঃ যারা মনে করেন, জমির মালিকানা থেকে গ্রামীণ ক্ষমতা জন্মায় এবং তা কৃষি কাঠামোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাদের মতে জমিদার কোন কালেই কৃষি সমাজে ক্ষমতার অধিকারী ছিল না (রে অ্যাণ্ড রে, ম্যাস, ১৯৭৫: ১; রে, ১৯৮০: ২, ৩ ও ১০ অধ্যায়)। এদের যুক্তি অনুযায়ী বাংলার জমিদারি ইংরেজদের তালুকের মত উৎপাদনের একমাত্র উৎস। পুরো গ্রামই এর সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং নিজ্জোট ও নানকার জমি ছাড়া জমিদার আর অন্য জমির মালিক ছিল না।[১২] জমিদারি বলতে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা বোঝাত, জমিদারের একমাত্র কাজ জমির রাজস্ব ও অন্যান্য কর নিয়ে সরকারের ঘরে জমা দেওয়া। গ্রাম গঞ্জের আসল ক্ষমতা ছিল এক বিত্তবান প্রজা শ্রেণীর[১৩] হাতে, যাদের জোতদার বলা হয়।[১৪] এরা এক সময়ে জমিদারদের অনুগত প্রজা ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এরা ক্ষমতায় এসেছে। গ্রাম-সমাজে এরাই জমির আসল মালিক এবং এদের হাতেই জমি ও মজুর দুই-ই। এই জোতদাররা বেশির ভাগই আসত মান্যগণ্য চাষী সম্প্রদায় থেকে। পশ্চিমবঙ্গে যেমন সদ্গোপ, আগুড়ি এবং কৈবর্ত; তেমনি পূর্ববঙ্গের শেখ মুসলমান।[১৫] এদের উৎপত্তিকাল প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে, মুঘল বাংলায় উৎপত্তির কারণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও আর্থিক খাজনার বৃদ্ধি। গ্রাম-সমাজে কিছু লোকের হাতে অনেক টাকা জমে যায়, যারা গ্রামে তেজারতি, পোদ্দারি ও ধানচালের কারবার শুরু করে। ব্রিটিশ শাসন কালের প্রথম যুগে যে সব উন্নতি হয়েছিল তার থেকে এরা নানা সুবিধা লাভ করে। দুটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্যণীয়। এক, ১৭৬০-এর পর কোম্পানি জমি ও খাজনা সংক্রান্ত যে সব সংস্কার করেছিল, এবং দুই, ১৭৬৯-৭০-এর দুর্ভিক্ষ। প্রথম নীতির ফলে হঠাৎ করে খাজনার চাহিদা বেড়ে যায়। অনেক পুরনো জমিদার নিলামদারের কাছে সাময়িকভাবে জমি বেচে দিতে বাধ্য হয়। এই সব নিলামদাররা বেশিরভাগই গ্রাম-সমাজে বহিরাগত। এরা আসায় একদিকে যেমন জমিদারের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি ক্ষমতালোভী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী মণ্ডল ও বড় চাষীদের অপ্রত্যাশিত লাভ হয়েছিল। কারণ, এদের ছাড়া এই ইজারাদাররা রাজস্ব আদায় করতে পারত না। শঠতা করে এরা লাভবান হত। গ্রামের সর্বোৎকৃষ্ট জমি এরা কব্জা করত। দুর্ভিক্ষও এদের একভাবে সাহায্য করেছিল। হাতে পুঁজি থাকায় এরা সহজেই পতিত জমি উদ্ধার করে আবাদ বসাতে

পারত। দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা বেড়ে যেত বলে, জমিদাররা স্বভাবতই এই পতিত জমি উদ্ধার করতে চাইত। তবে জমিদারদের চেয়ে জোতদাররাই এই কাজে বেশি সফল হত। স্থানীয় অর্থনীতির উপর তাদের আধিপত্য যেত বেড়ে। তারা সহজেই নিজেদের জমি বাড়িয়ে নিতে পারত। জমিহারা চাষীদের জীবন ধারণের জন্য জোতদারদের কাছ থেকে সাহায্য প্রয়োজন হত। ১৭৯৩-এর পর ক্ষতিগ্রস্ত জমিদাররা যখন নতুন আইনের ফলে তাদের আগের খাজনা আদায়ের ক্ষমতা ফিরে পায়, এবং একই সঙ্গে চাষাবাদের পরিমাণও বেড়ে যায়, তখন জোতদাররা কিঞ্চিত অসুবিধায় পড়ে। জমিদারের মনে হয়, এই বাড়ন্ত রায়ত গোষ্ঠীকে বশে না এনে কোন ভাবেই নিজের ক্ষমতা দাবি করা সমীচিন হবে না। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত তখন থেকেই।

অনেকেই মনে করেন এই দুই শ্রেণীর মধ্যে বিরোধের চেয়ে সহযোগিতা অনেক বেশি ছিল। কৌশলে খাজনা বাড়াবার সময় জমিদাররা জোতদারদের সাহায্য নিত। এই কাজে জোতদারের বিশেষ উৎসাহ ছিল, কারণ এতে তারা নিজেরাও লাভবান হত। ফলে তারা জমিদারদের অনুগত থাকত। গ্রামের শাসন নিয়ন্ত্রণেও তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কোন জায়গায় এই শাসনতন্ত্রে ভাঙন ধরলে বলা হত স্থানীয় ভূ-স্বামীর সঙ্গে গ্রামের মণ্ডলের সহযোগিতার অভাব দেখা দিয়েছে। ছোট চাষী, ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুরদের শোষণের ফলে উনবিংশ শতাব্দের প্রথমার্দ্ধে বাংলার কৃষি জগতে যে বিক্ষোভ দেখা যেত তা প্রধানত এই দুই শ্রেণী যৌথভাবে দমন করে রেখেছিল। ফলে সেই সময়ে গ্রামাঞ্চলে এক ধরণের শান্তি বজায় ছিল।

গ্রাম বাংলায় প্রধানত জোতদারের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্রিটিশ শাসনকালের দুই শতাব্দ জুড়ে বাংলার কৃষি জগতের প্রধান সম্পর্ক ছিল আধাসামন্ততান্ত্রিক, যার বৈশিষ্ট্য ছোট চাষ জমি, ক্ষেতমজুর দিয়ে চাষ এবং জোতদার ও আধিয়ারের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক। যে সব জোতদার আবার তেজারতি ব্যবসা করত, তাদের সঙ্গে আধিয়াররা আরো বেশি দায়বদ্ধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ত, (রায়, ১৯৭৩: ১২১)।

এই আলোচনা থেকে দুটি বিষয় পরিস্কার হয়ে যায়। এক, কৃষি অর্থনীতি ও ক্ষমতা কাঠামোয় জমিদারদের তুলনামূলক কম আধিপত্য, এবং দুই, জোতদারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। জমিদারি বলতে নিছক উৎপাদন কেন্দ্র বোঝায় না। এর গঠন থেকেই তা প্রমাণিত। অনেক সময় দেখা গেছে জমিদারি বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ইতস্তত গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে রয়েছে। এর কারণ কী ভাবে এই জমিদারি তৈরি হয়েছে তার উপর নির্ভরশীল। গ্রামের বসতি স্থাপনের উপর বেশিরভাগ জমিদারেরই কোন হাত ছিল না। তারা এমন কি সরকারের অনুমতি ছাড়াই[১৬] ধীরে ধীরে এই বাসিন্দাদের কাছ থেকে খাজনা ও অন্যান্য কর নেওয়া শুরু করে দেয় এবং এদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে।

জমিদারি উৎপাদনের কেন্দ্র বিন্দু না হলেও এমন নয় যে, কৃষি অর্থনীতিতে জমিদারদের কোনো ভূমিকা ছিল না। চষী কিভাবে তার চষের পরিকল্পনা করবে তা জমিদার বলে

দিত না। তবে গ্রামীণ অর্থনীতির অনেকটাই তাদের হাতে ছিল। যেমন, পতিত জমি উদ্ধার করে তা চাষের উপযোগী করে তোলা। অনেক জমিদারির গোড়াপত্তন হয় পতিত জমিতে আবাদ বসাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। এই সব অনাবাদী এলাকায় জমিদার কি ভাবে তার ক্ষমতা বিস্তার করত, তা দিয়েই তার কতটা অধিকার তার বিচার হত। এই কাজে জমিদার নিজে হাত লাগাত না, বেশির ভাগ সময়ই সে স্থানীয় কোন উদ্যোগীকে দিয়ে কাজ করাত।[১৭] প্রয়োজনমত টাকাও খরচ করত। যে সব জায়গায় জমিদার জমি পুনরুদ্ধারের পর বাসিন্দাদের আইনত অধিকার বা সঠিক খাজনার পরিমাণ ঠিক করে না দিত, সেখানে পরে যখন জমির দাম অনেক বেড়ে যেত, তখন বাসিন্দাদের মধ্যে ঝগড়া লেগে যেত।

কিছু জায়গায় এইসব ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে জমিদারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বাংলায় পুরুষানুক্রমে জমিদাররা সেচ ও বাঁধ তৈরির কাজ তদারকি করত। দক্ষিণ বিহারের যে সব জায়গায় চাষ প্রধানত সেচ নির্ভরশীল, সেখানে জমিদাররা বাঁধ তৈরির প্রাথমিক খরচপত্র বহন করত। আবার পরে তার রক্ষণাবেক্ষণও করত। যেসব জায়গায় বাঁধ মেরামতের প্রয়োজন হত, সেখানে স্থানীয় গ্রামবাসীরা বিনা পারিশ্রমিকে মেরামত করে দিত। সেচ নির্ভর অঞ্চলের গ্রামে চাষের কাজে জল সরবরাহ করা জমিদারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ত। এই জল বন্টনের কাজে অবহেলা দেখালেই চাষীরা সংঘর্ষে যেত। তবে এই কাজে জমিদারের লাভ কিছু কম হত না। এই সব অঞ্চলের উৎপাদিত শস্যের অর্দ্ধেক জমিদারের প্রাপ্য ছিল।[১৮]

এত সব সত্ত্বেও জোতদার যে ভাবে আধিয়ার বা ভাগচাষীদের উপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হত, জমিদাররা তা পারত না। ভাগচাষীর জমি ও শ্রমের উপর জোতদারদের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। যেহেতু জমিদার সরাসরি চাষের কাজ পরিচালনা করত না, সেহেতু তার এই অধিকার ছিল না।

গ্রামের আভ্যন্তরীণ আর্থনীতিক গঠন অনুযায়ী উদ্বৃত্ত উৎপাদন বন্টন করা হত। যেমন, জমিদারের খাজনা দেবার আগেই ফসলের একাংশ সরিয়ে রাখা হত গ্রামের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য, যাকে ছাড়া গ্রামের লোকের চলে না। এছাড়া কিছু চাষীর নিজের জমি ছিল। চাষবাসের প্রণালীও ছিল নিজস্ব। এর সঙ্গে জমিদারের বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। এমনও দেখা গিয়েছে যে যারা বসতি স্থাপন করেছিল তারা তো নানা উপরি অধিকার ভোগ করতই, এমন কি তাদের বংশধরেরাও এই সব অধিকার কোনো কারণ ছাড়াই ভোগ করত। কিছু উচ্চবর্ণ চাষীও কর আদায় করত। মুঘল শাসনকালে জমিদাররা এইসব নিয়মনীতি কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারত না। বলতে গেলে নিজেদের স্বার্থেই তা করত না। জমিদারি থেকে শুধু যে আর্থিক আয় হত তা নয়, এটা ছিল ক্ষমতারও উৎস। চাষীকে অধীনে রাখতে পারলে জমিদারেরও সুবিধা হত। তার আয় ও সম্মান দুই বজায় থাকত।

জমিদারি যে উৎপাদনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল না এ বিষয়টাতে বেশি জোর দেবার প্রয়োজন এই আলোচনায় নেই। জমির উপর সরাসরি স্বত্ব থাকাটা কৃষি জগতের ক্ষমতার উৎস

নয়, এর উপর কৃষি কাঠামোও নির্ভর করত না। জমির উপর স্বত্ব না থেকেও জমিদার তার অধিকার জারি করে থাকত। খাজনা আদায়ের সঙ্গে সরাসরি জমির মালিকানার তফাৎ থাকলেও জমিদারের হাতে অঢেল ক্ষমতা ছিল। মুঘল সাম্রাজ্য এই জমিদারির খাজনার উপর নির্ভরশীল ছিল বলে জমিদারদের যথেষ্ট ক্ষমতা দিত। জমির খাজনা থেকে আয়ের উপর রাষ্ট্রের দাবি, গ্রামীণ সম্প্রদায়ের বা কৃষক সমাজের যে কোন অধিকারের থেকে বেশি বলে ধরা হত।

সরকার কিংবা তার স্থানীয় প্রতিনিধি, যেমন জমিদার, প্রজাকে গ্রাম ছেড়ে কোথাও পালাতে দিত না। কারণ, তাতে রাজস্ব কমে যাবার সম্ভাবনা থাকত। জমিদার এই ক্ষমতা শুধু খাজনা আদায়কারী হিসেবে অর্জন করত না। এই ক্ষমতা অর্জনের পিছনে বংশ পরম্পরায় জমিদার হওয়া, স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায়, বিশেষতঃ আইন-শৃঙ্খলা বলবৎ করায় বিশেষ ভূমিকা পালন করা এবং বর্ণ ও জাত ভিত্তিক আত্মীয়তা — এই সবই কারণ ছিল। পরে অবশ্য দেখা গিয়েছে, জমিদার প্রজার উৎপাদনের কতটা উদ্বৃত্ত আদায় করতে সক্ষম, এ উপরও তার ক্ষমতা নির্ভর করত। সরকারের হয়ে সে যে খাজনা আদায় করত, তা তার মোট আদায়ের একাংশ মাত্র। একটা বড় অংশ সে খাজনা বাড়িয়ে দিয়ে এবং বেআইনি কর চাপিয়ে চাষীর কাছ থেকে আদায় করত। এইসব উপকর বসানর পিছনে বেশির ভাগ সময়েই কোন আর্থনীতিক যুক্তি থাকত না, জমিদার তার সামাজিক প্রতিপত্তির বলে তা বসাত।[১৯] এই জুলুমের ব্যাপারে রাষ্ট্র কদাচিৎ মাথা ঘামাত। চাষীরা এসব কাজকে অত্যাচার মনে করলেও তাদের বিশেষ কিছু করার ছিল না। অনেক সময় তারা অন্য জমিদারিতে পালিয়ে যেত। জমিদার যে চাষীর উদ্বৃত্তের উপর ভাগ বসাতে পারত, তার থেকেই তার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যেত। এই সময় যেহেতু আইনত চাষীর জমি বিক্রি তেমন চালু হয় নি, এবং কৃষি জমির দামও তেমন লাভজনক ছিল না, তাই জমিদাররা শোষণের এক অভিনব উপায় বার করে বিতর্কিত খাজনা ও বকেয়া আদায় করার জন্য।[২০] চাষী বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত এক শাসন কাঠামো মারফৎ শোষিত হতে থাকে, যা পুরোপুরি জমিদারের নিয়ন্ত্রণে ছিল না।

ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে জমিদারদের ক্ষমতা সাময়িক হ্রাস পেয়েছিল। এর অর্থ জমিদারদের পরিবর্তে অন্য কর্তৃত্ব — জোতদার। এরা প্রধান সুবিধাভোগী ছিল না। যে ভাবে জমিদারদের ক্ষমতা অপসারণ করা হয়েছিল, তার থেকেই একথা প্রমাণিত হয়। এর প্রধান কারণ, নতুন সরকারের রাজস্ব ব্যবস্থা। সরকার বুঝতে পেরেছিল যে, কোনরকম নতুন রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করলে পুরনো জমিদাররা তা নস্যাৎ করে দেবার চেষ্টা করবে। তাই তারা রাজস্ব আদায় করতে নতুন লোক নিয়োগ করেছিল।[২১] সরকারের এতে সামান্যই উপকার হয়। অন্য দিকে জমিদারদের ক্ষমতা কমে যায়। ১৭৬৯-৭০-এর দুর্ভিক্ষের পরে জমিদারিতে আর্থিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কারণ দুর্ভিক্ষের বিপর্যয়ের পরেও সরকার খাজনা কমাতে রাজি ছিল না। এর ফলে জমিদারদের দুর্গতি দেখা দেয়। জমিদারির আমলাদের

বিশ্বাসহীনতার কারণেও জমিদারের ক্ষমতা আরো কমে যায়। এই বিশ্বাসঘাতকতা নতুন কিছু নয়। যা নতুন তা হল, এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যেখানে তাদের অধস্তন আমলারা চেষ্টা চরিত্র করে সবরকম দুষ্কর্ম থেকে রেহাই পেত। এই সময়ে জমিদাররা যে দুর্দশায় পড়েছিল, তাতে নানাভাবে তাদের ক্ষমতা হানি হয় এবং তাদের আর্থিক কষ্টে পড়তে হয় — এসবই চক্রান্তকারী আমলাদের কাছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মনে হয়। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা নানাভাবে জমিদারদের ঠকাতে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে।[২২] আর্থিক পুনর্গঠনের নামে জমিদারির কাজে থেকে থেকেই সরকারের হস্তক্ষেপ এবং সাময়িকভাবে জমিদারদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ — এসবই জমিদারের আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা ফিরে পাবার পরও, তার অস্থিতিশীলতার কারণ হিসেবে দেখা যায়। এই হস্তক্ষেপের ফলে জমিদারিতে ঋণঝাঁটি অনেক বেড়ে যায়, আনুগত্যের অদল বদল দেখা যায় এবং সামগ্রীক ক্ষমতার বিভাজন ঘটে।[২৩] রংপুর, দিনাজপুর ও মালদা অঞ্চলে জমিদারকে কোম্পানির এজেন্ট ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হয়। এই ইংরেজ ব্যবসায়ী তুলো ও রেশমের চাষ করাত। এই সব চাষ ছাড়াও অন্য সময় চাষীরা ফসল বুনত। তাই তারা এক দিকে যেমন কোম্পানির চাষী, অন্যদিকে আবার জমিদারের প্রজা। বিবাদ তখনই লাগত, যখন এই চাষীরা খাজনা বেড়ে গেলে কোম্পানির দ্বারস্থ হত এবং কোম্পানি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এদের আশ্রয় দিত। অনেক সময় দেখা গিয়েছে, স্থানীয় ইংরেজ রেজিমেন্টের উপস্থিতিতে প্রজারা জমিদারের নানা কাজের প্রতিবাদ করছে, যা এমনিতে হয়ত তারা উপেক্ষা করত।

জমিদাররা তাড়াতাড়িই তাদের আগের ক্ষমতা ফিরে পেয়েছিল। একথা সত্যি যে, ১৭৯৩-এর পর যে সব জমিদার সময়ে খাজনা দিতে পারেনি, সরকার কঠোর হাতে তাদের জমিদারি নিলাম করে দেয়। এর ফলে অনেক পুরনো জমিদারের সর্বনাশ হয়। তবে মোটের উপর এর পর থেকে জমিদারি ব্যবস্থা স্থায়ী হয়। প্রথম দিকে নিলামে জমিদারি কেনা খুব লাভজনক না হলেও[২৪] পরে আর তা ছিল না। যাদের টাকা ছিল তারা বুঝতে পারে নিরাপত্তা ও লাভের কারণে এই খাতে বিনিয়োগ খুব আশাপ্রদ। সরকার ভূসম্পত্তিতে বিনিয়োগকে আকর্ষণীয় করার জন্য প্রজাদের উপর জমিদারদের কর্তৃত্বের ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে দেয়। কারণ, জমিদাররা থেকে থেকেই দাবি করত, খাজনা আদায়ের নিরাপত্তার জন্য এই ক্ষমতা প্রয়োজন।[২৫] খাজনার আয় পড়ে যাক তা সরকার মোটেই চাইত না, তাই তারা জমিদারের এই দাবি মেনে নিয়েছিল। জমিদারদের খাজনা দেবার অসুবিধার কারণ বোঝার জন্য ১৭৯৪ থেকে ১৭৯৮-এর মধ্যে যে সমস্ত সরকারি তদন্ত হয়েছে, আশ্চর্যের কথা, তাতে দেখা গিয়েছে, জমিদাররা প্রজার উপর কোন নতুন দমন নীতি প্রয়োগ করে নি। একদল মধ্যবর্তী বা দালাল শ্রেণীর বিত্তবান চাষী গোষ্ঠীর বিশ্বাসহীনতাই এই অসুবিধার কারণ। এই সব চাষীরা নিজের হাতে চাষ করা বহু দিন ছেড়ে দিয়েছিল। এর উপর ১৭৯৯ ও ১৮১২-র সরকার সমর্থিত দমনমূলক আইনের ফলে চাষীর অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে ওঠে।[২৬] ক্রেতা যাতে নিলামে ঝামেলাহীন সম্পত্তি কিনতে পারে, সেজন্য তাকে আগের মালিকের

কোন প্রতিশ্রুতি না রাখার ক্ষমতা এবং প্রয়োজনে মধ্যবর্তী শ্রেণী ও প্রজাদের স্বত্বাধিকার লোপ করে দেবার ক্ষমতা — এ সবই সরকার নতুন জমিদারকে দিয়েছিল। তারা ইচ্ছেমত খাজনা বাড়াতে পারত। ক্ষমতার অপব্যবহার হচ্ছে জেনেও ১৮৫৯-এর আগে সরকার কদাচিৎ খাজনা ব্যবস্থায় মধ্যস্থতা করত। তাদের সর্বদা আশঙ্কা ছিল, পুরনো খাজনা আদায় ব্যবস্থার যাতে ক্ষতি না হয় এবং খাজনার পরিমাণ যাতে কমে না যায়। বস্তুত, হঠাৎ করে খাজনা বাড়ানকে সরকার অন্যায় বলে বিবেচনা করত না। কৃষির উন্নতির জন্য এটাকে প্রয়োজনীয় বলেই মনে করত। বাড়ানর পরিমাণটা যাতে আইন সঙ্গত হয়, শুধু এটাই খেয়াল রাখা হত।

জমিদাররা তাদের নবলব্ধ ক্ষমতার অপব্যবহার করত।[২৭] চাষীদের অধিকার এতে যে কতটা ক্ষতিগ্রস্থ হত, তা তখনকার সরকারি প্রতিবেদনে পাওয়া যায়। এরকম এক চমকপ্রদ প্রতিবেদন আছে বিহার জেলার উপর। ১৮২৮ সালের কথা। এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চাষীরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল যে, জমির উপর কোন কালে তাদের কোন অধিকার ছিল। আরো ভয়াবহ হল তারা বিনা প্রতিবাদে নিজেদের অবস্থা মেনে নিয়েছিল। বলা হয় যে, জমিদারদের এই প্রবল পরাক্রম দেখে নীলকর সাহেবরাও ক্ষমতাশীল হয়ে উঠেছিল। সবাই একবাক্যে স্বীকার করত যে নীল চাষীদের সাহেবরা এতই অস্বাভাবিক কম মজুরিতে চাষ করাত যে জমিদার তার জমিদারির একাংশ যে কোন দামে দিতে চাইলে তারা তা নিতে প্রস্তুত ছিল। বিহারে দেখা গিয়েছে প্রচলিত দরের থেকে অনেক কমে নীলকর সাহেবরা নীল চাষের জন্য মজুর যোগাড় করত নিজেদের ক্ষমতা জারি করে।

প্রথম দিকে দমন নীতি অবলম্বনের পিছনে খাজনা আদায়ের একটা তাগিদ ছিল। এর ফলে বহু পুরনো জমিদার, যাদের সঙ্গতির সম্পর্কে সরকার বিভিন্ন জায়গা থেকে একটা সঠিক ধারণা করেছিল, তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।[২৮] পরবর্তী কালে খাজনা আদায়ের চাপ চলে গিয়েছিল বটে, কিন্তু জমিদারি অর্থনীতিতে কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা দেয় নি। জমিদারি রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনে, মূল্যবৃদ্ধির কারণে এবং জমিদারি আয়ের উপর ভাগীদারের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে যাওয়ায়, ঊনবিংশ শতাব্দর শেষ ভাগেও খাজনা বাড়ানর প্রয়োজন দেখা যায়। জমিদাররা তাই তখনও দমন নীতির তাগিদ বোধ করত, যদিও শতাব্দর প্রথম ভাগের চেয়ে সেই সময় তাকে অন্য অনেক ধরণের বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

জমিদারদের নতুন আইন অনুমোদিত ক্ষমতা ও তীব্র আর্থনীতিক সংকটের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল, একথার উপর বেশি জোর না দিলেও চলে। ক্ষমতা ছিল বলে তার ব্যবহারও ছিল। এ বিষয়ে কৃষি সমাজে নবাগত ভূস্বামীরাই অগ্রণী ছিল। এরা বেশিরভাগই হয় নিলামে জমি কিনেছিল, কিংবা সাবেকি জমিদারিতে স্থায়ী 'পত্তনি' নিয়েছিল। এদের মধ্যে অনেক ফাটকাবাজও ছিল, যারা তখনকার প্রচলিত খাজনার থেকে জমিদারকে অনেক বেশি টাকা এক সঙ্গে দেবে এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আবার এমনও অনেকে ছিল যাদেরকে জমিদার নিজের জমির অংশ বিশেষ ইজারা দিয়েছিল খাজনা আদায়ের জন্য। এ ভাবেই এদের গ্রামে

ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ মেলে। এছাড়াও আর একদল ছিল, যারা স্থায়ী ভাবে ভূ-সম্পত্তি রাখা পছন্দ করত না এবং সহজে ধনবান হবার জন্য সস্তায় জমি কিনে বেশি দামে বিক্রির ব্যবসা করত। এই ভাবে তাদের প্রচুর লাভ হত। জমির বাজার যতদিন না স্থিতি লাভ করেছিল, এই ব্যবসা তারা চালিয়ে গিয়েছিল।

এর মধ্যে প্রথম দুই দল তাদের নতুন কেনা ভূ-সম্পত্তি থেকে পুরো মুনাফা তোলার জন্য নিয়ম করে নিজেদের নতুন ক্ষমতা প্রয়োগ করত। এই সময়ই গ্রামের পুরনো গোষ্ঠী, যারা বিনা খাজনায় কিংবা অল্প খাজনায় থাকার সুবিধাভোগী, তাদের উপর আঘাত নেমে আসে। শেষোক্ত দল এতটা ক্ষমতা জারি করতে পারত না, তাদের স্বল্প স্থায়ীত্বের জন্য। কিন্তু যে সব জায়গায় স্বল্প মেয়াদে অস্থায়ী স্বত্ব দেওয়া হত, সেখানে এরা গ্রামীণ গোষ্ঠীর উপর প্রভূত্ব কায়েম করত। বিহারের ঠিকাদাররা এই শ্রেণী ভুক্ত। যে সব জায়গায় এই ঠিকাদাররা জমিদারকে ঋণ দিত, সে সব অঞ্চলে এদের প্রকোপে চাষীদের নাজেহাল অবস্থা হত। বোঝাই যায়, জমিদাররা কেন এদের বিরোধিতা করত না।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদের ক্ষমতা কোথাও কমে যায়, কোথাও একেবারেই চলে যায়। ১৮৫৯, ১৮৮৫ এবং তারও পরে[২৯] সরকার চাষীদের হয়ে মধ্যস্থতা করে। এক সময়ে সরকারের আইনের ফলেই জমিদারদের প্রবল ক্ষমতা জন্মায়। এরা নানা বেআইনি কাজ করা সত্ত্বেও সরকার এতদিন তাদের বাধা দেয়নি। এদের ওপর প্রথম বাধা আসে ১৮৫৯ সালে যখন সরকার বুঝতে পারে যে, জমিদারদের আচরণ শোধরাবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এর সঙ্গে খাজনা আদায়ের অনিশ্চয়তার কোন সম্পর্ক নেই। তবে চিরকালের জন্য খাজনা বেঁধে দেবার কোন ইচ্ছেই সরকারের ছিল না। জমিদার ইচ্ছে করলে কখনো সখনো প্রজাদের উপর খাজনা বাড়াতে পারত। সরকার শুধু কিছু নিয়ম বেঁধে দিয়েছিল। ১৮৫৯-এ সরকার প্রথম স্বীকার করে যে ফসলের দাম অনেকাংশেই বেড়েছে, তাই খাজনা বাড়ান অনুমোদন করে। যখন সরকার বুঝতে পারে যে, ফসলের দাম ঠিক কি পরিমান বেড়েছে, এটা জমিদাররা আদালতে দেখাতে পারবে না, কারণ তাদের কাছে কোন মূল্য তালিকা ছিল না, তখন প্রতি বছর তাদের ফসলের দামের একটা তালিকা দেবার ব্যবস্থা করে। এটা ঘটে ১৮৮৫ তে। এর পর থেকে এই তালিকাকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে আদালতকে নির্দেশ দেওয়া হয়। কালেক্টরেটের উচ্চ পদস্থ কর্মচারীরা ঠিক করেন যে, মূল্য নির্দ্ধারণ করার খরচ জমিদারদের বহন করতে হবে। সমীক্ষার পর যদি দেখা যায় যে, খাজনা বাড়ানর সঙ্গত কারণ আছে, তবেই জমিদার তা বাড়াতে পারবে। খাজনা বাড়ানর প্রয়োজন অনুমোদন করলেও সরকার সব সময়ই লক্ষ্য রাখত তা যেন অত্যধিক না হয়।[৩০] সরকার যখন জানতে পারে যে, জামিদাররা তাদের আইনি ক্ষমতার অপব্যাহার করছে,[৩১] তখন তা একেবারে বাতিল করে দেয়। ১৮৫৫-র পর স্থানীয় প্রশাসন যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হওয়ার ফলে জমিদাররা নিজেদের ভুলত্রুটি সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে যায়। খাজনার পরিমাণ নির্দিষ্ট করতে গিয়ে জমিদারকে অনেক সময় প্রজাদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে

গড়তে হয়। ১৮৫৫ তে দেখা যাচ্ছে, বাজারে কৃষি দ্রব্যের দাম বেড়েছে — এই অজুহাতে খাজনা বাড়ান বেশ শক্ত কাজ। যে সব জমিদার নিয়ম কানুন মেনে চলত, তাদের পক্ষে বাড়তি খাজনা আদায় একেবারেই সম্ভব ছিল না, যদি না তাদের জমিদারিতে চাষাবাদ যথেষ্ট বাড়ান যেত।

জমিদারের ক্ষমতা কমে যাবার সঙ্গে প্রজাদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা এক অর্থে জড়িত। ভবিষ্যতে এরা এক জোট হয়ে জমিদারের স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদ করেছে। এইসব প্রতিবাদ আংশিক সফল হলেও তা উচ্ছৃঙ্খল জমিদারকে হুঁশিয়ার করে দিত। প্রজাবিদ্রোহ বিষয়ে তারা হুশিয়ার হয়ে যেত। একথাও জমিদার জানত যে, চাইলেই আর খাজনা বাড়ান সম্ভব নয়। যে সব জায়গায় এই বিক্ষোভ শুধুমাত্র চাষীদের মধ্যেই সীমিত ছিল না, সেখানে জমিদাররা আরও বেশি সতর্ক থাকত। পূর্ব ও উত্তর ভারতে এই প্রজা আন্দোলনে বেশির ভাগই মুসলমান চাষীরা অংশ নিয়েছিল। এদের সঙ্গে পরে আরো অনেকে যোগ দিয়েছিল। এই আন্দোলনের নানা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক ছিল। এই আন্দোলন প্রধানত হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে।[৩২] এই সব জায়গায় ধর্মীয় গুরু, অর্থাৎ উলেমা ও মৌলভিদের প্রচারই গ্রামে গঞ্জে রাজনৈতিক মতাদর্শের আকার নেয়। ক্ষমতাবান মধ্যবিত্ত শ্রেণী এতে আংশিক নেতৃত্ব দেয়। দেখা গিয়েছে, যে সব ভাগচাষীর হিন্দু জমিদারদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না, তারাও এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছে।

জমিদারদের সামাজিক ক্ষমতা বিলোপই তাদের আর্থনীতিক ও আইনগত ক্ষমতা নষ্ট হওয়ার পিছনের প্রধান কারণ। তাদের জীবন যাপন কালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলে নি। তারা যে উপায়ে খাজনা আদায় করত এবং এমন ভাবে তা অপচয় করত, তাতে সমাজের চোখে তারা পরগাছার সামিল হয়ে ওঠে। এমনও বলা হত যে, তাদের সম্পূর্ণ নির্মূল না করতে পারলে বাংলার আর্থিক পুনরুত্থান সম্ভব নয়। গ্রামাঞ্চলে নতুন, সুবিস্তৃত রাজস্ব ও বিচার ব্যবস্থা গড়ে ওঠার ফলে এদের ক্ষমতা আস্তে আস্তে কমে যায়। এছাড়া নতুন প্রশাসন সেচ ও বাঁধ রক্ষার ভার নেয়, যা এককালে জমিদারদের তত্ত্বাবধানে ছিল এবং তার ক্ষমতার অন্যতম প্রধান উৎস ছিল । গ্রামে তখন যারা নতুন এসেছে, তারা প্রধানত নিলামে জমি কিনে বসেছে। এদের হাতে একটা বড় অংশের ভোগ স্বত্ব জমি। এসব ছাড়াও, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, যাদের মধ্যে অনেক বুদ্ধিজীবী ছিল, তারা আস্তে আস্তে জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছিল। গ্রাম ভিত্তিক ব্যবসাদার ও ঋণদাতারাও এ সময়ে জমিদারদের সমালোচক হয়ে ওঠে।

একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, জমিদারের আশ্রিত অথবা তার প্রতি বিরূপ ব্যক্তিরা বিশেষ সুবিধা করতে পেরেছিল। এমনও নয় যে, যেটুকু ক্ষমতা তখনও অবশিষ্ট ছিল, জমিদার তার সদ্ব্যবহার করে নি। সম্প্রতি মাসগ্রেভ আওধ-এর (অযোধ্যা) তালুকদারদের (১৮৭০-১৯২০) নিয়ে এক আলোচনায় মন্তব্য করেছেন, জমিদারি বলতে আমরা বুঝি অত্যন্ত দক্ষ ও কার্যকর এক শাসন যন্ত্র যেখানে সর্বোচ্চ ব্যক্তির হাতে সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত, যা অল্প অল্প করে কাঠামোর নিচের তলায় চুইয়ে পড়ে। এই ধারণা সংশোধন করতে হবে।

তিনি বলেছেন যে, এই কাঠামোটি তো দৃঢ় ছিলই না, বরং কিছু অস্পষ্ট, ঢিলে ঢালা সম্পর্কের উপরে দাঁড়িয়েছিল। একে কোন সামাজিক বা আর্থনীতিক সম্পর্ক না বলে রাজনৈতিক সম্পর্ক বলাই ভালো। অথবা অন্য ভাবে বললে, এটা এমন একটা সম্পর্ক, যা তলার দিকের সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে রয়েছে। ফলে জমিদারিকে একটি আলগা সংগঠন বলা যেতে পারে, যেখানে সবচেয়ে নিচু তলার মানুষও একেবারে ক্ষমতাহীন ছিল না এবং জমিদার তার সামাজিক অবস্থানের জন্য খাজনা আদায় এবং জমিদারির প্রধান ব্যক্তিদের সহমতের উপর নির্ভরশীল ছিল। এই সহমতের অভাব ঘটলেই জমিদার ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ত।

এইসব অসুবিধার কারণ অতিরঞ্জিত করা নিষ্প্রোয়জন। যদিও একথা সত্যি যে, এই জটিল ক্ষমতা বিন্যাসে জমিদার এখন তার সেই আগের আধিপত্য জারি করতে পারত না। তবে এইসব সম্পর্কের উপর খাজনার বিরুদ্ধে আন্দোলন বিশেষ ছাপ ফেলে নি। কারণ, এই দুয়ের নির্দ্ধারক সম্পূর্ণ আলাদা। সমস্ত প্রজার উপর জমিদারের আংশিক ক্ষমতা জারি করার অধিকার মানে এই নয় যে, এই ক্ষমতা জারি কার্যকর ছিল না। যে সব সংস্থানকে অনেক সময় খাজনা আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হত, তারাও জমিদারের মত ক্ষমতাশালী ছিল। উদাহরণ, আওধের তালুকদারদের কথা, যারা এক বিরাট অংকের খাজনা আদায় করে বহু সংখ্যক চাষীকে ভূমিচ্যুত করে এবং বহু প্রজার ভোগদখলস্বত্ব আত্মসাৎ করে নিজেদের আয় অনেক বাড়িয়েছিল।[৩৩]

মাসগ্রেভ নিজেও একটা দরকারি বিষয় স্বীকার করেছেন, সেটা হল, সমাজের সব স্তরেই দেখা যায়, মানুষ তার স্থানীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিধির ভিতরেই সরকার ও তার আমলাতন্ত্রের সঙ্গে সমঝোতা করে চলেছে। তা না হলে তার চেয়ে ছোট গোষ্ঠীর যেটুকু সম্পদ, তা বিবাদ বিরোধেই শেষ হয়ে যাবে। যখন সত্যিই ক্ষমতার লড়াই শুরু হত, তখন দেখা যেত উপর তলায় যারা ছিল, তাদের কখনই সম্পদের অভাব হয় নি। যেমন, জমির মালিকদের কখনই প্রজাদের অধীনস্থ হতে হয় নি। জমিদারেরা সব সময় অনুগত লোক পেত, যাদের সাহায্যে তারা সব আন্দোলন ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হত। আওধে দেখতে পাই, যে সব রাজপুত গোষ্ঠী তালুকদারের বশ্যতা স্বীকার করত না, তাদের ধ্বংস করার জন্য জমির মালিকরা শুধু যে নিচু জাতের কুর্মিদের নিয়ে জোট বাঁধতে সক্ষম হয়েছিল তাই নয়, তারা অন্য জায়গা থেকে চাষী এনেও নিজেদের জমিতে বসিয়ে ছিল, যাতে তারা সরাসরি তালুকদারের তাঁবে থাকতে পারে।

গ্রাম সমাজে জোতদারদের প্রভূত্ব কতখানি ছিল তা এখন খুটিয়ে দেখার সময় এসেছে। এ বিষয়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। গ্রামের সব শ্রেণীরই (যার মধ্যে ভূস্বামীরাও আছে) কি জমির মালিকানা থেকে ক্ষমতা আসত? ব্যবসা ও তেজারতের ফলে কি তা আরও জোরদার হত? বাংলা ও বিহারেই কি শুধু জোতদারদের আধিপত্য বেশি ছিল? ঔপনিবেশিক শাসনকালে এই আধিপত্যের আকার কি একই রকম ছিল? যদি ধরে নিই

যে, পুরনো ও নতুন জোতদার উভয়েরই ক্ষমতা বেড়েছিল, তার মানে কি পুরনো জমিদার-প্রজার লড়াইয়ের জায়গায় আমরা আধুনিক জোতদার-ভূস্বামী ও ভাগচাষী-মজুরের লড়াই দেখতে পাই?

জমি মালিকের কাঠামোয় সব শ্রেণীরই অবস্থান ছিল। যেমন, কৃষিজগতের উচ্চবর্ণ ও বিত্তবান চাষী এবং গ্রামের মণ্ডল। এরা চাষ ছাড়া আরও নানা আর্থনীতিক তৎপরতা দেখাত। এবং এদের কারোরই গ্রামে জমি ছিল না যা থেকে এরা ক্ষমতা লাভ করত। মণ্ডলরা প্রশাসনিক অবস্থানের ফলে ক্ষমতার অপব্যবহার করার সুযোগে গ্রামের লোকের উপর প্রতিপত্তি বিস্তার করত। এখানে দুটো জিনিস লক্ষ্য করা গিয়েছে। এক, এই ক্ষমতা সে প্রায় কখনই গ্রামীণ জমিজমার উপর খাটতে পারত না। মণ্ডলের অধীনে যে জমি, তা গ্রামের পুরো কৃষি জমির একটি সামান্য অংশ। গ্রামের জমি আগে থেকে যে ভাবে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল, তার উপর খবরদারি করার অধিকার মণ্ডলের ছিল না। শুধু জমিদারির পুরো খাজনার উপরই সে কারসাজি করতে পারত। অনেক সময় এইভাবে তার কিছু লাভ হত। দ্বিতীয়তঃ, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জমিদারের ক্ষমতার মত মণ্ডলের ক্ষমতাও আস্তে আস্তে কমে যায়। তাদের যা দায়-দায়িত্ব ছিল, তার থেকে অনন্তকাল ক্ষমতা জারি করার কথা তাদের নয়। বর্ধিষ্ণু বিত্তবান রায়তরা তাদের জায়গা নিয়ে নেয়।

জমিদার হয়ে যারা খাজনা আদায় করত তাদের মধ্যেই অনেক ধনী চাষী ছিল। জমির উপর যেহেতু এরা খাজনা নিত, তাই জমি সংক্রান্ত ক্ষমতাও এদের অনেক বেশি ছিল। তবে জমিদাররা আধিপত্যের কারণে এদের খাজনা আদায়ের ভার দিত না। আদায়কারীদের কিছু ক্ষমতা থাকার প্রয়োজন ছিল, তবে তা জমির মালিক হিসেবে নয়।

১৭৬৯-৭০ এর দুর্ভিক্ষের পর যে জমি পুনরুদ্ধার করা হয়, তাতে এক শ্রেণীর বিত্তবান চাষী ক্ষমতায় আসে। অনেক সময়ই এদের লাভ হত সাময়িক। এই চাষে যে মজুর খাটত, তারা প্রধানত দুর্ভিক্ষে ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি এমন অঞ্চল থেকে এসেছিল। এর ফলে স্থানীয় উদ্যোক্তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বীরভূমের রাজা প্রথম এরকম বহিরাগত অথবা ভবঘুরে চাষী নিজের জমিতে বসিয়েছিলেন। তাকে পরে খুব অসুবিধায় পড়তে হয়, কারণ এরা খাজনা-দায়ের চাপে পড়ে অথবা বিক্ষুব্ধ হয়ে নিজেদের ফসল নিয়ে আদি গ্রামে পালিয়ে যেত।[৩৪] কৃষি উদ্যোক্তাদের দুর্বলতার আরো একটি কারণ হল, জমিদাররা প্রথমদিকে যে অল্প খাজনার লোভ দেখিয়ে অনাবাদী জমিতে প্রজা বসিয়েছিল পরে আবার তা বাড়িয়ে দেয়। এ ব্যাপারে সরকারেরও সায় ছিল। বীরভূমে সবচেয়ে বেশি পতিত জমিতে আবাদ করা হয়েছিল। ১৭৮৬-৮৭তে যখন হঠাৎ সরকারকে বেশি খাজনা দিতে হয় এবং স্থানীয় পুরনো চাষীরা খাজনার হারের পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়, তখন জমিদাররা পুরনো সুবিধাগুলো আবার চালু করে। গ্রাম বাংলায় বড় মাপের পতিত জমি উদ্ধারের সঙ্গে যুক্ত থাকা ব্যক্তিরাই আসল জমির মালিক। এরা হল, আবাদকার, হাওলাদার, গ্রান্থীদার এবং জোতদার। জমিদারদের এদের মত পয়সা ও উদ্যোগ ছিল না বলেই এদের উপর জমি পুনরুদ্ধারের কাজে পুরোপুরি

নির্ভরশীল ছিল।

এই জোতদারশ্রেণী গ্রামাঞ্চলের কৃষিতে কতখানি শাক্তিশালী ছিল তা বিচার করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এদের সঙ্গে ব্যবসা ও তেজারতি কারবারে যুক্ত এক শ্রেণীর ধনী চাষীও ছিল। তবে বলাই বাহুল্য এরা কখনই পুরো গ্রামে ক্ষমতা জারি করত না।

এই আধিপত্যের লক্ষণ দেখা যেত সেই সব জমি মালিকদের মধ্যে যারা এক সঙ্গে প্রচুর জমি পুনরুদ্ধার করেছিল। এই পদ্ধতি ছাড়া একসঙ্গে অনেক জমির মালিক হওয়া সম্ভব ছিল না। এই ক্ষমতা বিস্তারের ধরণ জায়গায় জায়গায় আলাদা হত। তবে এদের মধ্যে সাদৃশ্যও ছিল। জমিদার যাদের পতিত বা জলা জমিতে প্রজা বসাত, তাদের সবাইকে উদ্যোগী হওয়া ছাড়াও বিনিয়োগে সক্ষম হতে হত। প্রথমে যা খরচ হত, তাতো এরা দিতই, প্রয়োজনে পরেও আর্থিক সাহায্য বা ধার দিত। তারা যে শর্তে সাময়িক স্বত্ব নিত, তা থেকেও প্রচুর সুবিধা পেত। কারণ, এই সব স্বত্বের ভাড়া হত সামান্য। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে প্রথম দুই তিন বছর কোন ভাড়াই দিতে হত না। পরে অবশ্য ভাড়া ধীরে ধীরে বেড়ে যেত। এই জোতদাররা চাষীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে ক্রমশঃ নিজেদের ক্ষমতা বাড়াতে থাকে। জোতদার চাষী সম্পর্ক দু রকম ছিল। কোল ব্রুকের মতে (১৭৯৫) পূর্ণিয়া জেলায় চাষীদের প্রায় ক্ষেত মজুরের সামিল ধরা হত। আবার বাখরগঞ্জে, এককালে যে সব উদ্যোক্তারা জমি পুনরুদ্ধারের কাজের পরিকল্পনা করেছিল ও তার ব্যয়ের দায়িত্ব নিয়েছিল, ধীরে ধীরে তারা সরে দাঁড়িয়ে প্রজাদের উপর চাষের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিল। শর্ত ছিল, মালিকের ইচ্ছানুযায়ী মাঝে মধ্যে কর বাড়ান যাবে। যে সব জায়গায় জোতদাররা চাষীকে ঋণ দিত, সেখানে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়ে। ক্রমে সুদের বোঝা এতই বেড়ে যায় যে, খাজনা ও সুদের মধ্যে যে পার্থক্য, তা ক্রমশই অদৃশ্য হয়ে যায়। জমিদাররা যেহেতু এসব নিয়ে মাথা ঘামাত না, তাই জোতদারদের সুবিধা বেড়ে যেত। জমিদারদের মধ্যেও নানা প্রভেদ ছিল। বুকাননের লেখায় আছে, দিনাজপুরের জমিদাররা জমি পুনরুদ্ধারের কাজ ব্যহত হতে পারে আশঙ্কা করে কোন রকম হস্তক্ষেপ করত না। কারণ, এমন দেখা গিয়েছে যে, অন্যথায় জোতদাররা লোকজন ও পুঁজি গুটিয়ে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে।

এই সময় চাষীদের অধিকার জোরদার করার জন্য যে আইন তৈরি হয়, তাতে এই মালিকদের ক্ষমতা বেড়ে যায়। ১৮৫৯-এর ১০ নং আইনে ভোগ দখল স্বত্বের অধিকারী চাষীদের উপর হঠাৎ খাজনা বাড়ান যাবে না বলে ঘোষণা করা হয়। তবে এই আইনে যে স্বত্বাধিকারের কথা বলা হয়েছে, তাতেই মালিকের সব সুবিধা হয়ে যায়। এর মধ্যে সব চেয়ে জরুরি বিষয়টা হল, একটানা বার বছর জমির স্বত্ব ভোগ করতে হবে। চাষী নিজে চাষ করে, না লোক দিয়ে করায়, সে সব অপ্রাসঙ্গিক। উদ্যোগ নিয়ে পতিত জমি উদ্ধার করে জোতদাররা দু'ভাবে উপকৃত হয়। এক জমিদারের খামখেয়ালি খাজনা বাড়ানর হাত থেকে আইন তাদের রক্ষা করত, যদিও তারা অধস্তন চাষীদের উপর কর চাপাতে পারত। দ্বিতীয়ত, দিনে দিনে জমির দাম যত বেড়েছিল, তাদের তত লাভ হয়েছিল। জমিদাররা

এদের ক্ষমতা অল্পই কমাতে পেরেছিল। যে সব অঞ্চলে আদিবাসীরা চাষ করত, সে সব জায়গায় জমিদাররা অনেকটা সফল হয়েছিল নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে। কারণ, অনেক সময়ই জমিদার আদিবাসী মণ্ডলকে (যে এসব জায়গায় চাষ দেখত) সরিয়ে তার জায়গায় নিজের পছন্দমত বাইরের মণ্ডল এনে বসাত।

জোতদাররা সেই সব অঞ্চলেই আধিপত্য স্থাপন করেছিল যেখানে সে পতিত জমি উদ্ধারের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তবে এরও ব্যতিক্রম আছে। যেমন নতুন চাষ বাসের কাজ শুধু যে আবাদ বসিয়েই হয়েছিল এমন নয়, তা ঘটেছিল এমন জায়গায়, যেখানে নানা কারণে পতিত জমি আয়তনে খুব বড় ছিল এবং সহজে ক্ষেত মজুর পাওয়া যেত না। উদাহরণ, রংপুর, দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ি জেলা, কিংবা সুন্দরবনের সংলগ্ন খুলনা-যশোর, বাখরগঞ্জ ও ২৪ পরগনার অঞ্চলগুলো। প্রায়ই বলা হয়, উচ্চ বর্ণের কৃষিজীবীরা এই সব অঞ্চলের জমির মালিক ছিল। ব্যাপারটা খুটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে, সদ্‌গোপরা সত্যিই পতিত জমি পুনরুদ্ধারের কাজে বড় ভূমিকা নিয়েছিল। এর একটা বিশেষ কারণ (সান্যাল, ১৯৮১: ৪৫-৭), এরা মেষপালক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত গোপজাতি, যারা পরে দক্ষিণ বাংলার লাল মাটি অঞ্চলে অর্থাৎ বীরভূম, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের উর্বর জমিতে স্থায়ী চাষবাসের বন্দোবস্ত করে। এরা চালের ব্যবসা করত ও জমিদারি শাসনতন্ত্রে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিল বলে এদের ক্ষমতা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।[৩৫] কৃষি জগতে এদের আসাটা নতুন নয়। ষোড়শ শতাব্দর মাঝ থেকেই এদের দেখা পাওয়া যায়, কারণ মুঘলরা সেই সুদূর জঙ্গল প্রান্তও শাসনের আওতায় রাখত এবং সীমান্ত অঞ্চলের, বিশেষতঃ মেদিনীপুরে রাজনৈতিক অবস্থা তখন ঢিলে ঢালা ছিল।

যারা মনে করে খাজনা আদায়ের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি, আর জমির প্রকৃত মালিক — এই দুইয়ের মধ্যে ফারাক আছে, তাদের মতে ব্রিটিশ শাসনকালে যে সব আর্থনীতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন হয়েছিল, তার সঙ্গে জোতদারের ক্ষমতা লাভের বিশেষ সম্পর্ক নেই। ব্রিটিশ শাসন কালের আগেও ক্ষমতাশালী জোতদার সম্প্রদায় দেখা যেত। ইংরেজ শাসনকালের আগের যুগে জোতদারদের প্রতিপত্তি বিস্তার নিয়ে এই প্রবন্ধে আলোচনা হয়েছে। এই মতবাদীরা একটা কথা ভুলে যান যে, ব্রিটিশ শাসন কালে নানা ধরণের জোতদারি ক্ষমতার জন্ম হয় যা গ্রামীণ কাঠামোকে আরও জটিল করে তোলে। আগের সঙ্গে পরের পার্থক্য হল — এক, ক্ষমতাশালী শ্রেণীর উদ্ভব, দুই, তাদের গঠন এবং তিন, তাদের হাতে জমির পরিমান।

জলপাইগুড়ি, ২৪ পরগনা, মালদা ও বাখরগঞ্জে জোতদারদের প্রভূত্ব খুব বেশি ছিল। কারণ, এসব জায়গায় জমি পুনরুদ্ধারের কাজ প্রথম শুরু হয়েছিল। ফসলের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পতিত জমিতে চাষ করার প্রবণতা আরো বাড়ে। জমির দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জোতদাররা অধীনস্থ প্রজাদের উপর আরো বেশি কর্তৃত্ব বিস্তার করতে থাকে। সরকার যে সব পতিত জমির মালিক ছিল, তা থেকে মুনাফা আদায়ে জমিদারের চেয়েও সরকার

বেশি পরিমাণে উদ্যোগী হয়ে উঠল। সরকার মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে তার খাজনার চাহিদা এবং কৃষকের কাছ থেকে মধ্যস্বত্বভোগীদের খাজনা আদায়ের পরিমানের মধ্যে সমঝোতা করল। এতে সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিল এবং সরকারকে, অনেক কম টাকাতে সন্তুষ্ট থাকতে হল। পরের দিকে, জোতদারদের প্রভূত্বের দুটো উৎস ছিল। এক, দিনে দিনে ছোট চাষীদের মধ্যে জমির চাহিদা বেড়েছিল, কারণ জমির উপর চাপ ক্রমশই বাড়ছিল এবং দুই, দৈন্যের পরিণতিতে চাষী তার জমি বেচে দিতে বাধ্য হয়ে পড়ে। সাধারণ ছোট চাষীরা যাদের জমিতে চাষের কাজে ভাড়া খাটত, তারা বেশির ভাগই খুব বড় জমির মালিক নয়। তারা সহজেই চাষীকে খাজনা দেবার শর্তে জমি দিয়ে দিত, কারণ এটা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা ছিল। তারা নিজের জমিদারকে যে খাজনা দিত, তা কিছু বেশি ছিল না। তুলনায় গরীব ভাগচাষী, যাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চাষের একান্তই প্রয়োজন, তাদের কাছ থেকে তারা অনেক বেশি খাজনা নিত। এরা দুটো কারণে কম খাজনা দিত। প্রথমতঃ তারা জমিদারকে বেশি খাজনা দেওয়া যে কোনো উপায়ে ঠেকিয়ে রেখেছিল। দ্বিতীয়তঃ জমিদার যেহেতু দেখত খাজনা বাড়াবার নানা ঝঞ্ঝাট, এবং তাদের নিজেদের আর্থিক প্রয়োজন খুব বেশি, তাই সে স্থায়ীভাবে খাজনার হার বেঁধে দিত। তবে প্রথমেই ক্ষতিপূরণ হিসেবে একটা মোটা অংক নিয়ে নিত। চাষী দাম পড়ে যাওয়ায় জমি বেচে দিচ্ছে, এটা ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকের চেয়ে শেষ দিকে বেশি দেখা যায়। এর প্রধান কারণ ছিল, হঠাৎ প্রয়োজন বা জমে ওঠা দেনা শোধ দিতে না পারা। এই সময় থেকে জমির দাম এত বেড়ে যেতে থাকে যে, ক্রেতার দিক থেকে এটা খুবই লাভজনক হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়াও আইনের সাহায্যে ক্রেতা জমা খাজনা ও সুদ সমেত আসল খুব সহজেই উদ্ধার করতে পারত।

জোতদারের ক্ষমতার যে দুটি উৎসের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে প্রথমটির ব্যাখ্যা সহজে বোঝা যায়। ছোট চাষী যে মালিকের কাছে ধার নিয়েছে, সেটাই তার ক্ষমতার পরিচয়। ১৮৯০-এর দশকের আগে অবধি চাষীরা নগদেই খাজনা দিত। তারপর ফসলের দাম যত বাড়তে থাকে, মালিক ফসলের মারফৎ খাজনার উপর তত জোর দিতে থাকে। যে সব জায়গায় ক্রেতা জমি কিনে তা আগের চাষীকে দিয়েই চাষ করার কিংবা অন্য চাষীকে ভাগচাষে দিয়ে দেয়, সে সব অঞ্চলে চাষীর জমি অনেক বেশি পরিমাণে বিক্রি হয়েছিল।[৩৬] এর পিছনে মালিকের অনেক উদ্দেশ্য ছিল। সরাসরি চাষের চেয়ে সাময়িক স্বত্বে[৩৭] দেওয়া জমি থেকে যে খাজনা আসত, তা লাভজনক ছিল। যে সব ক্রেতা আবার চাষের কাজে অজ্ঞ কিংবা অনাগ্রহী ছিল, তাদের পক্ষে সাময়িক স্বত্বে জমি দেওয়াই একমাত্র উপায় ছিল। যারা নিজের হাতে চাষ করত না, তারা সমাজের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হত। অনেক সময়ই চাষীর কাছ থেকে কেনা জমি বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত, কাজেই সেখানে চাষ করা সহজে সম্ভব হত না।

পরের দিকের জোতদাররা বিভিন্ন স্তর থেকে এসেছিল। অনেক বড় জোতের মালিকও ছোট জোতদারদের কাছ থেকে জমি ভাড়া নিতে এগিয়ে এসেছিল। আবার সাধারণ লোকও

তদের সাধ্যমত চাষীর জমি কিনেছে। বেশির ভাগ জমিই ঋণের চেয়ে খাজনা দিতে না পারার দায়েই বিকিয়ে গিয়েছে। ঋণের কারণে চাষী বেশিরভাগ জমিই ঋণদাতাকে বিক্রি করত।

প্রথম দিকে দেখা যায় বেশির ভাগ বড় জোতদারই জমি পুনরুদ্ধার করে বিরাট আয়তনের জমির মালিক হয়েছিল। পরের দিকে জোতদারদের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। এদের বেশির ভাগেরই পরিমিত সম্পদ, সংখ্যায় এরা অনেক বেশি এবং জমিগুলি টুকরো টুকরো ভাবে বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত।

জোতদারদের গঠনের জটিলতা খুটিয়ে দেখা দরকার। বেশি ভাগ সময়ে, এরা যে সব অঞ্চলে বেশি সংখ্যায় ছিল, যেমন রংপুর, দিনাজপুর ও সুন্দরবনের বিস্তৃত অঞ্চলে, যেখানে জমি পুনরুদ্ধারের প্রচুর সুযোগ ছিল, সেই এলাকা নিয়েই বেশি আলোচনা হতে দেখা যায়। তাদের গঠনের বিষয়কে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। আন্দ্রে বেতেই প্রশ্ন করেছেন যে, বাংলার সব জমি-মালিককে জোতদার বলা সঙ্গত কি না। তিনি মনে করেন যে, জমিদারি শাসন এবং জোতদারদের প্রভূত্ব এই দুটি বিপরীত ধর্মী। তিনি দেখিয়েছেন, যে সব অঞ্চলে জমিদারদের কোন ক্ষমতা ছিল না, বা থাকলেও নেহাৎই সামান্য ছিল, সেখানেই জোতদারদের প্রতিপত্তি প্রবল ছিল।[৩৮]

দরকারি কথা হল, জোতদার বলতে আমরা কি বোঝাই। বেতে বলেছেন, যে ব্যক্তি বেশি পরিমান কৃষিজমির মালিক সেই জোতদার। এই মালিকানা থেকে একধরণের ক্ষমতা আসে, যা ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়। যেমন, এক শ্রেণীর ক্ষেত মজুর ও নির্ভরশীল চাষীর উপর প্রভূত্ব করার ক্ষমতা। এটা সেই সব জায়গায় আরো বেশি করে আসে, যেখানে চাষের জমি আয়তনে বিশাল হবার কারণে জোতদার নিজের পরিবার দিয়ে তা চাষ করতে পারে না, হয় ভাড়াটে চাষী মজুর রাখে, না হয় উপপ্রজা বা ভাগচাষীকে তার জমির খানিকটা অংশ দিয়ে দেয় চাষের জন্য। এছাড়াও যে সব জায়গায় সে চাষীকে ধার দিত, সেখানেও তার প্রভূত্ব অপরিসীম ছিল। এর থেকে দুটি সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। শুধুমাত্র বিশাল জমির মালিকানা থাকলেই জোতদার ক্ষমতা বিস্তার করতে পারত, একথা ঠিক নয়। ছোট জমির মালিকরাও একইভাবে আধিপত্য দেখাত। দ্বিতীয়ত, বেতেই যেমন দেখিয়েছেন, এই ক্ষমতা বিশেষ জমি ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত, এখানে সেটা দেখান হবে না। উদাহরণ হিসেবে যে ব্যবস্থার কথা আগে বলা হয়েছে, তার উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। জোতদাররা যেখানে কম খরচে বড় বড় পতিত জমি উদ্ধার করেছে অথবা জমিদার যে সব জমির মালিক ছিল, সেখানে লোক লাগিয়ে কাজ করিয়েছে। পুরনো চাষীরা যে জমি হারিয়েছে, তা নতুন প্রজাকে দেওয়া হয়েছে। জোতদার বলতে বেতে যে বিশাল জমির মালিককে বুঝিয়েছেন, এই প্রবন্ধে তা বোঝান হচ্ছে না। যে জোতদারের জমির পরিমাণ যত বেশি সে তত বেশি ক্ষমতাশালী।

জোতদার ও ভাগচাষীর যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়, তা পুরনো আমলের জমিদার ও প্রজার

লড়াইয়ের চেয়ে আলাদা। এই বিরোধ কি শ্রেণী দ্বন্দ্বে পৌঁছেছিল?[৩৯] জোতদারের ক্ষমতা নির্ভর করত কি পরিমান জমির সে মালিক তার উপর। এই ক্ষমতা আরোও বৃদ্ধি পায় ১৮৬০-এর পরে, যখন এই সব অঞ্চলের কৃষিজ ফসলের দাম ক্রমশই বাড়তে থাকে। আইনি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এই লাভের উপর জমিদারদের কোন দাবি থাকত না। কারণ তারা আদালতে এর কোন প্রমান দেখাতে পারত না। তা ছাড়া মামলা মকদ্দমা যেহেতু খরচ সাপেক্ষ ছিল, সেহেতু অনেক সময়ই জমিদাররা লাভের অংশ দাবি করত না। কেবল-মাত্র খাদ্যশস্যের দাম বাড়লে সরকার জমিদারদের খাজনা বাড়াবার অনুমতি দিত। তবে অর্থকরী ফসলের (যেমন পাট) ক্ষেত্রে নয়। তেজারতি ও চালের কারবার করে এরা অনেক সময় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করত। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই জোতদাররা রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৮৫৯ ও ১৮৮৫ তে যে প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয়, সে ব্যাপারে ইংরেজদের ভয় ছিল যে, জমিদার-জোতদারদের বিরোধের ফলে ব্রিটিশ শাসনের ভিত নড়ে উঠবে।

এ প্রসঙ্গে দুটি প্রশ্ন আলোচনা করা হবে। চাষের কতটা অংশ এদের ক্ষমতাধীন ছিল? এবং, যে সব জায়গায় জমিদারি পড়ে গিয়েছিল সেখানে কি এরাই একমাত্র ক্ষমতা লাভ করেছিল? প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যে সব তথ্য পাওয়া যায়, তা বিক্ষিপ্ত এবং সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। তবে এগুলোকে একেবারে বাদ দেওয়া যাবে না। আগে আমরা ভাগ চাষের অঞ্চলগুলো দেখব। কারণ, এখানেই প্রথম জোতদার ও অন্যান্য জমি মালিকরা তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। দেখা গিয়েছে ঋণ কারবার ও অন্যান্য চাষ জমির ক্রেতারা ভাগচাষই বেশি পছন্দ করত। কারণ ফসলের দাম ক্রমশই বাড়ছিল। মাঝে মধ্যে ভাগচাষ সংক্রান্ত যে সরকারি তদন্ত হয়েছিল (যা এই বিষয়ের উপর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য), তার থেকে জানা যায় যে, পুরো চাষের কেবল মাত্র ২০ কি ২৫ শতাংশ ভাগচাষে দেওয়া হত। এই হিসাব অবশ্য এই প্রবন্ধের পরিসরের পুরো সময়ের জন্য প্রযোজ্য নয়। দরকারি সংখ্যাতথ্য (data) বেশিরভাগই ১৯৩০ এর মন্দার পর থেকে পাওয়া যায়।[৪০] মন্দার পর এক অভাবনীয় দুর্দশায় পড়ে চাষী জমি বেঁচে দিতে বাধ্য হয়। জমি বিক্রির পরিমান বেড়ে যেতে থাকে। মন্দার আগে ভাগ চাষের সংখ্যা অনেক কম ছিল। ভাগচাষের বেশি প্রচলন ছিল আদিবাসী অঞ্চলে। সেখানে ছোট জোতের চাষীই বেশি ছিল। যে তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে জোতদারি প্রথা সারা বাংলা জুড়ে ছিল। বড় জোতদাররা যে সব অঞ্চল নগদ খাজনার বদলে চাষে দিয়েছিল সেই সংক্রান্ত তথ্য খুবই কম এবং সন্তোষ জনক নয়। যে সব আমলারা খাজনা, জমি জরিপ ও তার রদ-বদলের সঙ্গে জড়িত ছিল তারা দেখেছে যে যশোর ও খুলনা জেলা ও সুন্দরবনের জায়গাগুলো বাদে ভোগ-দখল স্বত্বাধিকারী প্রজারা যে খাজনা দিত, তা কখনই মোট চাষের আয়ের ৫ শতাংশের বেশি হত না।

জোতদারদের ক্ষমতা সার্বভৌম না হওয়ার ফলে জমিদারদের অবস্থা পড়ে যাওয়ার সুযোগ

নিতে পারে নি। জমিদাররা যে সব সময়ে খাজনা বাড়াতে সক্ষম
একলা ওরাই পুরোপুরি নিতে পারে নি। জমিদাররা যে সব সময়ে খাজনা বাড়াতে সক্ষম হয়নি, অর ফলে বড় জোতদারদের মত ছোট জমির মালিকরাও উপকৃত হয়েছিল। ১৮৫৯-এর ১০নং আইন ও ১৮৮৫-র বেঙ্গল টেনেন্সি অ্যাক্টের সাহায্যে সরকার জোতদারদের রাজনৈতিক ক্ষমতা স্বীকার করে নিয়েছিল, এমন মনে করা ভুল হবে। এই দুই আইনের ফলে অনেকেরই খুব লাভ হয়েছিল। তবে এটা সরকারের স্বেচ্ছাকৃত নয়। তাদের প্রধানত মনে হয়েছিল, এক উদ্যোগী কৃষক শ্রেণীকে জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধির চাপের থেকে বাঁচাতে হবে। প্রজার স্বার্থে জমিদারদের ক্ষমতাজারি বন্ধ করতে চেয়েছিল। তারা মনে করেছিল, এতে কৃষির উন্নতি হবে এবং এক স্থায়ী চাষী সম্প্রদায় গড়ে উঠবে। এই চিন্তা কখনই কৃষক শ্রেণীকে জোতদার বলে চিহ্নিত করে নি। তবে দেখা গিয়েছে যে, জমিদারদের ক্ষমতা পড়ে যাবার ফলে জোতদাররা সামান্য ক্ষমতাবান হয়েছিল, তার ফলে চাষীদের অনেক সময় খুব ক্ষতি হয়, বিশেষতঃ সেই সব চাষী যারা ঋণদাতাদের জালে জড়িয়ে পড়েছিল। এই সব ঋণদাতারা আবার অনেক সময় ধানচালের কারবারি হত। জমিদাররা দেখল, আইন বলবৎ হওয়ার ফলে চাষীরা জমিতে তাদের স্বত্বাধিকার হারাচ্ছে এবং তাদের জমি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এতে তাদের যথেষ্ট শঙ্কিত হবার কারণ ছিল, যেহেতু এতদিন তারা খালি জমিতে তাদের ইচ্ছেমত চাষী বা প্রজা বসিয়েছে। এই নতুন আইনের ফলে অনুগত পুরনো প্রজার জায়গায় হয়ত নতুন উদ্যোগী লোক আসবে, যাদের মধ্যে চতুর সুদের কারবারি, উঠতি পয়সাওয়ালা মধ্যবিত্ত এবং আরও অনেকে, যাদের উপর শুধু যে জমিদাররা তেমন করে আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে না, তাই নয়, তারা এই জমিদারি প্রথার সমালোচক এবং জমিদারদের পছন্দ করে না। এর মধ্যে পাশের জমিদারির লোকও থাকতে পারে, যারা সর্বদাই চেষ্টা করত পরস্পরের ক্ষতি করতে, নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সরিয়ে দিতে। প্রথমে তারা চাষ জমি বিক্রি অর্থাৎ হাত বদলে সম্মতি দিতেই একটা বড় অংশ দাবি করে বসত এবং চেষ্টা করত আগের প্রজার যে খাজনা বাকি পড়েছে তা যেন পুরোটা একসঙ্গে মিটিয়ে দেওয়া হয়। বলাই বাহুল্য, তারা ঋণের পরিমান বাড়িয়ে বলত, আর তখনই বিরোধ অন্য দিকে মোড় নিত। স্বত্বাধিকার হস্তান্তরকে আইন অনুমোদিত করার সরকারি পরিকল্পনা (১৮৮০-৮৫)কে জমিদাররা একজোট হয়ে বিরোধিতা করে। এব্যাপারে তাদেরই জয় হয়। সরকার আদালতের উপর হুকুম জারি করতে বাধ্য হয় যে, শুধুমাত্র যে সব জায়গায় জমির স্বত্বাধিকার বদল প্রথাগতভাবে চলে এসেছে, সেখানেই এই হাতবদল স্বীকার করতে, তা না হলে নয়। নানা অনিশ্চয়তার দরুণ জমি হস্তান্তর ব্যাহত হয়।

জমিদাররা সব সময়ে নিজেদের মত অনুযায়ী সব কিছু করতে পারত না। অনেক চাষীই জমি বেচতে ব্যগ্র ছিল। ক্রেতারাও ফাঁকতালে কেনার উপায় জেনে ফেলেছিল। একটা উপায় হল, যতদিন পারা যেত জমিদারকে এই জমি কেনার কথা জানান হত না। জমিদাররা এক সময় বুঝতে পারে যে, তারা এটা ঠেকাতে পারবে না। তখন তারা লাভের টাকার একটা অংশ পাবে, এই রকম একটা রফায় আসত। এই ভাগের টাকার পরিমান এক জায়গা

থেকে অন্য জায়গায় আলাদা হত। ১৯২৮ সালে এক আইনের মাধ্যমে এই সব জমি বদলকে পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আইন মোতাবেক জমিদারদের ভাগে পড়বে লাভের ২০ শতাংশ। ১৯৩৮-এ দেখা যায়, এই টাকা আর জমিদার পাচ্ছে না। পরাজয়ের গ্লানি মেখে তাদের মেনে নিতে হয়েছে জমির হাত বদল। কোন শর্তই তারা আর আরোপ করতে পারছে না। প্রতিদ্বন্দ্বীরা শুধু যে উদ্যোগী ছিল তাই নয়, সরকারও তাদের মদত যুগিয়েছিল। এতদিন জমিদাররা যে নিজেদের প্রজা ঠিক করতে পারত, এরপরে তাদের আর সে ক্ষমতাই রইল না।

একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, বাংলা ও বিহারের জমিদার যেহেতু উৎপাদন কাঠামোর অঙ্গ ছিল না, ফলে তাদের কোন ক্ষমতাও ছিল না। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সরাসরি কোন ভূমিকা নিত না বলে, গ্রামীন অর্থনীতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না মনে করা ভুল হবে। যে সব অঞ্চলে বড় মাপের জলা বা পতিত জমি উদ্ধার করা হয়েছিল বা যেখানে ক্ষেত প্রচলিত সেচ ও বাঁধ নির্ভর ছিল, সেখানে জমিদার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। যে সব জায়গায় প্রজার উদ্বৃত্তের উপর জমিদার নির্ভর করত, সেখানে তার প্রভুত্ব অনস্বীকার্য। একথা ঠিকই, ইংরেজ শাসন কালের প্রথমদিকে জমিদাররা মুস্কিলে পড়ে। অনেক সময়ই তাদের ক্ষমতার উপর আঘাত হানা হয়, যা তার সন্মানহানি করে। তাদের ক্ষয়ক্ষতি হয় সর্বৈব। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গে আবার তাদের সুখের দিন ফিরে আসে। তবে যে সব জমিদার সময়মত খাজনা দিতে পারত না, তাদের দুর্দশার শেষ ছিল না। ইংরেজ সরকার নির্দয়ভাবে তাদের জমিদারি নিলামে চড়িয়ে বিক্রি করে দিত। এর ফলে ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি হলেও পুরনো জমিদারি প্রথা একই নিয়মে চলতে থাকে। জমিদারি বলতে যে আর্থ-আইনি সম্পর্ক বোঝাত, তা একই থেকে যায়। এককথায় জমিদারিপ্রথা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকার চেষ্টা করেছিল যাতে লোকে জমিতে বিনিয়োগ যথেষ্ট লাভজনক মনে করে। জমিদারদের প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, যাতে তারা ঠিকমত খাজনা আদায় করতে পারে। যে সব জায়গায় জমিদাররা এই ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিল, সেখানেও সরকার সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে ইচ্ছুক ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম দশকে কিছু জমিদার হয়েছিল সর্বস্বান্ত, আবার উনিশ শতকের প্রথম দিকে জমিদারি ব্যবস্থার উন্নতি দেখা যায়। চাষের উন্নতি, ফসলের দামের স্থায়ীত্বই নয়, আস্তে আস্তে বাজার চড়া হওয়া এবং জমির দাম বাড়া, এই সব নানা কারণে ভূ-সম্পত্তি আবার লোককে আকৃষ্ট করতে লাগল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জমিদারদের অবস্থা পড়তে শুরু করলেও তা সর্বব্যাপী চেহারা নেয় নি। এ প্রসঙ্গে দুটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করব। এর কারণ হল প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীগুলি আংশিকভাবে জমিদারদের ক্ষমতা দখল করেছিল। ক্ষমতা চলে যাবার আরও কারণ ছিল। যেমন জমিদারি ক্ষমতায় প্রথম আঘাত হানে সরকার নিজে। যে সব ক্ষমতা জমিদার অপব্যবহার করত, তা অবলুপ্ত করে দেওয়া হয়। যদিও এটা সব জায়গায় হয় নি এবং হঠাৎ করেও

হয়নি। তাও এর ফলে জমিদারদের ক্ষমতা ও সম্মান অনেক অংশেই নষ্ট হয়ে যায়। খাজনা বাড়াতে তাদের নানা বিরূপতার সম্মুখীন হতে হয়। মাঝে মাঝে ধনী চাষী বা জোতদারদের নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক বিদ্রোহ তাদের অতিষ্ঠ করে তোলে। কৃষি পরিচালনাও এক বিরাট ঝক্কি বলে মনে হয়। অর্থকরী শস্য চাষ বা ফসলের দাম বাড়ায় জমিদারের ঘরে কোন লাভই আসে না। অন্যদিকে, ফসলের মূল্যবৃদ্ধি তার প্রকৃত খাজনার অংশ কমিয়ে দেয়। তার আয় বাড়ে না, কিন্তু পোষ্যের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। ফলে, আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। এই সব পরিবর্তনের মধ্যে জমিদারের পুরনো দিনের কর্তৃত্ব আর থাকে না, নতুন চিন্তা ধারার যুগে জমিদারদের ও জমিদারি প্রথার সমালোচনা আরও বেশি করে ভিত টলিয়ে দেয়।

যে সব জায়গায় বিপক্ষ গোষ্ঠী চাষীদের উপর কর্তৃত্ব করতে পেরেছিল, সেখানে জমিদারের ক্ষমতা সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। জমিদারদের নিজেদের দোষেই অনেক সময় এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। নিজেদের বিস্তৃত সম্পত্তি এক হাতে সামলাতে না পেরে তারা অনেক সময়ই বাইরের লোকের হাতে স্থায়ী নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে খাজনা আদায়ের দায়িত্ব তুলে দিতে বাধ্য হয়। জমিদার ছাড়াও এই ব্যবস্থা আরো অনেকে নিয়েছিল। নতুন জমিমালিকরা অনেক সময়ই পুরনো চাষীদের (এককালে যাদের ঐ জমি ছিল) হাতে ভাগ চাষে জমি ছেড়ে দিত। অনেক সময় আবার দেখা গিয়েছে, জমিদারদের অধীনস্থ চাষীর উপর খাজনা বাড়ানোর যে অধিকার ছিল তা বড় ভূমি-মালিকরা আইনের সাহায্যে জমিতে নিজেদের স্বত্বাধিকার কায়েম করে নষ্ট করে দিয়েছে।

জমিদারদের পড়তি অবস্থার ফলে কৃষি জগতে শুধু জোতদাররাই নয়, জমিদারের আমলারাও লাভবান হয়েছিল। আমলারা যেভাবে জমিদারি খাতায় জমা খরচ দেখাত, তাতে তাদের কারচুপি করার অনেক সুযোগ ছিল। জমিদারের নৈতিক ক্ষমতা নষ্ট হতে বসেছিল বলে এবং চাষীর জমি কোথায় কি ভাবে ছিল সে সম্বন্ধে তার ধারণা না থাকায়, তার পক্ষে কিছুতেই জানা সম্ভব ছিল না ঋণের কারবারিরা ও অন্যান্য ক্রেতারা কোথায় কতটা চাষীর জমি কিনে নিয়েছিল এবং পুরনো প্রজার জায়গায় নতুন লোকেরা কীভাবে ধীরে ধীরে কৃষি জগতে ঢুকে পড়েছিল। আরও একটা কারণ ছিল। পুরনো চাষী দেখত সে-ই খাজনা দিয়ে চলেছে, তখন এসব জায়গায় জমিদারের খাজনা বাড়ানর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হত, কারণ এখানে বড় চাষীর সঙ্গে ছোটদেরও বিশেষ লাভ হত। এ বিষয়ে অনেক কিছু বাড়িয়ে বলা হয়। যে সব জায়গায় জমিদারদের ক্ষমতা একেবারে নষ্ট হয়ে যায় নি, সেখানে তারা সব সময়ই আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করত এবং জোতদারদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক পুনর্নির্দ্ধারণের চেষ্টা করত। এ বিষয়ে তাদের সাফল্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আলাদা হত। তবে যে জোতদার ফসলের, বিশেষ করে ধান, চাল ও পাটের ব্যবসা করত, তাদের ভূমিকা সম্পর্কে অনেক সময়ই বাড়িয়ে বলা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে যে তথ্য পাওয়া যায়, তার থেকে জানা যায় যে, বেশির ভাগ ব্যবসাই খোলা বাজারে ছোট ব্যবসায়ীরা

করত। কয়েকটা জায়গা ছাড়া, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জোতদারদের হাতে এই ব্যবসার কেবল একাংশ ছিল। পাটের ক্ষেত্রে দেখা যায়, চটকলের মালিকরাই ক্রেতাদের বাজারে আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল এবং পাটচাষী ও বাজারের মধ্যে যে অসংখ্য সংযোগ ছিল তার মধ্যে একটি ছিল জোতদাররা।

গ্রামাঞ্চলে জমিদারদের লোকসানের বিনিময়েই হোক বা অন্য যে কারণেই হোক, জোতদারদের যে ক্ষমতা জারির কথা বলা হয়েছে, তা অতিরঞ্জিত। ভাগচাষের মোট জমির আয়তন অথবা উপ-প্রজাস্বত্ব কতটা ছিল, এই সব তথ্য দিয়ে এই ভুল ভেঙে দেওয়া যায়। যদি আমরা প্রভূত্ব ও দাসত্বের পরিমাপ করার চেষ্টা করি তাহলে শুধু বড় জোতদারদের কথা ধরলেই চলবে না।

জমির মালিকানা, এই বিষয়টি আমাদের এমন আবিষ্ট করে রাখে যে, আমরা ভুলে যাই, কৃষি কাঠামোয় বহু সংখ্যক ছোট চাষী নিজেরাই জমির মালিক ছিল এবং চাষ সংক্রান্ত পরিকল্পনা করত। তারা উৎপাদন সূত্রে নানা রকম সম্পর্কের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে পড়ত। এর সঙ্গে এতক্ষণ যে জমি মালিকানার কথা বলা হয়েছে তার বিশেষ সম্পর্ক নেই।

২

উনিশ শতকের শেষ অবধি চাষের আয়তনে কি কি পরিবর্তন ঘটেছিল তা সঠিক সংখ্যাতথ্যের অভাবে বিশেষ জানতে পারা যায় না। পরের দিকের অবস্থা অনেকটা বরং ভালো।[৪১] তবে মোটামুটি ভাবে এর ঝোঁক কোন দিকে ছিল এবং তা কোন সময় চাষের ওঠানামার জন্যে দায়ী ছিল কিনা, তা আমরা জানতে পারি। এই পরিবর্তনের আয়তন ও আকার ঠিক কতটা তা মাপার যদিও কোন উপায় নেই।

১৭৫৭ তে যখন ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত হল, তখনও পশ্চিমবাংলার যে সব জেলা, যেমন মেদিনীপুর, বর্ধমান ও ২৪ পরগনা ইত্যাদি, ১৭৪২ থেকে ১৭৫২-এর মধ্যে উপর্যুপরি মারাঠা (বর্গী) আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তার থেকে পুরোপুরি উঠে দাঁড়াতে পারে নি। এ সব জায়গার কোন স্থায়ী প্রজাগোষ্ঠী না থাকায় জমির মালিকরা প্রচলিত প্রথার জায়গায় ভাড়াটে মজুর দিয়ে চাষ করাত।

১৭৬৯-৭০-এর দুর্ভিক্ষের কারণে যে ক্ষতি হয়, তা এর থেকে সবরকমে আলাদা। এর ক্ষয়ক্ষতির পরিমান অনেক বেশি। পূর্ববঙ্গের কিছু জেলা ছাড়া বলতে গেলে সারা বাংলা বিধ্বস্ত হয়েছিল। গ্রাম বাংলায় যে পরিমান লোক না খেতে পেয়ে মারা গিয়েছিল, তা ইদানীং কালে আর কখনো ঘটে নি। বাংলার মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মারা গিয়েছিল। এর অধিকাংশই গ্রামের, ফলে চাষের খুব ক্ষতি হয়। এর ধাক্কা সহজে সামলান যায় নি। অবস্থা আয়ত্তে আসতে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পার হয়ে গিয়েছিল।

দুর্ভিক্ষের পর খাপছাড়া ভাবে হলেও, পতিত জমি উদ্ধারের কাজ শুরু হয়। ধীরে ধীরে

জন সংখ্যাবৃদ্ধিও এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলী ১৭৯৮ থেকে ১৮০৫ সালের মধ্যে যে বিশদ অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন, তার জবাব দিতে গিয়ে বেশিরভাগ জেলা কালেক্টর ও জজ স্বীকার করেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর চাষাবাদ বহু অংশে বেড়েছিল। পরের দিকে যে সরকারি প্রতিবেদন পাওয়া যায়, যা আরও তথ্য সমৃদ্ধ, তার থেকে জানা যায় এই প্রবনতা বহুদিন অবধি চলে এসেছিল। এক এক জায়গায় এক এক রকমভাবে গড়ে উঠেছিল। দেখা গিয়েছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় যে সব জায়গা অনুন্নত ছিল, সেখানে উন্নত জায়গার চেয়ে চাষবাস অনেক তাড়াতাড়ি বেড়েছিল। তীরহুত দুর্ভিক্ষের সময় অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। এখানকার কালেক্টর ১৭৯৬-এর আগে চাষের কোন রকম উন্নতির চিহ্ন দেখে নি। ১৮২৪-এর পরে নতুন চাষ উল্লেখযোগ্য পরিমানে বেড়েছিল। ১৮৪৭-এ এই জেলা পরিদর্শনের কালে ওয়াইত পতিত জমি উদ্ধারের পরিমান দেখে আশ্চর্য হয়। এই জেলার সবচেয়ে বড় পরগণা আলাপুরের অবস্থা দেখে ১৭৯৭ সালে কালেক্টর মন্তব্য করেছিল যে, এটা চিরকাল চিন্তার কারণ হয়ে থাকবে। আর ১৮৭০ এর মধ্যে এই জেলা এতটাই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে যে আলাপুরকে জেলার সবচেয়ে ধনী অঞ্চল বলে উল্লেখ করা হত। পূর্ণিয়ার পরেই বিহারের সবচেয়ে দরিদ্র জায়গা চম্পারণ। এখানেও সর্বোচ্চ পরিমাণ চাষ হয়। ১৮৩৭-এ এখানকার রাজস্ব পরিদর্শক উদাহরণ হিসেবে দেখায়, চম্পারণের সবচেয়ে বড় জেলা মাঝুয়াতে ১৭৯৩-এ অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে বেশির ভাগই ছিল অনাবাদী জমি এবং এর উত্তর দিক জঙ্গলে ভর্তি ছিল। এখন সেই সব অঞ্চল সমৃদ্ধ চাষের জায়গা।

বাংলা সম্পর্কে আমরা যে সংখ্যা তথ্য পাই, যথেষ্ট সন্তোষজনক না হলেও, তার থেকে আমরা চাষের এইরকম বৃদ্ধির কথা জানতে পারি। চাষাবাদ সবচেয়ে দ্রুত গতিতে বেড়েছিল পূর্ব বাংলায়। কারণ, ১৭৬৯-৭০-এর দুর্ভিক্ষে এরা সবচেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তাছাড়া পূর্ববঙ্গ নদী-নালার দেশ বলে, এখানে কখনোই জলের সংকট তেমনভাবে দেখা দেয় নি। সে জন্য উৎপাদনের ওঠা নামা অপেক্ষাকৃত কম। এই কম ওঠা নামার কারণেই উদ্বৃত্ত বেশি হত এবং পতিত জমি উদ্ধারের কাজ অব্যহত থাকত। বাংলার পশ্চিম জেলাগুলোতে নতুন চাষের কাজ তুলনায় অনেক কম ছিল। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলা খুব নিরাপদ ছিল না। মেদিনীপুরের পশ্চিমে জমি উদ্ধারের কাজ পরে বেশি হয়েছিল। কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এখানে মজুরের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল। এখানকার পাহাড়ি জমিতে সহজে চাষ করা যেত না। উত্তরের জেলাগুলিতে যে জমি পুনরুদ্ধারের কাজ হয়েছিল, তাও ইতস্তত ভাবে। ১৮৭১ সালে গত তিন দশকের মত ধানের উৎপাদন দেখতে গিয়ে দিনাজপুরের কালেক্টর ক্রফর্ড এখানকার কৃষি কাঠামোয় অস্থিরতা দেখতে পায়। তার মতে অনেক সময়ই চাষীরা যে জমি চাষ করত, তার জায়গায় অন্য জমি চাইত। আর সেই কারণেই তারা যখন তখন একটা জমি ছেড়ে আর একটিতে চলে যেত।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মধ্য ও পশ্চিম বাংলায় পতিত জমি উদ্ধারের কাজ বড় রকম ধাক্কা খায়। এর প্রধান কারণ, মহামারীর আকারে এক রকম জ্বর দেখা দেয় এখানে। প্রচলিত ভাবে যাকে ম্যালেরিয়া বলা হয়ে থাকে। আদমসুমারির তথ্য (১৮৭২-৯১) থেকে এর ক্ষয় ক্ষতির পরিমান জানা যায়।[৪২] বর্ধমান, রংপুর ও বীরভূমে তার পরের দু'দশকেও জন সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। হুগলিতে যে ৬ শতাংশ বৃদ্ধি দেখতে পাওয়া যায়, তার প্রধান কারণ, শিল্প প্রধান অঞ্চল বলে এখানে ক্রমাগত লোক আসতে থাকে চাকরির সন্ধানে। আশ্চর্যের কথা এই যে, স্থানীয় আমলাদের বয়ানে নদীয়া ও যশোর ১৮৭২ থেকে ৮১-র মধ্যে এই জ্বরে সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত হয়েছিল। এখানেও চাষের সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। ১৮৭২ এর ভুল তথ্যই এর জন্য দায়ী। মুর্শীদাবাদ, দিনাজপুর ও রাজশাহীতে লোকসংখ্যা একই থেকে যায়। পূর্ব বাংলায় যেখানে এই রোগে বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, সেই অঞ্চলের সঙ্গে পূর্বোল্লিখিত জায়গাগুলির ভীষণ তফাৎ চোখে পড়ে। ১৮৮১ থেকে ৯১-এর দশকে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত পশ্চিম ও উত্তর বাংলার সমৃদ্ধির হার যেখানে যথাক্রমে ৪.১ ও ৩.৪ শতাংশ সেখানে পূর্ব বাংলায় ১৪.৩ শতাংশ। এর বেশির ভাগই স্বাভাবিক কারণে। অভিবাসনের ভূমিকা এতে সামান্যই ছিল।

যেসব অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়েছিল, সেখানেই চাষের ক্ষতি হয়েছিল। এই রোগের প্রকোপে গ্রামাঞ্চলে বহু লোক মারা যায়। যারা বেঁচে গিয়েছিল তাদের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ে। স্থানীয় সরকারি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ক্ষেত মজুরদের সংখ্যা খুব কমে যায়। যেমন একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "পরিবারে স্বাস্থ্যবান মজুরের সংখ্যা খুব কমে যায়। নিজের ক্ষেত ছেড়ে অন্যের ক্ষেতে লোক দেবার কথা চিন্তাই করা যেত না। অনেক সময় তাদের নিজেদের ক্ষেতেই কাজ করার উপযোগী যথেষ্ট সংখ্যক লোক ছিল না।" ১৮৭২ সালে হুগলির এক জমিদার লিখেছে, "এর আগে কখনো দেখা যায়নি যে, ক্ষেত ভর্তি ফসল, কাটার অভাবে হয় পচছে, নইলে গরু ছাগলে নষ্ট করে দিচ্ছে। কারণ, তা কেটে ঘরে তোলার কোন লোক নেই।" যশোরের জনৈক সেটেলমেন্ট অফিসারও একই কথা বলেছে, "ধান কাটার মরশুমে কোন মজুর পাওয়া যাচ্ছে না।"

"এর ফলে হঠাৎ করে জমির দাম পড়ে গিয়েছিল। বর্ধমানের মত জনবহুল জেলাতেও বাস্তুভিটের আর তেমন চাহিদা রইল না। ধনী চাষীরাও মজুরের অভাবে নিজেদের জমির অংশবিশেষ বেচে দিতে লাগল। এ অঞ্চলের বহু গ্রামে সমস্ত চাষ-জমির প্রায় এক চতুর্থাংশ বহু বছর কোন চাষ আবাদ হল না। হুগলিতে আগে ক্রমাগত জনসংখ্যার চাপে ধান শুকোতে দেবার জমি পর্যন্ত পাওয়া যেত না। সেখানেও চার ভাগের একভাগ জমিতে চাষ বন্ধ রইল। ১৮৮০-র দশকে পশ্চিম পাবনায় অনেক জমিতে আস্তে আস্তে জঙ্গল গজিয়ে উঠতে দেখা গিয়েছে।"

একই সঙ্গে বাংলা ও বিহারের অনেক জায়গাতেই চাষের জমির পরিমান বাড়ছিল। এর বেশির ভাগই বসতি ঘিরে বেড়ে উঠছিল। সবচেয়ে বেশি বেড়েছিল সুদূর অঞ্চলে,

যেখানে যাযাবর মজুরের দল অন্য জায়গায় কাজ না পেয়ে বসতি গড়েছিল। এই কারণেই
এই সব নতুন আবাদী অঞ্চলে জনস্ফীতির হার অনেক বেশি ছিল।

চাষীদের অভিবাসন কয়েকটি নির্দিষ্ট জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিছু জেলায় জন সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছিল। ঐ সব জায়গায় অভিবাসী সাঁওতালরাই ক্ষেতমজুরের কাজ করত। উত্তর বাংলার বারিন্দ অঞ্চল, যা কিনা দক্ষিণ দিনাজপুরের একাংশ, মালদার পূর্ব-দিকের একাংশ, পশ্চিম বগুড়ার কিছু অঞ্চল ও রাজশাহী জেলার উত্তরাঞ্চলের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত, এখানেই সাঁওতালদের সবচেয়ে বেশি দেখতে পাওয়া যায়। সে সব জেলায় যাযাবর আদিবাসী মজুরের জমি উদ্ধারের কাজে কোনই ভূমিকা ছিল না, তাদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

এক, ম্যালেরিয়া আক্রান্ত জেলা যেখানে সামান্যই বৃদ্ধি হয়েছিল, দুই, উত্তর বাংলার অঞ্চল, যেখানে নতুন চাষাবাদ ও জনসংখ্যা একই সঙ্গে বেড়েছিল। তিন, বিহারের কয়েকটা জেলা, যেখানে পতিত জমি উদ্ধারের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে চলেছিল সমানে। প্রথমটিতে যেহেতু সমচেয়ে কম চাষ বেড়েছিল, তাই এখানে পরের দুটি অঞ্চল নিয়েই আলোচনা করা হবে। নতুন চাষাবাদের সুযোগ সবচেয়ে বেশি ছিল দ্বিতীয় ক্ষেত্রে । এখানে সুন্দরবনের বিস্তৃত অনাবাদী জমিকে উর্বর করে তুলেছিল নদী থেকে বয়ে আসা পলি। এখানে প্রত্যেক জেলায় আলাদা সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল। ঢাকা ও ময়মনসিংহের এরকম অঞ্চল বলতে বোঝাত স্বল্প জনবসতির মধুপুরের জঙ্গল, যা ঢাকার উত্তরাংশে তরাঙ্গায়িত শক্ত জমির অংশ। এই অঞ্চলে পতিত জমি উদ্ধারের কাজ শুরু করে বিভিন্ন মঙ্গোলীয় আদিবাসী গোষ্ঠী। ফরিদপুরে এই কাজ শুরু হয়েছিল দক্ষিণ দিকের জলা ঘিরে। এখানে বিস্তৃত পার্বত্য উপত্যকার মধ্য দিয়ে নানা নদীনালা বয়ে গিয়েছে। এখানে চণ্ডাল নামে পরিচিত যে নিম্ন বর্গের চাষী সম্প্রদায় বাস করত, তারাই প্রথম জমি উদ্ধারের কাজে হাত দেয়।

বিহারের অনেক জেলায় যেমন সারন, মজফ্ফরপুর ও দ্বারভাঙ্গা সহ পুরো বাংলা প্রেসিডেন্সিতে সবচেয়ে বড় কৃষি প্রধান গ্রামাঞ্চলে পুনরুদ্ধারের কাজ বিশেষ হয় নি বললেই চলে। তাই এখান থেকে লোকে সুদূর উত্তরে চলে গিয়েছিল। কারণ দক্ষিণে ঘনবসতি ছিল। চম্পারনেও দেখা গিয়েছে, দূষিত আবহাওয়ার কারণে নতুন চাষের বিশেষ প্রসার হয়নি। তাই দক্ষিণের পুলিশ থানার অধীনের বাসিন্দারা উদ্যোগী হয়ে উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে উত্তর দিকে চাষাবাদের জন্য চলে যায়। এখানকার জমি পুনরুদ্ধারের কাজ অন্য জায়গা থেকে খানিকটা আলাদা। এখানে কঠিন পাহাড়ি জমিতে থরু নামে এক আদিবাসী সম্প্রদায় প্রথম এই কাজ শুরু করেছিল।

বিহারের জমি উদ্ধারের কাজে তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যনীয়। এক, নতুন চাষের আয়তন খুব ছোট ছিল ; দুই, উনিশ শতকের শেষের দিকে পুনরুদ্ধারের কাজের গতি আগের থেকে অনেক কমে গিয়েছিল ; তিন, জেলার দক্ষিণ দিকের নতুন অঞ্চলগুলো পুরনো জায়গা

থেকে নিম্নমানের ছিল। ১৮৪৫ থেকে ১৯০০-র মধ্যে চাষের কাজ সারণে ২ শতাংশ, দ্বারভাঙ্গায় ৫ শতাংশের একটু কম ও মজফরপুরে ৫ শতাংশ বেড়েছিল।

চম্পারণে, যেখানে নতুন চাষের কাজের বৃদ্ধির পরিমাপ ছিল ২০ থেকে ২৫ শতাংশ, সেখানেও ১৯ শতকের গোড়ার দিকে, পরের দিকের চেয়ে অনেক বেশি জমিতে চাষ শুরু হয়েছে। চম্পারনের সেটেলমেন্ট অফিসারের মতে: "অন্য অনেক জেলার মত, চম্পারনেও উনিশ শতকের প্রথম দিকে অনেক দ্রুত কৃষির অগ্রগতি হয়েছে।" উত্তর বিহারে যে নিকৃষ্ট জমির কথা বলা হয়েছে, তা এ অঞ্চলের প্রধান ফসল অর্থাৎ ধানের জন্য কতটা উর্বর, তার মাপকাঠিতে বিবেচিত হয় নি। আরও অন্য অনেক কারণ ছিল। যে সব চাষী উত্তরে বসবাস করতে যায়, তারা প্রধানত এক কৃষি প্রধান অঞ্চল (যেখানে নানা রকম চাষ হত) থেকে আর এক অপেক্ষাকৃত কম চাষবাসের অঞ্চলে চলে গিয়েছিল। দক্ষিণে নানা ধরনের অর্থকরী ফসলের চাষ হত। উত্তরে চাষ বলতে শুধু ধান, তাও আবার বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। বৃষ্টি না হলেই খরা তাই উত্তরাঞ্চলের কৃষি অর্থনীতিতে দুর্ভিক্ষের এক বড় ভূমিকা ছিল। কোন কারণে যদি শীতের ধান ঘরে তুলতে না পারা যেত, তাহলে বসন্তকালের ফসল বলতে কিছু থাকত না। এই কারণে দুর্দশারও শেষ ছিল না।

বিহারের জেলাগুলির এই চেহারা বিশ শতকের প্রথম চার দশকে আরও প্রকট হয়ে উঠেছিল। ব্লিন ও ইসলাম তাঁদের রচনায় দেখিয়েছেন যে, বাংলার অবস্থা এর থেকে অল্পই ভাল ছিল। ইসলাম যে সিদ্ধান্তে ফিরে গিয়েছেন, তাতে তিনি ব্লিনের মূল সিদ্ধান্তের সঙ্গে সহমত হন। ব্লিন 'বৃহৎ বাংলা' বলতে যে বিহার ও উড়িষ্যাকে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করেছেন, তাতে বাংলার অগ্রগতির হার কমে গিয়েছে। ইসলাম ১৯২০ থেকে ১৯৪৬-এর বাংলার কৃষি সম্বন্ধে বলেছেন, "মোট চাষের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন উন্নতি না হলেও একর প্রতি চাষের সামান্য কিছু উন্নতি হয়েছিল।" খাদ্য শস্যের ও অর্থকরী ফসলের উন্নতি অবশ্য একেবারে আলাদা ছিল। প্রথমটির ক্ষেত্রে অল্প জমিতে যে উন্নতি হয়েছিল, মোট উৎপাদনের হিসেবে তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। আর অর্থকরী শস্যের বেলায় ঠিক এর বিপরীত। মোট জমিতে যা চাষ হত, তা খাদ্য শস্যের চেয়ে কম হলেও, একর প্রতি লাভ ছিল অনেক বেশি।

৩

এবারের আলোচনা, গ্রামীণ কৃষি কাঠামো কী ভাবে কৃষির গতি অর্থাৎ উন্নতি অবনতিকে প্রভাবিত করেছিল ? যে সব ক্ষেত্রে কৃষি কাঠামো থেকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা যায়, সে সব ক্ষেত্রে অন্য কোন বিষয়ের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে ?

উনিশ শতকের শেষ অবধি মোট উৎপাদনের পরিমান ঠিক কতটা ছিল তা, হয় তথ্যের অভাবে, নয়ত একান্ত স্বল্প তথ্যের কারণে ঠিক জানতে পারা যায় না। এ ক্ষেত্রে যা করা

হয়ে থাকে তা হল, একর প্রতি কতটা তফাৎ হচ্ছে তার একটা হিসাব কষা। সরকারি প্রতিবেদন থেকে উৎপাদন বিষয়ে যে সময়ের তথ্য পাওয়া যায়, তার আগে একর প্রতি চাষ কতটা বেড়েছিল, সে সম্বন্ধে সব তথ্য অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ে। উর্বর চাষের জমির একটা পরিসীমা থাকলেও বাংলা ও বিহারের প্রধান শস্য চাল উৎপাদন একর পিছু কেন কমে যাচ্ছিল তা জানতে পারা যায় না। এর কারণ অনুসন্ধান আলোচনার পরবর্তী অংশে।

কৃষির অবনতির প্রথম কারণ হল, ১৭৬৯-৭০-এর দুর্ভিক্ষ। এই মহামারী দুর্ভিক্ষ কেন হয়েছিল? এর পিছনে কি তখনকার কৃষি কাঠামোর কোন ভূমিকা ছিল? এর থেকে আগের আর্থিক অবস্থায় ফিরে আসতে যে এত সময় লেগেছিল, তার জন্যও কি তখনকার কৃষি ব্যবস্থা দায়ী?

ইদানীং কালে যে সব কাজ হয়েছে, তাতে খাদ্যের অভাবই যে দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ — এই যুক্তি খণ্ডন করা হয়েছে। যে সব জায়গায় খাদ্যের অভাবের কারণে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, সেখানেও অনাহারের সঙ্গে আরও নানা কারণ থেকেছে (সেন ১৯৮১; ১,৫ ও ১০ম অধ্যায়)। যাঁরা এই মতের অনুসারী তাঁরা মনে করেন যে, হস্তান্তরের ভিত্তিতে সংগৃহীত ন্যায্য পাওনার অবনতির ফলেই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

মালিকানা সূত্রে অধিকার নানা প্রকার হত। যেমন ব্যবসা সূত্রে, উৎপাদন জনিত এবং নিজের শ্রমের ভিত্তিতে। হয় ব্যবসা-বানিজ্য করে বা উৎপাদন করে কিংবা দু' রকম ভাবেই মানুষ তার শ্রমের বিনিময়ে বাজার থেকে কিছু কিনতে পারে। এইভাবে সে যে সব পণ্য আহরণ করত, তাকে হস্তান্তরের ভিত্তিতে সংগৃহীত ন্যায্য পাওনা বলা হয়। এই লেনদেন যেখানে অসফল হয়েছে, সেখানেই দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, একজন ক্ষেত মজুর, যার একমাত্র সম্পদ তার শ্রম, এমন একটা অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে যেখানে তার শ্রমের চাহিদা কমে গিয়েছে অথবা তার পারিশ্রমিক একেবারে কমে গিয়েছে বা তার কোন স্থিরতা নেই। এখন এই অবস্থায় তার শ্রমের বদলে সে যতটুকু মূল্য পাবে, তা চালের মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে নিতান্তই কম। সমাজের অন্য অনেকের থেকে কৃষিজীবীরা কেন দুর্ভিক্ষে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তা পুরোপুরি খাদ্যদ্রব্য পাওয়া না পাওয়ার উপর নির্ভর করত না। এর সঙ্গে শুধু রোজগারের প্রশ্নও জড়িয়ে ছিল না। তার সক্ষমতা কতটা এবং কি দামে তা বিক্রী করতে পারত এই বিষয়টাও জড়িত ছিল।

অনেকের মতে, কৃষি কাঠামোর এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মনে হবে এর সঙ্গে দুর্ভিক্ষের যোগ আছে। এখানে সব দরিদ্র মানুষের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে না, তাদের মধ্য থেকে বাছাই করে এক শ্রেণীর উপর জোর আরোপ করা হচ্ছে।

১৭৬৯-৭০-এর দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ ছিল খাদ্যাভাব। গ্রামসমাজের এক বিশেষ শ্রেণী এতে সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণাভোগ করেছিল। তবে যে পরিমান মানুষ না খেতে পেয়ে মারা গিয়েছিল এবং যে সংখ্যায় লোক গ্রাম ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল, যার ফলে জনসংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ কমে যায়, তার সঠিক ব্যাখ্যা করা যাবে না, যদি না খাদ্যের দামের বৃদ্ধির

বিষয়টা এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এই মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ, পর পর দু'বছর — ১৭৬৮ ও ১৭৬৯-এ যথেষ্ট উৎপাদন না হওয়া। স্থানীয় বাজার থেকে ক্রমাগত ফসল বাইরে সরবরাহ হতে থাকায় এই চাপ আরও বাড়তে থাকে। প্রচলিত বাজার প্রথা অনুযায়ী ধান চালের রপ্তানি হতে থাকে। তা না হলে চালের ব্যবসায়ীদের লোকসান হবার কথা। এর উপর কোম্পানি যখন নগদ টাকার বিনিময়ে যুদ্ধরত সৈনিকদের জন্য চাল কিনতে থাকে, তখন অবস্থা আরও চরমে ওঠে (চৌধুরী ১৯৭৬, পৃ ২৯৫)। এর উপর আবার কোম্পানির চাকুরে ও তাদের গোমস্তারা বাজারে তাদের এক চেটিয়া অধিকার খাটিয়ে চালের একটা বড় অংশ সরিয়ে ফেলে। তখন সংকট আরো ঘোরালো হয়ে দাঁড়ায়। ব্যবসাদাররা যেই বুঝতে পারে যে পরের শীতে ধান হবার সম্ভবনা খুব কম, তখন তারা চাষীদের যে আগাম দিত অসময়ে চলাবার জন্য, তা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। তাদের ভয় ছিল, যে রকম আকাল সামনে আসছে তাতে চাষীরা ধারের টাকা শোধ দিতে পারবে না।

তখনকার কৃষি পরিস্থিতি বিচার করে দেখলে বলা যায়, এরকম ভয়াবহ অবস্থা সামাল দেওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল নতুন শাসনতন্ত্রের, যার কাছে এই অবস্থা ছিল অপরিচিত। শস্য উৎপাদনে ঘাটতি ছাড়াও, খাদ্যাভাবের প্রধান কারণ ছিল সরকারের হঠাৎ হঠাৎ চাল কেনা। তাও এমন এক বাজার থেকে যা ভীষণ চাপের মধ্যে ছিল। এ ছাড়াও সরকারের অবাধ বানিজ্য নীতির ফলে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত এলাকা থেকে বিরাট পরিমানে খাদ্যদ্রব্যের রপ্তানি করা হয়। সরকার কোন রকম ভাবেই স্থানীয় বাজারে খাদ্য শস্য মজুত রাখতে পারেনি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণের অর্দ্ধেক ছিল খেতে না পেয়ে মৃত্যু। মধ্য চাষীর মৃত্যুও কিছু কম হয় নি। পুরো চাষের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ যে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তার নিদর্শন চারিদিকে ছড়িয়ে ছিল। দুর্ভিক্ষের সঠিক ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করতে ১৭৭২ সালে যে কমিশনারদের নিযুক্ত করা হয়েছিল, তারা দেখেছিল দেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধ জায়গাগুলি দুর্ভিক্ষের প্রকোপে শ্মশানে পরিনত হয়েছে। দুর্ভিক্ষে জনসংখ্যা হ্রাস অন্যতম ঘটনা। সবচেয়ে বেশি মৃতের সংখ্যা দেখা যায় কৃষি মজুরদের মধ্যে।[৪৩] বাইরে থেকে মজুর আসার ফলে মজুর সংকট মিটে যাবে বলে সরকার যা ভেবেছিল, তা আদপেই হয় নি। দুর্ভিক্ষের কারণে ছোট চাষীদের সর্বনাশ ও জমিদারদের ক্ষতি হয়েছিল বলে, কৃষিতে যে পুঁজি নিয়োগ হত, তা ভীষণভাবে কমে যায়। জমিদাররা আর চাষীদের অগ্রিম ধান চাল বা নগদ টাকা কিছুই দিতে পারত না। তারা নিজেরাই আর্থিক সংকটে পড়েছিল।

দুর্ভিক্ষের পর প্রথম দু-তিন দশকে যে আর্থিক উন্নতি হয়নি, তাতে চিরাচরিত কৃষি কাঠামোর বিশেষ ভূমিকা ছিল না। পরে বলা হয়েছে যে, এর পিছনে অঞ্চল বিশেষে জমিদারদের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার পথে অদ্ভুত কিছু বাধা আসে। দুর্ভিক্ষের পরের বছরগুলিতে প্রচুর শস্যের উৎপাদন হয়েছিল, ফলে পর পর তিন বছর শস্যের দাম কমে যায়। সেই সময়কার সরকারি প্রতিবেদন থেকে প্রচুর উৎপাদনের ফলে সস্তায় চাল বিক্রির কথা জানা যায়। এই সময়ের দুটি প্রধান বিষয় হল, এক, এতবড়

এক বিধ্বংসের পরও খাজনা আদায়ে কোন ছাড় ছিল না; দুই, স্থানীয় বাজারে খাদ্য শস্যের চাহিদা কমে যাওয়া। প্রথম কারণটির সঙ্গে যুক্ত ছিল ফসল ঘরে তোলার সঙ্গে সঙ্গেই চাষীদের তা বিক্রি করে দেওয়ার বিষয়টি। খাদ্য শস্যের চাহিদা পড়ে যাওয়ার ঘটনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সরকারি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে: মৃত্যুর ঘটনা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় শ্রমিক, হস্ত শিল্পী এবং যাদের জীবিকা নদীর উপর নির্ভরশীল ছিল তাদের মধ্যে। এরা চাষীদের থেকে অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এরাই খাদ্যশস্যের চাহিদা তৈরি করত। প্রতিটি ফসলের মন্দা দেখা গেলেও হস্তশিল্পের বাজারে চাহিদা ছিল। কম পরিমাণে রূপো আমদানির ফলে দুর্ভিক্ষের আগে থেকেই মুদ্রা-সংকট দেখা দিয়েছিল।[৪৪] অষ্টাদশ শতাব্দর শেষ পর্যন্ত এই মুদ্রা-সংকট বজায় ছিল এবং তা সেই সময়ের পরিস্থিতিকে আরও চরমে পৌঁছে দেয়। তবে সমস্যার কারণ শুধু এটাই ছিল না। সমস্যা ঘনীভূত হওয়ার পিছনে মুদ্রা সংকটের অবদান ছিল।

খাদ্য শস্যের দাম কমে যাওয়ায় কৃষকের আয় কমে যেতে থাকে আর সেই সময়েই কৃষকের টাকার দরকার ছিল সবচেয়ে বেশি। কয়েকটি জায়গায় যেমন দিনাজপুর ও পূর্ণিয়ায় চাষীরা ধারের টাকা ও খাজনা দিতে পারত না। সরকারের নীতি এই অবস্থাকে আরও শোচনীয় করে তোলে। এই সময়ে চাষাবাদে বড় পরিমাণে বিনিয়োগ হলে ক্ষতিগ্রস্ত আর্থিক অবস্থার খানিকটা সুরাহা হত। সরকারের দিক থেকে তুঁত চাষের উৎসাহ দেওয়া ছাড়া আর কোন উদ্যোগই দেখা যায়নি। তুঁতচাষের জমির খাজনা কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ধান জমিতে যাতে তুঁত চাষ না হয়, সে বিষয়ে সরকারের নজর ছিল। কিন্তু আর্থিক অবস্থা উন্নত করার জন্য সরকার এ ব্যবস্থা নেয় নি। তুঁত চাষীদের উপর এই দাক্ষিণ্যের কারণ বিলেতের বাজারে রেশমের রপ্তানি।

বহুকাল পর্যন্ত সরকারের রাজস্ব নীতি গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতির পথে বাধা হয়েছিল। এতবড় সংকটের পরও সরকার খাজনা আদায়ের কাজে এতটুকুও ঢিলে দেয়নি। এমন কি সরকার স্বীকারও করেছে যে, এই সময় কঠোর নীতির ফলে, তাদের রাজস্ব থেকে আয় আগের তুলনায় সামান্যই কমেছিল। এরকম এক কঠোর নীতিকে 'নাজাই' বলা হয়। নাজাই মানে দুর্ভিক্ষের সময় যারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তাদের দেয় খাজনা তাদের প্রতিবেশীকে দিতে হবে। বাংলার প্রতিটি গ্রামে এই নিয়ম বলবৎ করে খাজনা আদায় করা হয়েছিল।[৪৫]

জমিদাররা, কার্পণ্য সত্ত্বেও এতদিন ধরে চাষ বৃদ্ধি, নিদেন পক্ষে গ্রামীণ অর্থনীতিতে স্থিতি আনার যে প্রচেষ্টা নিয়েছিল, সরকারের রাজস্ব ব্যবস্থা তা নস্যাৎ করে দেয়। তাদের দুটো প্রধান কাজ ছিল — স্বত্বহীন ভূমিদান, বেশির ভাগ সময়ই পতিত জমি, যাতে লোকে বসতি স্থাপন করতে পারে এবং পাশের জমিদারি থেকে এই সব জায়গায় বসতি স্থাপন করতে চাষীকে উৎসাহিত করা। কোথায় কি খাজনা-বিহীন জমি পড়ে আছে, তা দেখতে গিয়ে সরকার ১৭৮৮-র পরে সব জমিতে জরিপের কাজ শুরু করে। এর ফলে যে জায়গায়

চাষীরা পতিত জমির একাংশ নিজেদের স্বত্বাধিকার জমির সঙ্গে জুড়ে নিয়েছিল, তার উপরও খাজনা বসে। বহিরাগত মজুরের সাহায্যে যে বিশাল এলাকায় আবাদ বসান হচ্ছিল সেই কাজেও বাধা পড়ে। এই রকম ঘটনা বিশেষভাবে দেখতে পাওয়া যায় বীরভূম অঞ্চলে, যেখানে সবচেয়ে বেশি লোক দুর্ভিক্ষে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। বীরভূমরাজ প্রতিবেশী এলাকা থেকে কম খাজনায় বসতির লোভ দেখিয়ে বহুপ্রজাকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছিল। ১৭৮৮ তে সরকার যখন নতুন করে খাজনার পরিমান নির্দ্ধারণ করা শুরু করে, তখন লোক আসা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে বহিরাগত প্রজারা যে সুবিধা উপভোগ করে থাকত, তা আর বহাল রইল না। পুরনো প্রজারা এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করায় বীরভূমরাজও নতুন প্রজাদের আর খাজনার ব্যাপারে আগের সুখ-সুবিধা দিতে রাজি হয় না। বহিরাগতরা ততদিনে স্থানীয় অর্থনীতির সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ায় এই পরিবর্তনের বিরোধিতা করে। বীরভূমরাজ যখন এই বিদ্রোহ দমনে অক্ষম হয়, তখন ইংরেজ জেলা শাসক সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে।

১৭৯০-এর পর চাষাবাদ বেড়েছিল বলে সব জায়গায় যে তথ্য পাওয়া যায় তা কেমন করে হল?[৪৬] সেই সময়ের কৃষি কাঠামো এই পরিবর্তন কিভাবে ও কতটা মেনে নিতে পেরেছিল?

এর পিছনে প্রধান কারণ হল, জনসংখ্যা বৃদ্ধি। দুর্ভিক্ষে গ্রামাঞ্চলের বহুলোক মারা গিয়েছিল। চাষাবাদও সেই আগের পদ্ধতিতেই হত। সমসময়ের লোকেরা এক রকম নিশ্চিন্ত ছিল অবস্থার পরিবর্তন হবে। তবে উৎপাদন বৃদ্ধি ঠিক কতটা হবে তা তারা জানত না। এ বিষয়ে বুকানন ১৮০৮ থেকে ১৮১২-র মধ্যে দুর্ভিক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া জেলা অত্যন্ত খুটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন। এ বিষয়ে তাঁর মতই গ্রহণ-যোগ্য। দিনাজপুরের জনসংখ্যা তাঁর বিশাল মনে হয়েছিল। তাঁর পর্যটনের আগের চার দশকে, তিনি মনে করেন পূর্ণিয়াতে প্রায় শতকরা একশ' ভাগ লোক বেড়েছিল। বৃহত্তর বাংলার জন সংখ্যার চাপ দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে যান। এরকম জনসংখ্যাবৃদ্ধি আরো নানা জায়গায় যে হয়েছিল তার অনেক তথ্য আছে। এই লোক বেড়ে যাওয়া পতিত ও জলাভূমিতে বসতি স্থাপনের একমাত্র কারণ এমন নয়। যা সবচেয়ে দরকার ছিল তা হল, এই মজুরদের কতটা কর্মদক্ষতা ছিল এবং প্রয়োজন মত তাদের পাওয়া যেত কিনা এই বিষয়টা জানা। বুকাননের মতে এরা তেমন কর্মঠ ছিল না। দিনাজপুরের লোকেরা বেশিরভাগই দুর্বল ও ক্ষীণকায় ছিল, ফলে তাদের যথেষ্ট কাজ করার শক্তি ছিল না। এর কারণ হিসেবে তিনি বাল্য বিবাহ ও প্রতিবছর জ্বরে বহু সংখ্যক লোকের মৃত্যুকে দায়ী করেছেন। তার পর্যটনের আগের চার দশকে ৩৩.৩ শতাংশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও যে চাষবাসে তেমন উন্নতি হয়নি তার কারণ এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য ভালো নয় এবং শিশুরা বেজায় দুর্বল। তাঁর বক্তব্য, পূর্ণিয়ার লোকেরাও অবসন্ন ও নির্জীব ছিল এবং ভাগলপুরের লোকের অলসতা ও অপটুতা অতুলনীয়। বুকানন দেখিয়েছেন, সেই সময়েই ঋণের সঙ্গে মজুরের সচলতা

সত্ত্বেও উদ্যোগী ভূমি মালিকরা কিভাবে জড়িয়ে ছিল, যার জন্য এত বেশি লোক থাকা সত্ত্বেও উদ্যোগী ভূমি মালিকরা অনেক সময়ই পর্যাপ্ত মজুর পেত না। এই কারণেই পূর্ণিয়াতে বিদেশীরা এসে কুলি পেত না, যদিও দিনাজপুরের চেয়েও এখানে অনেক বেশি সংখ্যক লোক গৃহভৃত্য হয়ে বা ভাড়াটে মজুর হিসেবে খাটত। এদের বেশির ভাগই প্রভুদের কাছে আকণ্ঠ ঋণে ডুবে থাকত, যার ফলে স্বাধীন রোজগারের কোন উপায় ছিল না। বছরের পর বছর এরা ঋণদাতার ভৃত্য হয়ে থাকত।[৪৭]

উৎপাদন বৃদ্ধি যে কেবল মাত্র মজুরের জন্য হয়নি, তার আরও দুটি কারণ ছিল। এক, স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠা জন সংখ্যা সব রকম মজুরের স্থান পূর্ণ করতে পারত না। দুই, পতিত জমি হাসিলের কাজে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ছিল, তার অল্পই ছোট চাষীর পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল। এমন কি যেখানে তারা বহিরাগত চাষী, সেখানেও।

যে কোন অঞ্চলেই জমি হাসিলের কাজের জন্য স্থানীয় মজুর যথেষ্ট সংখ্যক ছিল না। বীরভূমের ক্ষেত্রে বাইরে থেকে আসা ক্ষেত মজুরের ভূমিকা আগে আলোচনা করা হয়েছে। এদের আসার কারণ যে, শুধুমাত্র পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জনসংখ্যাবৃদ্ধি, তা কিন্তু নয়। এও সম্ভব যে, এরা তাদের সময় খুব নিপূন ভাবে তাদের পুরনো পেশা অর্থাৎ চাষাবাদ এবং নতুন পেশা অর্থাৎ জমি উদ্ধারের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিল। বলাই বাহুল্য, পাশের গাঁয়ের জমিদার যে দ্বিতীয় কাজের জন্য খাজনা থেকে রেহাই দিয়েছিল, সেটা এর অন্যতম কারণ।

বাংলার সব জায়গায় এইভাবে দূর থেকে আসা ভাড়াটে চাষী দিয়ে নতুন চাষ হয়নি। দুর্ভিক্ষের পরে এই দূরাগত মজুরদের দেখা যায় নি। তখন বেশির ভগ বহিরাগত চাষী ছিল হয় আদিবাসী, না হয় উপজাতি সম্প্রদায়ের। এই সব শ্রমজীবীরা পতিত জমিতে যে বসতি বসায় তা দুর্ভিক্ষের কারণে হয়নি। বাইরে থেকে চাষীরা আসার অনেক আগেই এই জমিতে অল্প সংখ্যক লোক বাস করত।

মেদিনীপুর ও বাঁকুড়াতেও এইভাবে চাষের নবজন্ম হয়। বিশেষতঃ দক্ষিণের পরগণা গুলোতে চিরকালই চাষ করা কঠিন ছিল, কারণ পাথুরে জমিতে জল ধরে রাখা যায় না। এখানে মণ্ডল বলে পরিচিত আদিবাসী সর্দার নতুন চাষাবাদ পরিচালনা করে। যেসব জায়গায় প্রধানত আদিবাসী বা উপজাতি যেমন, সাঁওতাল, ভূমিজ এবং মাহাতোরা থাকতো, সেখানেই এই মণ্ডল প্রথায় জমি পুনরুদ্ধারের কাজ হত। এর থেকে এইসব জায়গায় মজুরের পরিমান কত ছিল তা বোঝা যায়। ১৮৩০-এর পর মেদিনীপুরের জঙ্গল এলাকায় মণ্ডলী প্রথাই কৃষি অর্থনীতির প্রধান পদ্ধতি হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৩৯-এ যে কর্মচারীকে এখানে খাজনা নির্দ্ধারণ করতে বলা হয়েছিল, তাকে জমিতে মণ্ডলদের কি এবং কতখানি অধিকার তা ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে হয়েছিল। কারণ, এর অনিশ্চয়তার দরুণ স্থানীয় জমিদারের সঙ্গে তার মনোমালিন্য হয়ে গিয়েছিল। বাঁকুড়াতেও আদিবাসী ও উপ-আদিবাসীরা জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করেছিল।

রংপুরের দক্ষিণের পরগনাগুলোতে, যেমন বৈকান্তপুরে যে বহিরাগত চাষীদের জমি

পুনরুদ্ধারের কাজ করতে দেখা যায়, তারা জাতিগত ভাবে আলাদা ছিল। তারা প্রধানত মুসলমান। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এদের সংখ্যা নগন্য হলেও বুকানন ১৮০৯ সালে যখন এ জায়গায় সমীক্ষা করেন, তখন তারা পুরো জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশ ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে 'বারিন্দ' অঞ্চলে (দিনাজপুর, মালদা, রাজশাহী ও বগুড়ার বিস্তৃত জায়গা জুড়ে এর পরিধি) যে নতুন চাষ হয়, তা প্রধানত বহিরাগত সাঁওতাল-মজুর দিয়ে হয়েছিল।

যে সব জায়গায় স্থানীয় মজুর অপ্রতুল ছিল, সেখানে কোথা থেকে, কেমন ভাবে অর্থের যোগান হয়েছিল, তা ভালোভাবে জানা নেই। তবে অনেকে যে মনে করে, এতে জমিদার ও অন্য ভূমি মালিকদের কোন ভূমিকা ছিল না, তা ঠিক নয়। এমনও বলা হয়েছে যে, এরা কৃষি জগতের পরগাছা, এরা নিজেদের খাজনা-আয়ের একাংশও চাষের উন্নতিতে ব্যয় করত না। এসময়ে চাষে যেটুকু উন্নতি হয়েছিল, তা মূলত ছোট চাষীদের উদ্যোগেই সম্ভব হয়েছিল।

এই মতবাদ যেমন সরল, তেমনি অসম্পূর্ণ। তখনকার সম-সাময়িক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ছোটচাষীদের এত টাকা ছিল না যে, নতুন চাষে পুঁজি ঢালতে পারে। বেশির ভাগ চাষীই ছিল অত্যন্ত দরিদ্র। চাষীদের মধ্যে একটা বড় গোষ্ঠী হয় মহাজন, না হয় চালের কারবারি বা ধনী চাষী অর্থাৎ জোতদার। এদের কাছে তাদের জীবিকা ও চাষের ব্যয়ভার বহন করার জন্য দায়বদ্ধ হয়ে থাকত। বুকানন দেখেছেন যে, দিনাজপুরের অর্দ্ধেক চাষ বিত্তবান চাষী বা চালের কারবারিদের ধার দেওয়া টাকায় চলত।

জমিদাররা উপরে উল্লেখ করা দলে পড়ে না। উনিশ শতকের শেষের দিকে জমির বাজার যখন বাড়ছিল এবং তার সঙ্গে আরো নানা পরিবর্তন এসেছিল, তখন স্বভাবতই তাদের খাজনার আয় কোন কষ্ট না করেই বেড়ে যায়। আগের অবস্থা অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম তিন চার দশকের থেকে এখনকার অবস্থা অনেকাংশে আলাদা ছিল। তখন জমিদারকে একটা বড় অংশের খাজনা আদায়ের দায়িত্ব বহন করতে হত এবং প্রচুর উর্বর জমি অকর্ষিত পড়ে ছিল বলে সে চাষবাসের উন্নতির প্রতি আগ্রহী হয়। তার লক্ষ্য ছিল উৎপাদন বৃদ্ধি। যে সব নবাগত জমিদার নিলামে জমিদারি কিনেছিল, তারা এ বিষয়ে আরও বেশি আগ্রহী ছিল। বুকানন দিনাজপুরে লক্ষ্য করেছিলেন, এই নবাগত জমিদারদের জমিতে অনেক বেশি চাষ হত। ১৭৯৩-এর পরের বছরগুলোর রেকর্ড পড়ে যশোরের কালেক্টর ওয়েস্টম্যাক্টও একই সিদ্ধান্তে আসেন। ঋণে জর্জরিত অবস্থায় পুরনো জমিদাররা জমিদারির উন্নতির জন্য প্রায় কিছুই করতে পারে নি। অপর দিকে যারা নতুন জমিদারির মালিক তারা বেশিরভাগই কলকাতার ব্যবসায়ী, জমিদারিতে টাকা ঢেলে চাষের প্রসার ও উন্নতি সাধন করে তারা সহজেই নাম কিনেছিল।

যে সব জায়গায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় পতিত বা জলা জমি জমিদারির অংশ বিশষ হত, সেখানে জমিদারদের পুরো আধিপত্য থাকত। অনেক জায়গায় তারা একাজের সঙ্গে

সরাসরি যুক্ত। তারাই বহিরাগত চষীদের প্রজাস্বত্ব দিয়েছে, নতুন আবাদ বসানর প্রথম দিকের খরচ যুগিয়েছে এবং চষীদের জমি পুনরুদ্ধারের কাজে প্রলোভিত করার জন্য খাজনা কমান ও নানারকম সুবিধা দিয়েছে। দিনাজপুরের জমিদাররা ছোট বাজার বসাবার জন্য বিনা খাজনায় জমি দিত। ১৭৬৯-৭০-এর দুর্ভিক্ষের ঠিক পরে বীরভূমে, ১৭৯৩-এর পর উত্তর রংপুরের বৈকান্তপুরে এবং মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার জঙ্গল পরগনায় নতুন চাষের কাজ এইভাবে শুরু হয়।[৩৮] অনেক সময়ই এই চাষের অনেকখানি জমিদার উদ্যোগী জোতদারের হাতে সাময়িক স্বত্বে ছেড়ে দিয়েছে। পূর্ববাংলায় এই ব্যবস্থাকে নানা নামে বর্ণনা করা হয়, যেমন গ্রন্থী, জোত ও হাওলা। এরা যতক্ষণ দরদাম ঠিক রাখতে সক্ষম হত, জমিদার এদের মোটেই ঘাটাত না। এরা যখন মনে করত, জমিদাররা তাদের উপর অন্যায় করছে, তখন নিজেদের লোকজন ও অন্যান্য সম্পত্তি নিয়ে পাশের কোন জায়গায় চলে যেত। এরকম ঘটনা দিনাজপুরে দেখা গিয়েছে। এতে জমিদারদের নানাভাবে ক্ষতি হত। পশ্চিম বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরের মণ্ডলরা, যাদের মধ্যে অনেকেই আগে দালালের কাজ করত, এদের থেকে আলাদা ছিল। যেহেতু এদের ধন সম্পত্তি কম ছিল এবং নিজেদের গোষ্ঠী অথবা উপজাতির প্রতি আনুগত্য থাকত, তাই তাদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক, নতুন বসতির ক্ষেত্রেও একই রকম ঘনিষ্ঠ ছিল।

যে সব জায়গায় জমিদার সরাসরি জমি হাসিলের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল না, সেখানেও জমিদারির ব্যবস্থা এমন ছিল যে, জমিদার এই কাজে উদ্দীপনা যোগাত। বুকানন দিনাজপুরের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছেন, জনৈক ইজারাদার পুরস্কার হিসেবে খাজনার মোট লাভের ৪ থেকে ৬ শতাংশ এবং যে সব জমি ভাড়া দেওয়া হয় নি, তার থেকে যতটা লাভ করা সম্ভব পুরোটাই আত্মসাৎ করত। ইজারাদার নিজের স্বার্থেই যাতে চাষের উন্নতি হয়, তা চাইত। যদিও এই কাজের মেয়াদ এমনিতে তিন থেকে পাঁচ বছরের ছিল, কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই তারা পুনর্বহাল হত। বিহারের ঠিকাদার ও ইজারাদাররা বংশ পরম্পরায় চাষের কাজে যুক্ত ছিল। গ্রামাঞ্চলের পরিস্থিতির সঙ্গে খাজনা আদায়কারীরা পরিচিত ছিল বলে জমিদার এদের দীর্ঘমেয়াদী স্বত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করত।

একথা সত্যি যে কৃষি সমাজে জমিদাররা আদৌ পরগাছা নয় এবং চাষের উন্নতি সাধনে তাদের একটা ভূমিকা ছিল। এটা ভাবলেও ভুল হবে যে, জমিদারি প্রথাই এই প্রসারকে সাহায্য করেছিল। কোন হিতকর উদ্দেশ্যে জমিদার চাষের উন্নতিতে সহায়তা করে নি। বলতে গেলে কোথাও করে নি। নতুন চাষে তাদের আগ্রহের কারণ, এতে তাদের খাজনা বাড়বে। যে সব জায়গায় শুধু নতুন চাষের ফলে খাজনা বাড়ে নি বা যেখানে নতুন চষ ছাড়াও খাজনা বাড়ান সম্ভব ছিল না, সে সব অঞ্চলে জমিদাররা নতুন চাষাবাদে কোন আগ্রহই দেখায় নি।

এমনকি জমিদার যখন দেখেছে যে, চাষে বিনিয়োগ করলে লাভের সম্ভাবনা আছে, তখনও সে তা করেনি। চাষে টাকা খাটান অন্য আর পাঁচটা বিনিয়োগের মধ্যে একটা।

দূরদর্শীরা এতে লাভবান হত। যাদের এই দূরদৃষ্টি ছিল না, তারা চাষের পিছনে কোন অর্থ ব্যয় করত না। তারা এমন কিছুতে তা বিনিয়োগ করত, যার থেকে তাৎক্ষণিক লাভের সম্ভাবনা আছে। জমিদারদের কাছে এগুলোরই বেশি মূল্য ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, খাজনার থেকে আয় বাড়াবার উদ্দেশ্যে তারা স্বল্প মেয়াদের জন্য জমিদারি কাজকর্ম অন্য লোকের হাতে ছেড়ে দিত। তারা একবারও ভাবত না যে, আখেরে এতে অনেক লোকসান হতে পারে। যে সব জায়গা জমিদাররা এরকমভাবে বাইরের লোকের হাতে তুলে দিয়েছিল, সেখানেই সব থেকে বেশি শোষনের খবর পাওয়া যায়। তুলনায় জমিদারের অত্যাচার অনেক কম ছিল। তখনকার যা আইন তাতে, নানা অন্যায় অত্যাচার করেও এরা পার পেয়ে যেত কারণ এই আইনগুলি তাদের শোষনের ক্ষমতা দিত। অনেক সময় জমিদাররা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধিতে এই আইনের সাহায্য নিত। এই সময় ভূসম্পত্তিতে নানা ধরণের ঘটনাবলী জমিদারদের জমিতে বিনিয়োগ করতে বাধা দিয়েছিল, কিম্বা বিনিয়োগের হার কমিয়ে দিয়েছিল। বাজারে জমির দাম যত বাড়তে থাকে, জমিদারি শরিকদের মধ্যে তত মতবিরোধ দেখা দেয়। বিনিয়োগের ব্যাপারে অংশীদারদের মধ্যে কখনই মতের মিল হত না। যেমন, বিহারের অনেক গ্রামে সেচের জন্য যৌথ উদ্যোগ নেওয়া যায় নি। এ সময়ের আরও একটি ঘটনা হল, জমিদাররা নিজেদের ভূসম্পত্তির অংশ বিশেষ চিরস্থায়ী স্বত্বে দিয়ে দিচ্ছে। এটা প্রথম করে বর্দ্ধমান রাজ। পরে অন্য জমিদাররাও অনুসরণ করে। যেসব অঞ্চলের জমি এই ভাবে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানে চাষের উন্নতি নিয়ে জমিদাররা আর মোটেই মাথা ঘামায়নি।

জমিদারদের চাষে বিনিয়োগ যে ক্রমশ কমে আসছিল, তার পিছনে আরও নানা কারণ ছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় জমি কমে যেতে থাকে এবং কৃষকের জমির চাহিদা নানা কারণে বাড়তে থাকে। জমিদার বুঝতে পারে, জমিতে অর্থ ব্যয় না করলেও খাজনা বাবদ একটা নির্দিষ্ট আয় তার ঘরে আসবেই। যে সব জায়গায় জমি সংক্রান্ত আইন জমিদারদের কোনভাবে লাভের সুযোগ দিত না, সেখানে চাষে খরচ করতে জমিদাররা একেবারেই অনিচ্ছুক ছিল। চাষে অর্থব্যয়ের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি বা নিশ্চয়তা খাজনা বাড়ার কারণ হিসাবে গণ্য হত না।[৪১] চাষের উন্নতির পিছনে নানা কারণ থাকায় জমিদারদের অবদান ঠিক কতটা তা নির্ণয় করা শক্ত। যে সব জায়গায় চাষীরা দলবদ্ধভাবে বিরোধিতা করত, সে সব জায়গায় খাজনা বাড়াতে জমিদারদের বেগ পেতে হত। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জমি পুনরুদ্ধারের গতি যে কমে যায় তার জন্য জমিদারদের উদ্যোগের অভাব একমাত্র কারণ নয়। এসময় নতুন চাষের সুযোগও অনেক কমে যাচ্ছিল। ১৮৯০-এর দশকে উত্তর বিহারের বেশ কয়েকটি জেলার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। জনগণনার তথ্য থেকে জানা যায়, যে সব জায়গায় তখনও নতুন জমি ছিল, সেখানে সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে। এর প্রধান কারণ বহিরাগত মজুর আমদানি। এ সব জায়গার পরিবেশ অবশ্য স্থায়ী চাষের উপযোগী ছিল না। পুরনো চাষের জায়গা থেকে এ সব জায়গায় চাষের খরচ অনেক বেশি। পূর্ব বাংলা, যেখানে জমি

সেখানেও এই প্রবণতা দেখা যায়।
অনুপাতে লোকসংখ্যা সন্তোষজনক ছিল, সেখানেও এই প্রবণতা দেখা যায়।
অন্যদিকে সুন্দরবনের দক্ষিণ অঞ্চলে বেশির ভাগই সরকারি জমি। সেখানে জমি হাসিলের
কাজ হয়েছে ধীর গতিতে। এখানে জলাভূমিতে আবাদ বসান খুবই কষ্ট সাধ্য কাজ ছিল।
জলজ আগাছায় ভর্তি ঘন জঙ্গল সাফ করতে অন্য জায়গার চেয়ে অনেক বেশি মজুর দরকার
হত। একবার জমি পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু হলে, অন্ততঃ একটানা একবছর সাফ করার
কাজ চালিয়ে যেতে হত। কারণ উর্বর জমি খালি পড়ে থাকলেই আগাছায় ভরে যেত।
এরকম জায়গায় চিরস্থায়ী বিরাট আয়তনের আবাদ বসান পানীয় জলের অভাবে এবং বন্য
পশুর আক্রমনে কঠিন হয়ে পড়ত। এছাড়াও সরকার জমি বিক্রি কিংবা স্বত্বের যে সমস্ত
আইন কানুন করেছিল, তাতেও খুব তাড়াতাড়ি উন্নতির সুযোগ ছিল না। এখানে খাজনার
যে হার ছিল, তাতে জোতদাররা দু'বার ভেবে দেখত কাজে হাত দেবে কী না। সবচেয়ে
বিরক্তিকর ছিল, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিশ্রুত অংশ পুনরুদ্ধার না করলে স্বত্ব বাজেয়াপ্ত
হয়ে যাবে। এখানে মাঝে মাঝেই চাষের কাজ থেমে যেত। এক স্থানীয় কর্মচারীর ভাষায়,
এর কারণ, "সদর মালগুজারদের অন্ধভক্তি। অর্থাৎ সরকার চাইত বড় পুঁজিপতিরা সামান্য
চাষীদের সব খুটিনাটি দেখবে।"

এতক্ষণ যা বলা হয়েছে, তা পর্যালোচনা করে দেখলে জমিদারদের সমাজের পরগাছা
মনে করাটা বোধ হয় ঠিক হবে না, তাদের নিজেদের দরকারে তারা চাষে বিনিয়োগ করত।
যেখানে সরাসরি কিছু করার থাকত না, সেখানেও তারা দেখত, যাতে চাষাবাদ বাড়ে।
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রবণতা মিলিয়ে যেতে থাকে। এমন কি যেখানে নতুন চাষের
সুযোগ ছিল, সে সব অঞ্চলেও। এর জন্য জমিদারি ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত দুটি বিষয় দায়ী।
এক, জমির যত দাম বাড়ছিল, অংশীদারদের মধ্যে ঝগড়া ততই বেড়ে যাচ্ছিল। দুই, পুরনো
জমিদাররা যেখানে নিজেদের সম্পত্তি চিরকালের জন্য ভাড়াটেদের হাতে খাজনা আদায়ের
জন্য তুলে দিয়েছে, সেখানে জমিদাররা কেবলই খাজনা আদায়কারীর ভূমিকায় চলে যায়।
জমিদাররা যেখানে দেখত চাষে পুঁজি বিনিয়োগ না করেই তারা খাজনার থেকে মোটা আয়
করতে পারবে, সেখানে তারা চাষের উন্নতিতে আর ব্যয় করত না। এসব নতুন চাষাবাদ
পুরনো গ্রামের ধারে কাছেই হয়েছিল এবং তার আয়তনও খুব একটা বড় ছিল না। এর
পুঁজি যোগাত এক বিত্তবান সম্ভ্রান্ত চাষী গোষ্ঠী, যারা একদিকে টাকার জোরে গরীব চাষীদের
উপর আধিপত্য করত, অপরদিকে, নিজেদের উপর কোনরকম খাজনা বাড়ানর বিরোধিতা
করত। এদের সঙ্গে একদল উদ্যোগী দালালও ছিল, যারা জমিদারদের কাছ থেকে স্বল্প
মেয়াদি কিংবা চিরস্থায়ী স্বত্বে জমি নিয়ে রেখেছিল। এরা নিজেরদের লাভের কথা ভেবে
চাষে ব্যয় করত।

একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি কিন্তু অন্তহীন ছিল না। তাহলেও এসময়ে কেন কৃষি উৎপাদনের
হার কমে গিয়েছিল তা দেখা দরকার। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকেরা এক সার্বজনীন ব্যাখ্যা
খোঁজেন। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গার যে প্রভেদ, যে বিষয়টাকে উপেক্ষা করেন।

এই ধরণের যুক্তি শুধুমাত্র উৎপাদন কমে যাওয়ার কারণগুলো আলোচনা করে না, একই সঙ্গে জমি পুনরুদ্ধারের হার কেন কমে গিয়েছিল, তাও খতিয়ে বিচার করে। বেশির ভাগই মনে করেন যে, চাষে পুঁজি বিনিয়োগ কমে যাওয়াই এর প্রধান কারণ। ব্যাপারটা বিচার করে দেখা যাক।

ভারতের চাষীরা উন্নতির জন্য পরিবর্তনের চেয়ে সমাজে নিজেদের জায়গা ধরে রাখতে বেশি আগ্রহী ছিল— একথা বেশিরভাগ ঐতিহাসিকের কাছেই আর গ্রহণ যোগ্য নয়। চাষীরা তাদের অবস্থা শোধরাবার কোন উপায় দেখলেই তাতে সবসময়ই সাড়া দিত। তারা আগে উদ্ভাবন বিরোধী ছিল শুধু নিজেদের নিছক বেঁচে থাকার মানসিকতার কারণে নয়, তারা সচেতন ছিল যে, সঠিক গবেষণার ফল না জেনে কোন নতুন উদ্ভাবন চাষের কাজে লাগালে নানা আশঙ্কা থাকতে পারে। বিচক্ষণতার অভাব দেখালে তাদের প্রচুর খেসারত দিতে হবে। একেই তাদের নিজেদের আয় খুবই নগন্য, কাজেই, সামান্য জীবিকা নির্বাহ করা যেতে পারে, এমন ব্যবস্থা না নিয়ে তারা নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করতে চাইত না। কারণ, তাতে ছোট চাষী সর্বস্বান্ত হয়ে যেতে পারে।

এর ঠিক বিপরীত মত হল,[৫০] জমির মালিকরা চাষে টাকা খাটাতে অনিচ্ছুক ছিল, ফলে অনুন্নতির জন্য ছোট চাষী নয়, দায়ী তারাই। এই অনিচ্ছার জন্য প্রধান কারণ স্থানীয় বাজারে কৃষি পণ্যের যথেষ্ট চাহিদার অভাব। এখানে বিলেতের সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা করা হয়েছে। ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লবের দরুণ উৎপাদন ও শ্রমের উপযুক্ত বাজার তৈরি হয়েছিল। এই চাহিদার ফলে ভূ-স্বামীরা স্বভাবতই কৃষিতে যথেষ্ট বিনিয়োগ করত। বাংলায় শিল্পের কোন উন্নতি তো হয়নি, উপরন্তু যা জমি ছিল, তার তুলনায় জন সংখ্যার বৃদ্ধি অনেক বেশি হয়েছিল। ফলে জমির উপর খুব বেশি চাপ পড়ত। বাজারে চাহিদার অভাব কীভাবে কৃষি বিনিয়োগকে প্রভাবিত করেছিল, তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে: বাজারের সম্প্রসারণশীলতার অভাবের কারণে লোকে চাষে আর তেমন করে পুঁজি বিনিয়োগ করত না, এমন কি যে অর্থকরী ফসলের বিশ্ব বাজারে চাহিদা ছিল তাতেও নয়....। দেখা গিয়েছে, বিশ্বের বাজারে বাংলার অর্থকরী ফসলের একটানা চাহিদা ছিল না বলে এতে দীর্ঘ মেয়াদি উন্নতির সম্ভবনা ছিল না। তাই কৃষি এবং শিল্পের উন্নতি নির্ভর করত দেশের বাজারের চাহিদার উপর। দ্রুত শিল্পোন্নতির অভাবে নগরের বাজারে কৃষি পণ্যের চাহিদা বিশেষ বাড়ে নি এবং নগরের অনুপাতে গ্রামের জনসংখ্যা প্রায় আগের মতই থেকে গিয়েছে। গ্রামে যে ফসলের চাহিদা ছিল, তা চাষীদের আর্থিক অনটনের জন্য কখনোই পুরোপুরি মেটান সম্ভব হয়নি (রে, ১৯৭৩, পৃ ২৭৭-৭৮)। বলা হয়েছে, জমিদারদের আর এতে কোন আগ্রহ ছিল না। ভূ-স্বত্ব কিনলে তাদের আয় প্রচুর বেড়ে যাচ্ছে, এই আয়ের স্থায়ীত্ব অনেক বেশি। চাষে বিনিয়োগ করে তার লাভের অংশ পেতে অনেক বেশি সময় লাগত। উৎপাদনের দামও ওঠা পড়া করত সব সময় এবং প্রতি একরে যা পাওয়া যেত, তার পরিমাণও বেশ বড়ই ছিল (ইসলাম, ১৯৭৮, পৃ ১০৯)।

এই মতবাদ আংশিক সত্যি। আভ্যন্তরীন বাজারের সংকীর্ণতার কারণে কৃষি উৎপাদন বাড়ছে না এবং জমিদাররাও কৃষিতে ব্যয় করছে না। এই দুই-এর মধ্যে যে সম্পর্ক দেখান হয়েছে, তা প্রযোজ্য নয়। ফসলের দাম থেকেই বাজার সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়।[৫১] উনিশ শতকের প্রথম ছয় কিংবা সাত দশকে চাষের যে বৃদ্ধি হয়েছিল, তা মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সামান্যই ছিল। সেই প্রযুক্তি মেনে নিয়েই লক্ষ্য করা যায়, যেখানেই কৃষি-বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভবনা ছিল, সেখানেই চাষ বেড়েছিল। জন সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রান্তীয় জমিতেও চাষ শুরু হয়েছিল। কারণ, লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের বাজারের স্থায়ী চাহিদাও বেড়েছিল। উনিশ শতকের শেষ চতুর্থাংশে চাষে বিনিয়োগই স্বাভাবিক বলে মনে করা যেতে পারে। তবে ১৭৬০ ও ১৮১৪-র মধ্যে ইংল্যাণ্ডে যে হারে কৃষিজাত দ্রব্যের দাম বেড়েছিল, এখানে সেই হারে বাড়ে নি। শুধুমাত্র ফসলের দাম থেকেই বলা যেতে পারে না, বাংলার জমিদাররা চাষে অর্থ বিনিয়োগ করে নি।

যেহেতু জমির বাজার উত্তরোত্তর বেড়েছিল, তাই জমিদাররা তাদের আয়ের টাকায় শুধুমাত্র জমি কিনেছিল, এই ধারণাও সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত নয়। এর পিছনের কারণ বোধ হয় এই যে, যে সব জায়গায় জমিদার চাষে বিনিয়োগ করে নি, সেখানেই সে বেশি জমি কিনেছে। এই জমি কেনার আয়তনও বিশাল।

তখনকার জমির বাজার জমিদারদের ক্রয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করত— এটা পুরোপুরি বিশ্বাস যোগ্য নয়। আগে ধনী লোকেরা সরকারি নিলামে প্রচুর জমি কিনে তবে জমিদারি তৈরি করেছিল, এখন আর তা সম্ভব নয়। এখন মাঝে মধ্যে জমিদারির অংশ বিশেষ কিংবা মধ্যস্বত্ব বা ভোগদখলকারী স্বত্ব ব্যক্তিগতভাবে নিলাম হয়। তখনকার নথিপত্র থেকে জানা যায়, এদের বাজার নিতান্তই স্থানীয় ছিল। আগের যুগের নিলামের চেহারা আর দেখা যেত না। বাইরের বিত্তবান লোকেরা স্থানীয় ধনীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত না। এমনকি বেশি টাকার মালিক হলেও নয়। এই অবস্থায় অনুমান করা যেতে পারে যে জমিদারদের সম্পত্তির একাংশ জমি কিনতে খরচ করা হত।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদের কৃষিতে বিনিয়োগ কেন কমে গিয়েছিল তা পরে আলোচনা করা হয়েছে। খরচ না করেই জমিদার যখন দেখত যে, সে খাজনা থেকে যা আয় করে, তা যথেষ্ট, তখন আর সে চাষের উন্নতি নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাত না।

আর একটি মত (রে অ্যাণ্ড রে, ১৯৭৩) অনুযায়ী, জমিদারদের চাষের ক্ষেত্রে সীমিত ব্যয়ের পিছনে আরো অনেক বেশি জটিল কারণ কাজ করেছিল। এই মত পোষণকারীরা গ্রামের সবচেয়ে ক্ষমতাবান গোষ্ঠী অর্থাৎ জোতদারদের ভূমিকার উপর গুরুত্ব দেয়। ইংরেজ শাসনের ফলে গ্রাম-সমাজে যে সব পরিবর্তন আসে, তাতে কৃষির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী ছিল। তা সত্ত্বেও কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি কেন কার্যকর হয়নি, সে সম্পর্কেই এবার আলোচনা করা হবে।

কৃষি জগতে উন্নতির প্রধান কারণ হিসেবে বলা হয়েছে কৃষিজাত পণ্যের বাণিজ্যিকরণ,

বিশেষ করে যে সব ফসলের বিলেতের বাজারে খুব চাহিদা ছিল। বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের ফলে গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিতে এক আমদানি-রপ্তানি বিভাগের সৃষ্টি হয়, যার ফলে গ্রাম ও নগরের সম্পর্ক বিশেষভাবে পাল্টে যায়। এই পরিবর্তিত অবস্থায় গ্রামগুলি বিদেশীদের হাতে এক নতুন বাজারে রূপান্তরীত হয়, যা ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যিক ও শিল্পজনিত অর্থনীতিকে কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য যোগাতে বাধ্য হয়। অর্থনীতিতে সম্পদের এই পরিবর্তন, যা প্রধানত রপ্তানিমুখী এবং উদ্বৃত্ত ফসলের থেকে থেকে দিক্ পরিবর্তনের কারণে হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে, গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতির সম্পর্কগুলোকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল।

তবে এই সম্ভাবনা বাস্তবে রূপান্তরীত হয়নি। নিজেদের স্বার্থের খাতিরে ও ব্রিটিশ আমদানি রপ্তানিকারী সংস্থাগুলি এবং গ্রামের প্রধান গোষ্ঠীদের মধ্যে যে একটা সুসঙ্গত বোঝাপড়ার সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, তার জটিলতার মধ্যে এর কারণগুলি অন্তর্নিহিত ছিল। এই ব্যবস্থার পিছনে শুধু কিছু মতলববাজ ষড়যন্ত্রী ব্যক্তি, যারা নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই জানত না, তাদের দায়ী করলে চলবে না। এর যে ব্যবস্থার অঙ্গ ছিল, সেই ব্যবস্থার ফলেই এরকমটা হওয়া সম্ভব হয়েছিল। কৃষি থেকে যতটা পারা যায় শোষণ করতে ও অর্থকরী শস্য রপ্তানি করতে, গ্রা মর উৎপাদন সংগঠনকে বিশেষ পরিবর্তন করতে হত না। পুরনো চাষের কাঠামোতেই অর্থকরী ফসল চাষ করা যেত। কারণ, এখানে চাষের সব রকম ব্যবস্থা ছিল ও কৃষি ঋণ পাওয়া সম্ভব ছিল, তবে তা আংশিক ভাবে। যে অবস্থার মধ্যে ছোট চাষী ফসল বেচা-কেনা করত, তাতে তারা আশা অনুযায়ী লাভ করতে পারত না। ধরা যাক পাট চাষের কথা, যে ইউরোপিয় সংস্থাগুলো সবচেয়ে আগে পাট কেনার অধিকার ভোগ করত, তারা আগে থেকেই বুঝতে পারত, কাঁচা পাটের দাম শেষ পর্যন্ত কত হতে পারে? পাটের বাজারের এই যে কাঠামোগত দুর্বলতা, তাতে চাষীদের তুলনায় ইউরোপিয়-ক্রেতাদের সংঘবদ্ধতার কারণেই দেশের কৃষি বাজারে কখনোই পুঁজি জমতে পারত না।

এই মতবাদের দুটি প্রধান বক্তব্যই যাচাই করে দেখতে হবে, কারণ এখানে ব্যবসাদারি ক্ষেত্রগুলির এবং রপ্তানিতে গ্রামের প্রধান গোষ্ঠীর ভূমিকা সম্বন্ধে অত্যুক্তি আছে। ব্রিটিশ আমলে অর্থকরী শস্যের প্রচলন হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তা ছিল সমগ্র কৃষি অর্থনীতির একটা ছোট অংশ মাত্র। আবার দেখা গিয়েছে ছোট চাষীরা নিজের উৎসাহে বাজারের ডাকে সারা দিচ্ছে। এতে গ্রামের প্রধান গোষ্ঠীরা বেশিরভাগ সময়েই বাধা দিচ্ছে না। যে সব জায়গায় ফসলের বাণিজ্যিকরণের পরে চাষী আর্থিকভাবে বিশেষ উদ্দীপিত হচ্ছেন না, সেখানে এই গ্রামীণ প্রভাবশালী গোষ্ঠীর প্রায় কোনই ভূমিকা ছিল না। পাট চাষের উদাহরণ থেকে বিষয়টি পরিস্কার হবে। পাট চাষ অল্প সময়ের মধ্যে যে হারে বেড়েছিল, তার থেকে বোঝা যায় চাষীরা এটা চাষ করতে খুবই আগ্রহী ছিল। এর কারণ, খাদ্যশস্য চাষ করে যা আয়, পাট চাষে তার দ্বিগুন হত। চাষীদের পাট চাষের প্রতি আকর্ষনের আর একটি কারণ হল যে, পাট চাষীদের অন্য কারোর উপর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নির্ভর করতে হত না। একটা ব্যাপারে তারা বিচক্ষণ ছিল। নিজেদের জমির পুরোটাতে তারা পাট চাষ করত না, অল্প অংশে

করত। তবে পাট চষীরা যত পরিমাণ লাভ আশা করত, তার থেকে অনেক সময়ই কম পেত। তার সঙ্গে গ্রামের প্রভাবশালী গোষ্ঠীর কোন সম্পর্ক ছিল না, এদের কার্যকলাপের সঙ্গে পাটের বাজার দর ওঠা পড়ার কোন সম্পর্ক ছিল না। মাঝে মধ্যে পাটের দাম এতটাই পড়ে যেত যে, চষীরা খুবই আশাহত হত। তবে জোতদারদের এতে বিশেষ ভূমিকা ছিল না। চষীরা বাজারে দাম ওঠা পর্যন্ত তাদের জিনিষ ধরে রাখতে পারত না। এই সুযোগের সম্পুর্ন সদ্ব্যবহার করত কুচক্রী মিল মালিকরা। গ্রামের প্রধান গোষ্ঠী—জোতদার, মহাজন, বিত্তবান চাষী, ব্যবসায়ী ইত্যাদিরা কোন ভাবেই ছোট চাষীর ফসল ধরে রাখার পুঁজির অভাবের জন্য দায়ী নয়।

এতক্ষণ যে দুটি বিষয় আলোচনা করা হল, তার থেকে বলা যেতে পারে যে, কৃষিজাত উৎপন্নের বাজারের আকার আর জমিদারদের চাষের কাজে বিনিয়োগের হার, এই দুয়ের মধ্যে এক অনিশ্চিত ও ক্ষীণ সম্পর্ক ছিল। চাষবাস খুব তাড়াতাড়ি বেড়েছিল। দেখা গিয়েছে, অনেক সময় জমিদারের একটা বড় ভূমিকাও ছিল এতে, যদিও বাজারের চাহিদা বাড়তে অনেক বেশি সময় লেগেছিল। অন্যদিকে, দেখা যায় ফসলের দাম বেড়েছে, অর্থাৎ খাদ্যের চাহিদা বেড়েছে, তার মানে এই নয় যে, তুলনামূলকভাবে চাষে বিনিয়োগ বেশি হয়েছে। পরের ব্যাখ্যাটি যথেষ্ট জোরালো নয়। যে সব শস্যের বানিজ্যিকরণ হয়েছিল, তা তুলনায় এত সামান্য যে তার পক্ষে পুরো আর্থনীতিক পরিবর্তন আনা সম্ভব ছিল না। গ্রামের প্রধান গোষ্ঠীরা এই সীমিত সম্ভাবনাও নষ্ট করে দিত, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণা করা যায় না।

জমিদারদের চাষের উন্নতির ব্যাপারে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও (অনেক সময়ই যদিও সীমিত আগ্রহ ছিল) কেন কৃষি ক্ষেত্রে অবনতি হয়েছিল এবং যে সব জায়গায় চাষের ব্যাপারে জমিদারদের কোন ভূমিকা ছিল না, সেখানে কেন চাষের উন্নতি হয়নি, তার কারণ আমাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন।

চাষাবাদে জমিদারদের একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। চাষের পরিকল্পনা, অর্থাৎ জমির বিভাজন; কি ফসল চাষ হবে, তা নির্ধারণ এবং উৎপাদন পদ্ধতি — সবই ঠিক করা থাকত। এর পিছনে পরিবহন-পরিবেশ, তখনকার চাষের উপযোগী প্রযুক্তি, এবং কৃষিজগতে বহুদিন ধরে যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, তার ভূমিকা — সব কিছুই কাজ করত। জমিদারদের কাজ ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের ক্ষতি হলে চাষীকে সাহায্য করা, এবং বাঁধ, সেচ ও জল নিকাশের ব্যবস্থা করে চাষের কাজে নিশ্চয়তা আনা। জমিদার যখন এসব কাজে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করতে পারত না, তখন এর সঙ্গে আরো অন্য কয়েকটি কারণ যুক্ত হয়ে চাষের অবনতি ঘটাত।[৫২] বেশির ভাগ জায়গায়ই নতুন চাষের সম্ভাবনা কমে যায়, ফলে এ ব্যাপারে জমিদারদের যে ভূমিকা ছিল, তাও ক্রমেই বিলীন হয়ে যায়। যে খাতে বিনিয়োগের সব চেয়ে বেশি সম্ভাবনা ছিল, তা হল সেচ। আগেই বলা হয়েছে, জমিদারির অংশীদারদের মধ্যে বিরোধের ফলে এটাও সম্ভব ছিল না। জমিদাররা আরো অনেক সমস্যার

সম্মুখীন হত। পরের দিকে যে ভাবে ভূ-সম্পত্তি, মধ্য স্বত্ব ও স্বত্বধিকারী চাষীর জমি দখল করা হয়েছিল, তাতেও এই সমস্যা বেড়ে যায়। এইসব জমির বেশির ভাগই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, সেখানে সেচের কাজে ব্যয় নিরর্থক।

এ প্রসঙ্গে ইংল্যাণ্ডের অবস্থাকে তুলনামূলক ভাবে আলোচনা করা যায়। মধ্য যুগের "ওপেন ফিল্ড" নীতি উদ্যোগী চাষী ও জমিদারদের কৃষির অবস্থা উন্নতি করতে সাহায্য করে নি। "এনক্লোজার" পদ্ধতিতে আগের ব্যবস্থা পরিবর্তন করা হয়েছিল। বাংলা ও বিহারের গ্রামে জমিদারদের যা ক্ষমতা ছিল, তাতে তাদের আইনত প্রাপ্যও সবসময় নিশ্চিত ছিল না। জমিদাররা সচরাচর কতটা জমিতে কি চাষ হবে তা স্থির করতে পারত না। ফলে তারা চাষে যে অর্থ ব্যয় করত, তাতে লাভের আশা খুব কম ছিল। প্রচলিত খাজনার মূল্য নিয়েই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হত। কদাচিৎ এই খাজনা অল্প স্বল্প বাড়ান যেত। ক্রমশই খাজনা বাড়ান শক্ত ব্যাপার হলে দাঁড়ায়, কারণ প্রজাদের সঙ্গে এই নিয়ে বিরোধ বেড়েই চলে। এর ফলে জমিদাররা আগে চাষে যতটা বিনিয়োগ করত, এখন আর তা করতে চায় না। উদাহরণ, দক্ষিণ বিহারের জেলাগুলি। এখানে জমিদাররা সেচের কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয় করত। চাষ পুরোপুরি সেচ নির্ভর ছিল বলে জমিদাররা সেচের সুবন্দোবস্ত রাখত, বাঁধ ঠিক রাখত ও সবাই যেন সম পরিমান জল পায়, তার দেখাশোনা করত। পরিবর্তে গ্রামের অন্য সবার প্রাপ্য মিটিয়ে উৎপাদন থেকে যা বাঁচত, জমিদাররা তার থেকে অর্দ্ধেক ভাগ নিত। উনিশ শতকের শেষ অবধি এই প্রথাই চালু ছিল। তারপর ১৮৯০-এ যখন ফসলের দাম বাড়তে থাকে, তখন এই ব্যবস্থা আর কার্যকর ছিল না। দাম বাড়ার ফলে চাষী এখন মুদ্রায় খাজনা দিতে চায়, জমিদার তার প্রতিবাদ করে এবং প্রজাকে ফসলে খাজনা দিতে বাধ্য করে। দুপক্ষই নিজেদের জেদ বজায় রাখার চেষ্টা করে। জমিদার যখন দেখে কিছুতেই নিজের দাবি আদায় করতে পারছে না, তখন সেচের ব্যাপারে অবহেলা দেখায়। সেচের কাজ আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায় (চৌধুরী ১৯৭৭: ৩২৯-৩৫)।[৫৩] এ বিষয়টিকেও ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করা যায়। বিদেশে কৃষি সম্পত্তির কাঠামো এমন ছিল যে জমির মালিক যা বিনিয়োগ করত, জমি থেকেই তা আবার ফেরত পেত। ইংল্যাণ্ডে ছোট চাষীর জমির প্রতি গভীর টান ছিল না, কিন্তু ফ্রান্সে ছিল। জমিদাররা সেখানে কৃষিতে অর্থ ব্যয় করতে উৎসাহিত হয়েছিল। ফ্রান্সে এনক্লোজার মুভমেন্ট তেমনভাবে যে সফল হয়নি, তার পিছনে এটাই প্রধান কারণ, ইংল্যাণ্ডে যে জমিদাররা এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল, তাদের বেশির ভাগই খাজনা থেকে সামান্য আয় করত। ফ্রান্সের অবস্থা একদম আলাদা ছিল। ১৭৮৯-এর ফরাসি বিপ্লবের পর সেখানে ভূসম্পত্তিতে ছোট চাষীর অধিকার দৃঢ়তর হয়েছিল। গ্রামের জমির উপর জমিদারদের বিশেষ আধিপত্য না থাকায় যথেষ্ট পরিমাণে বিনিয়োগ করা সম্ভব ছিল না। আবার একথা ভাবাও ঠিক নয় যে, আধিপত্য থাকলেই বিনিয়োগ হত। এখানে ভাগ চাষের কথা বলা যেতে পারে। ভাগচাষের জমির উপর জোতদারদের পুরো অধিপত্য ছিল। প্রচলিত আইন কানুন কিংবা রীতিনীতি এখানে কোন

বাধার সৃষ্টি করতে পারত না। যার যেমন খুশি জমির ব্যবহার করতে পারত। সরকার একবার বর্গাদারদের (ভাগচাষীর) স্বার্থে তাদের আইনি ক্ষমতা দেওয়ার চেষ্টা করে খুব বিপাকে পড়েছিল। শেষে জোতদারদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। এরপর থেকে বর্গাদারদের উপর জোতদারদের কর্তৃত্ব একেবারে নিশ্চিত হয়ে যায়। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে জোতদার কখনই পুরনো বর্গাদারের জায়গায় নতুন কাউকে আনতে চাইত না। তবে এটা পুরোপুরি তার উপরই নির্ভর করত। এই নিরঙ্কুশ আধিপত্যের ফলে জোতদার আর বিনিয়োগের দিকে ঝুঁকবার কারণ দেখত না। তবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গার পরিস্থিতি আলাদা হত। এখানে এর দুটি কারণ উল্লেখ করা হবে। বর্গাদারি ব্যবস্থার ফলে জোতদারদের একটা বড় রকমের নিশ্চিত আয় ছিল। ভাগচাষী জোতদারের জমিতে চাষ করার সুযোগ পেত বলে নিজের উৎপাদনের অর্দ্ধেক সে জমি-মালিককে দিত। জোতদাররা অবশ্য অনেক সময়ই বীজ ও লাঙ্গল-বলদ যোগাত। তবে এটা করা হত চাষ বাড়াবার উদ্দেশ্যে নয়, বরং এটুকু সাহায্য ছাড়া চাষ আদপেই সম্ভব হত না বলে। এর ফলে তাদের প্রাপ্য অংশের হার যেত বেড়ে।

জমিদারের কাছ থেকে অভয় পেলেই জোতদারের আর চিন্তার কোন কারণ থাকত না। তখন আর সে চাষের কাজে টাকা খরচের কথা ভাবত না। যেখানে সে অর্থ বিনিয়োগ করতে চাইত, সেখানে নানা ঝঞ্ঝাট দেখা দিত। এর অন্যতম প্রধান কারণ বর্গাজমি বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে ছিল। যেখানে জমির মালিক তার জমি ছোট ছোট অংশে বর্গাদারদের চাষের জন্য দিত, সেখানে ছাড়া, অন্য সব জায়গায় এই বর্গা জমি বেশির ভাগই ছোট চাষীর, তারা দেনার দায়ে জমি বেচে দিয়ে তাতে নিজেরা ভাগচাষী হয়ে চাষ করত। বর্গা জমির আয়তন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত ছোট হত। পুরনো চাষী চেষ্টা করত যতদিন সম্ভব জমির একাংশ বেচে বাকিটা ধরে রাখতে। যখন সে একান্ত নিরুপায় হয়ে পড়ত, তখনই পুরো জমি বেচতে বাধ্য হত। তার জমি বেশিরভাগ সময়ই কোন একজন মালিকের হাতে যেত না। এদের খুব ছোট একটা অংশেরই কৃষি সম্পর্কে ধ্যান ধারণা ও আগ্রহ ছিল।

বলা হয়েছে, ভাগচাষ প্রথা বাংলার চাষের ক্ষতি করেছে। মোট কৃষি জমির ২০ থেকে ২৫ শতাংশের উপর মাত্র ভাগ চাষের প্রভাব পড়েছিল। তাও আবার বেশিরভাগই আদিবাসী উপজাতি এলাকায়। সেখানে যে ভাগচাষের ফলে কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তার কারণ কি? বলা হয়ে থাকে যে, বর্গাচাষে কোন নিশ্চয়তা না থাকার ফলে এই চাষে বর্গাচাষীদের কোন উৎসাহ ছিল না। যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তার থেকে এই ধারণা বদলাতে হবে। বর্গাচাষ অনেক সময় স্বল্প মেয়াদি হত। তা বলে এতে সব সময়ই অনিশ্চয়তার কারণ ছিল না। বর্গাচাষী ও জোতদারের বোঝাপড়া বেশিরভাগ সময়ই বিধি বহির্ভূত হলেও জোতদার পুরনো ভাগচাষীকেই চাষ করার অধিকার দিত। জোতদারের যদি মনে হত যে, বর্গাদাররা এক জোট হয়ে এমন কিছু অধিকার দাবি করছে যা চুক্তিতে ছিল না, তখন সে আর

তাদের পুনর্বহাল করত না। ১৯২০-র দশকে দেশজুড়ে বর্গা প্রথার সমালোচনা করা হয়েছিল। কিছু এলাকায় বর্গাদাররা অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের মালিকদের আদেশ অমান্য করেছিল। মালিকরা তখুনি ভাগচাষীদের সরিয়ে দেয়।

পুরনো বর্গাদারদের সরিয়ে জোতদারদের বিশেষ লাভ হত না। ক্ষুদ্রকায় জোত, যা চাষীর জমির থেকে আলাদা, তা চাষ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠত। অন্যদিকে বর্গাদারদের খাজনা এক রকম বাধা। কাজেই পুরনো বর্গাদারদের সরিয়ে দিলে মালিকের কোনই সুবিধা হত না। বর্গাচাষ এলোমেলো অগোছালো এমন যুক্তি টিকবে না। চাষের উন্নতিতে বর্গাদারের কোন ভূমিকা ছিল না, বিশেষ করে যে সব জায়গায় তাকে উপরি দিতে হত, একথা যেমন সত্য, তেমনি এটাও ঠিক নয় যে, তারা চাষের কাজে অবহেলা করত। কারণ, তাতে তাদের শ্রম বিনিয়োগ হত না ও চাষের বলদ অকেজো হয়ে থাকত। উপরন্তু জমির গড় উৎপাদন কমে যাবার সম্ভাবনা ছিল। তাই চাষে অবহেলা করলে তাদের নিজেদেরই লোকসান হত।

বর্গাচাষের প্রতিকূল প্রভাব অন্যভাবেও দেখা যেত। এটা নির্ভর করত বর্গাচাষ কিভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল। বর্গার কর কত বেশি ছিল, এবং বর্গাদারদের সাধারণ গঠন কেমন ছিল — এসবের উপর। রাজস্ব আদায়কারীদের প্রতিবেদন ছাড়াও, জেলার সেটল্‌মেন্ট অফিসার,[৫৪] দি বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাংকিং এন্‌কোয়ারি কমিটি এবং বেঙ্গল ল্যাণ্ড রেভেনিউ কমিশন এ বিষয়ে তদন্ত চালায়। ১৯৪৬-৪৭-এর তদন্তে, যা আগের সব কটি তদন্তের চেয়ে অনেক বেশি যত্ন নিয়ে করা হয়েছিল এবং অনেক ব্যাপক প্রচার পেয়েছিল, তাতে দেখা গিয়েছে, যে সব জেলায় বর্গাপ্রথা চালু ছিল, সেখানে তদন্তের সুবিধার জন্য, জেলাগুলিকে মহকুমায় ভাগ করা হয়েছিল।[৫৫]

ভাগচাষ প্রথায় প্রধানত ধান চাষ করা হত এবং এক সময় এটাই এক মাত্র শস্য ছিল। পরে কিছু অর্থকরী ফসলের চাষ হয়, যেমন পাট, আখ এবং লঙ্কা।

এই কৃষি ব্যবস্থার দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যনীয়। প্রথমে জমির মালিকই বেশির ভাগ সময় এই চাষের সঙ্গে যুক্ত থাকত, অথবা অর্থকরী ফসলের ব্যবসা করত। ভাগচাষ থেকে খাজনা-ব্যবস্থার তুলনায় এই উৎসাহ অনেকাংশে আলাদা। দ্বিতীয়ত, এই চাষ যাতে উন্নত মানের হয়, সেই জন্য মজুরের পারিশ্রমিক ছাড়াও সার, বীজ ও আরও নানা চাষের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রে জোতদার খরচ করত। যত খরচ হত, সেই অনুপাতে জমির মালিক কর ধার্য করত। নদীয়ার কুষ্ঠিয়া মহকুমায় যেমন জোতদাররা পাট গভীর জলে ডুবিয়ে রাখতে ও বাকল থেকে আঁশ ছাড়ানর কাজে খরচ করত, ফলে পুরো চাষের ৭৫ শতাংশ সে নিজে রেখে দিত।[৫৬]

যেখানে ভাগচাষে ধান হত, সেখানে দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। এক, এই চাষ কয়েকটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দুই, এই চাষ অনেক বেশি বিস্তৃত ও প্রচলিত ধরণের। প্রথম ক্ষেত্রের উদাহরণ উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং; জলপাইগুড়ি এবং দিনাজপুর জেলার কিছু অংশ।

এই সব অঞ্চলে সাম্প্রতিককালে পতিত জমি উদ্ধারের কাজ করা হয়েছে। এখানকার জমির মালিকরাই এই পুনরুদ্ধারের কাজে উদ্যোগী হয়ে চাষীদের সব রকমের সাহায্য করেছিল। এখানকার চাষীদের মধ্যে অল্প সংখ্যক স্থানীয় বাসিন্দা ছিল। বেশির ভাগই এসেছিল বাইরে থেকে। যখন এই চাষ দাঁড়িয়ে যায়, তখন জমি মালিকরা আর সরাসরি চাষের সঙ্গে যুক্ত থাকে না, চষীদের হাতে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেয়। তবে আগের মতই চাষের প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র যোগাতে থাকে। দার্জিলিং-এর শিলিগুড়ি মহকুমায় জোতদাররা সাধারণতঃ চাষের সব খরচ বহন করত। তবে অল্প কিছু ব্যতিক্রমও ছিল।[৫৭] জলপাইগুড়ি জেলার জলপাইগুড়ি মহকুমার চাষ ব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে এক স্থানীয় প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১০০ বিঘের বেশি জমি আছে— এই রকম বড় জোতদার সব সময়ই আঁধিয়ার-এর খোঁজে থাকত জমি চাষ করাবার জন্য। এরা চেষ্টা করত একই আধিয়ারকে ধরে রাখতে। কারণ, সেই অঞ্চলে এত অফুরন্ত জমি ছিল যে, আধিয়ারদের ধরে রাখা নিয়ে জোতদারদের মধ্যে রেষারেষি চলত....এই সব ক্ষেত্রে জোতদারকে আধিয়ারের পুরো ভরণ পোষণ ও চাষের খরচ দুইই যোগাতে হত। এই সব আধিয়ারদের পুরো ঘর তোলার জমি, ঘর তৈরি ও মেরামতির খরচ, লাঙ্গল-বলদ, বীজ, সার এবং চাষের প্রয়োজনীয় অন্যান্য সব কিছু জোতদারকে দিতে হত। এমনও আধিয়ার ছিল যারা ছেলে জন্মালে দাইয়ের এবং পরিবারের মৃত্যু হলে কফনের খরচ পেত। এই অঞ্চলে এরাই বোধ হয় প্রথম আধিয়ার গোষ্ঠী।[৫৮] জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার মহকুমায় এবং দিনাজপুরের সদরে স্থানীয় জোতদারদের উপর বর্গাদারদের নির্ভরশীলতা পুরোপুরি না হলেও চাষের কাজ চালাবার জন্যে প্রয়োজনীয় ছিল। এখানে জোতদাররা চাষের সব চেয়ে দামি উপকরণ— লাঙল-বলদ, ইত্যাদি যোগাত।[৫৯]

এই নির্ভরশীলতা ক্রমেই ভিত গেড়ে বসেছিল, কারণ জোতদারকে প্রাপ্য মিটিয়ে, চাষীর বলতে গেলে প্রায় কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। এই প্রথা এতদিন ধরে চলে এসেছিল যে, একটা সময়ের পর বর্গাদারের আর হিসেব থাকত না যে, কত ধার সে নিয়েছিল আর কতটাই বা সে শোধ দিয়েছিল।

বর্গাদাররা নিজেরাই জমি-মালিকদের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করতে ইচ্ছুক ছিল না। এতে তাদের জীবন ধারণের সমস্যা হত। তারা আশঙ্কা করত, মালিক উৎপাদনের অর্দ্ধেক দাবি করলেও সুদে আসলে ও আরো নানা ছল ছুতোয় সে প্রায় পুরোটাই আত্মসাৎ করতে চায়। এই রকম বছরের পর বছর ঘটে চললেও তারা চাষ করতে থাকত।[৬০]

আদর্শ ভাগচাষ বলতে অন্য ব্যবস্থা বোঝাত। সবচেয়ে বড় তফাৎ হল, এখানে ভাগচাষী বলতে শুধু মজুর বোঝাত না, সে জমির একজন অংশীদারও বটে। যদিও তার ভাগ-স্বত্ব নিতান্তই ছোট। সে যে আগেই চাষের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তার থেকেই এটা প্রমান হত যে, তার কাছে চাষের উপকরণ অর্থাৎ লাঙল-বলদও ছিল। অনেক সময় তাকে টাকা ধার নিতে হত। তবে যার কাছ থেকে সে জমি ভাড়া নিয়েছে সেই মালিকের থেকে নয়। যদিও জমির স্বত্বের মাধ্যমেই ভাগ চাষ করা হত, তা সত্বেও মালিক অনেক সময়ই চাষের

সরঞ্জাম যোগান দিত, বিশেষ করে যে সব জিনিষের দাম বেশি হত যেমন বীজ ও সার এবং সেচ প্রধান অঞ্চলে সেচের জল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জোতদার চাষীকে বীজ দিত। তবে সবই ছিল ধার, যা ফসল তোলার সঙ্গে সঙ্গেই সুদে আসলে আদায় করা হত।

ধান কাটা ও মাড়াই-এর খরচ জোতদার সামান্যই দিত। ব্যতিক্রম সেই সব জায়গায় যেখানে চাষের কাজে 'পরদেশী' মজুরের উপর নির্ভর করা হত। সুন্দরবনের নতুন হাসিল করা অঞ্চলে কিংবা নতুন ভেসে ওঠা পলিমাটির চর এলাকায়, চাষের জন্য স্থানীয় লোকজন কম পাওয়া যেত।[৬১] মাড়াই-এর কাজ হয় মালিকের খামারে, নয়ত মাঠে, বর্গাদাররাই করত। যে সব জায়গায় মালিকের খামার (বেশির ভাগই জোত থেকে দূরে এবং বসত বাড়ির কাছে) চাষের জমি থেকে অনেকটা দূরে থাকত, সেখানেই খরচ অনেক বেশি হত। জোতদার এবং বর্গাদারের সম্পর্কের তিক্ততা যতই বাড়ে, ততই বর্গাদার ধান চুরি করে — এই অভিযোগ তুলে জোতদার চাইত ফসলের ভাগাভাগি তার খামারেই হোক।

লিজের জমির বদলে বর্গাদার সবসময়ই উৎপাদনের অর্দ্ধেক জোতদারকে দিয়ে দিত। যেখানে সেচের সুবিধা ছিল এবং জমির উর্বরতার কারণে বর্গাদারকে কম খরচ করতে হত, সে সব ক্ষেত্রে জোতদার, অর্দ্ধেকের বেশি ভাগ দাবি করত।[৬২] অন্যদিকে যেখানে জমি পতিত ছিল এবং অনেক পুঁজি ও মজুর দরকার হত আবাদ বসাবার জন্য, সেখানে জমির মালিক অল্প ভাড়া নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত।

জমির মালিকরা সাধারনতঃ লাঙ্গল, বলদ ও বীজ ধার দেবার জন্য অত্যধিক দাম চাইত। যতটা ধার দিত, ফসল তোলার সময় তার দ্বিগুন আদায় করে নিত। খড়টুকুও ছেড়ে দিত না। উৎপাদন থেকে প্রথমেই বীজের দাম কেটে নিত।[৬৩] সাধারনতঃ দেখা গিয়েছে লাঙ্গল বলদের দাম খুব বেশি হত। খুলনা জেলার খুলনা মহকুমায় জোতদার যদি চাষের সরঞ্জাম যোগাত, তাহলে বর্গাদার কেবল ফসলের এক-তৃতীয়াংশ পেত।[৬৪] জলপাইগুড়ির আলিপুরদুয়ার মহকুমায় ১৯৪৬ সালে দেখা গিয়েছে, জোতদার একটা গরু বা যাড় চাষের জন্য ধার দিলে, বর্গাদারের কাছ থেকে ছয় মন ধান চাইত।

করের বোঝা সব চেয়ে বেশি ছিল ভাগচাষীর উপর। করের চাপের দরুণ, কর ঠিক করা হত পুরো উৎপাদনের আয়তনের উপর। কোন রকম স্বল্প মেয়াদি উন্নতি করাও সম্ভব হত না। ভাগচাষীরা তাই যত বেশি টুকরো জমি পেত, ভাড়া নিত, কিংবা আয় বাড়াবার জন্য উপরি রোজগার করত। এর ফলে তার নিজের জমিতে চাষ বেশি বাড়াতে পারত না।[৬৫] এত বোঝা সত্বেও বর্গাদাররা কিভাবে বেঁচে থাকত তা ব্যাখ্যা করা কঠিন নয়।

ছোট চাষীর মোট যা জমি ছিল, তাতে বর্গা জমির অংশ সামান্য। মোট চাষের জমির তুলনায় যত কম বর্গা জমি হত, চাষীর অবস্থা তত ভালো হত। উল্টো দিকে বর্গাদার যদি ভাগ চাষের উপর বেশি নির্ভরশীল হত, তাহলে সে ছোট চাষীর মর্যাদা হারিয়ে ক্রমেই 'মজদুর' হয়ে যেত। গ্রাম বাংলায় এই পার্থক্য খুবই চোখে পড়ত। সমাজে 'মজদুর' নিম্ন শ্রেণীর লোক। বর্গাদার কতটা জমিতে চাষ করত, তা সাময়িক স্বত্বে নেওয়া জমি হোক,

বা নিজের জমিই হোক সে বিষয়ে তথ্য নিতান্তই অপর্যাপ্ত। এর থেকে প্রমান করা কঠিন যারা বর্গা চাষ করত, আর যারা নিজের জমি চাষ করত, তাদের সংখ্যা ঠিক কত? নিচের তলার চাষীরা ক্রমশই বর্গা চাষে চলে যাচ্ছিল।

ছোট চাষী অনেক সময়ই বর্গাচাষে যেত। কারণ, তা না হলে তার শ্রম, বলদ ও লাঙ্গল অকেজো হয়ে থাকত। তার জমির আয়তন যা হোক না কেন, তাকে লাঙল, বলদ রাখতেই হত। তার পরিবারের লোক দিয়ে তার চাষ করার খরচও কম, কাজেই সমায়িক স্বত্বে নেওয়া জমি চাষ করতে তার বাড়তি কোন খরচ লাগত না।

যে সব জায়গায় বর্গাস্বত্ব এই রকম ছিল, সেখানে এর ফলে স্থানীয় অর্থনীতির উন্নতি হত। বর্গা চাষের ভূমিকা আরও গুরুত্ব পেত সেখানে, যেখানে জমির মালিক নিজে সুষ্ঠুভাবে চাষ পরিচালনা করতে পারবে না বলে (বিশেষ করে যেখানে জমি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল), তা ভাগ চাষে দিয়ে দিয়েছিল।

উপসংহার

এই প্রবন্ধে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো বিষয়ে লেখকদের মধ্যে মত পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, বিশেষ করে এই মতবাদের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যা গ্রহণ করলে ব্রিটিশ শাসনকালে কৃষি কাঠামোর ক্রমবিকাশ সম্পর্কে চিরাচরিত ধারণার আমূল পরিবর্তন করতে হয়। এই মত অনুযায়ী গ্রামীণ ক্ষমতার কেন্দ্রে ছিল মিশ্র উপাদানে গঠিত জোতদার সম্প্রদায়। এই মতাবলম্বীদের কেউ কেউ মনে করে এই অবস্থা প্রাক্ বৃটিশ যুগেও প্রচলিত ছিল। অন্যরা বলে, ব্রিটিশ শাসন কালেই জোতদাররা ক্ষমতার কেন্দ্রে আসে।

এ রকম গোষ্ঠী সত্যিই ছিল। কিন্তু বিতর্কের কারণ হল, বাংলা ও বিহারের গ্রাম-সমাজে এরা কি এতটাই ক্ষমতা বিস্তার করেছিল, যতটা বলা হয়েছে? ক্ষমতার ব্যাপারটা একটু বাড়িয়েই বলা হয়েছে। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৬-এর মধ্যে বাংলায় সবচেয়ে বেশি ভাগ চাষ হয়েছে। ভাগ চাষের আয়তনের উপর যে তথ্য পাওয়া যায়, তাতে দেখা গিয়েছে যে, পুরো চষের পরিমানের তুলনায় মাত্র ২০-২৫ শতাংশ জমি ভাগ চাষে দেওয়া হয়েছিল। যে সব জায়গায় আদিবাসী ও উপজাতিদের প্রাধান্য ছিল, সেখানেই সবচেয়ে বেশি পরিমানে বর্গাচাষ দেখা গিয়েছে। জোতদাররা গ্রামীণ ঋণ ব্যবস্থা বা ব্যবসা বানিজ্য — দুটোর একটাও পরিচলনা করত না, বিশেষ করে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি ফসল — ধান ও পাটের ক্ষেত্রে। আধিয়ারদের তারাই বেশির ভাগ ধার দিত। তবে এটা জোতদার ও আধিয়ারদের মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক। এই ভাবে তারা গ্রামীণ ঋণ ব্যবস্থার কিছুটা নিজেদের হাতে রেখেছিল, যাতে তাদের ক্ষমতার প্রকাশ পায়। বিত্তবান চাষীরা, যাদের মধ্যে জোতদারও ছিল, যখন দেখত, হঠাৎ কোন ধাক্কায় প্রতিষ্ঠিত মহাজনী ব্যবসা মার খাচ্ছে, তখন তারা এই ক্ষমতা বিস্তার করত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯৩০ দশকের মন্দার পর এরকম ঘটেছিল।[৬৬] হঠাৎ করে ফসলের দাম পড়ে যাওয়ায় চাষীদের পক্ষে ধার শোধ করা খুব মুশকিল হয়ে পড়ে। এই সময়ে জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে যে দেশজোড়া আন্দোলন হয় তাতে

চাষীরা সব রকম দেনা, খাজনা ও পাওনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, মহাজনরাও ব্যবসায়ে মন্দার জন্য কোন উপায়েই তাদের নিঃশেষিত পুঁজি নগরের সঙ্গে ব্যবসা করে আর ভরাতে পারছিল না। ১৯২৬-এর সরকারি অনুসন্ধান থেকে জানা যায় যে, এই সময় জোতদারদের ধান ও পাটের ব্যবসার উপর তেমন কোন আধিপত্য ছিল না।[৬৭] উদ্বৃত্ত চাল চাষীরা খোলা বাজারে বেচে দিত। মরশুমের প্রথমে চাষীকে দাদন দিয়ে চালের বাজার নিয়ন্ত্রন করার কোন চল ছিল না। অনেক সময়ই চাষীদের বাধ্য হয়ে ঋণ নিতে হত, তবে এর মানে দাদন বা আগাম নেওয়া নয়। এটা ছিল ধার, তা নগদে বা ফসলে যেভাবেই নেওয়া হোক, সুদ সমেত ফেরত দিতে হত। ঋণের ক্ষেত্রে প্রথা অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করা হত। যেখানে স্থানীয় চালের বাজার চালু, চটপটে এবং চালের দাম প্রায়ই বাড়ত, সেখানে চাষীরা সহজে দাদন নিয়ে ব্যবসায়ীকে আগের থেকে ধান বেচে দিতে চাইত না। যেখানে অগ্রিম ধান চাল বিক্রি হত, সেখানে স্থানীয় জোতদারদের কোন রকম হাতই ছিল না। ধানের ব্যবসায়ে লোকের বিবিধ স্বার্থ থাকত। উদাহরণ, মুর্শীদাবাদের কালেকটরের চিঠি থেকে জানা যায় যে, মারওয়াড়ি ও উত্তর ভারতীয় ব্যবসাদার ছাড়াও চালের ব্যবসায়ে ক্রমশই চালকল মালিকদের ক্ষমতা বাড়ছিল। পাটের ক্ষেত্রে দাদন দিয়ে কেনার প্রচলন ছিল অনেক বেশি। এখানেও ভূ-স্বামী ও জোতদারদের বিশেষ কোন ভূমিকা ছিল না। জটিল পাট ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা ছিল প্রধান গোষ্ঠী। স্থানীয় গোষ্ঠীদের পক্ষে এই ব্যবসায়ে আধিপত্য বিস্তার করা সম্ভব ছিল না, বিশেষ করে যখন পাটের বাজার খুব চালু ছিল।

জোতদারদের ক্ষমতা গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে কতটা বিস্তৃত ছিল তা এক কথায় বলা শক্ত হলেও ব্রিটিশ শাসনকালে যে বেড়েছিল, সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। জমিদারদের দুর্বলতার সঙ্গে তাদের এই ক্ষমতা বৃদ্ধির সরাসরি কোন যোগাযোগ নেই। যারা মনে করে যে, জমিদার ও জোতদাররা যে ক্ষমতার অধিকারী ছিল, তা মূলত: আলাদা, তারা, জোতদাররা নতুন অঞ্চলে (যে সব জায়গায় জমিচাষের আওতায় আনা হয়েছিল) যে প্রবল আধিপত্য বজায় রাখত, সেই ধারণার দ্বারা প্রভাবিত। এইসব নতুন আবাদি এলাকায় জমিদাররা তেমনভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। এমন অনেক জায়গা ছিল যেখানে জোতদাররা জমিদারি এলাকাতেও নিজেদের প্রভূত্বজারি করেছিল। অনেক দিন ধরে যে সব পতিত জমি হাসিলের কাজ জমিদাররা জোতদারদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল, সেখানে তারাই জমিদারি দেখার কাজে লিপ্ত ছিল। বিরোধ দেখা দেয় অনেক পরে, তখন জমিদাররা নানা ভাবে তাদের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

যে মতবাদ আলোচনা করা হল, তাতে দেখা যাচ্ছে, সে সব ছোট চাষীর নিজেদের জমির স্বত্ব ছিল, যারা নিজেদের টাকায় বা ধার করে চাষের পরিকল্পনা করত, এই মতবাদ তাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করছে। বস্তুত সেই সময়ের যে আর্থিক সংগঠন, যার ভিতর রয়েছে অত্যন্ত অপরিসর বাজার-ব্যবস্থা, যার সঙ্গে চাষী সরাসরি যুক্ত, তা স্থানীয় প্রধানদের নির্ভরশীল

চষীদের উপর প্রভূত্বে বাধা দিত। এই কারণেই জোতদাররা বন্ধকি জমি বাজেয়াপ্ত করেও চাষের ভার দিয়ে পুরনো চাষীকেই রেখে দিত। নতুন প্রজা বসানর যে নানান ঝামেলা তা তারা জানত এবং নিরর্থক মনে করত।

এই ছোট চাষী-নির্ভর আর্থনীতিক ব্যবস্থায় জমিদারদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে সাময়িক স্বত্বে দেওয়া জমির মালিকরাও আছে, যারা চাষীর উদ্বৃত্ত উৎপাদন ভোগ করে। জমির খাজনা ও কর নিয়ে নানা ধরণের বিরোধ দানা বাঁধে। বাংলার বেশির ভাগ জায়গার চেয়ে বিহারের জমিদাররা এই বিদ্রোহ থামাতে অনেক বেশি সফল হয়েছিল।

এতক্ষণ যা বলা হল, তার থেকে দুটি সিদ্ধান্তে আসা যায়। কৃষি অর্থনীতির উপর আধিপত্য যে সব সময় জমির সঙ্গে যুক্ত ছিল, তা নয়, এবং বছরের পর বছর এই ব্যবস্থা যে চলে আসছিল, তা একটি গোষ্ঠীর হাতে সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল বলে নয়। এখানে আরো যে সব ঘটনা ঘটেছিল, যার প্রভাব বিভিন্ন গ্রামীণ গোষ্ঠীর উপর পড়েছিল এবং তাদের পরস্পরের যে সম্পর্ক তা বিচার করে দেখা প্রয়োজন। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো কৃষি অর্থনীতিকে স্বাধীনভাবে কতটা প্রভাবিত করেছিল, তার উপর বেশি জোর দেওয়া ঠিক হবে না।

কৃষি উৎপাদন কতখানি এই ক্ষমতা কাঠামোর উপর নির্ভরশীল ছিল সে বিষয়ের বিবেচনায় সাবধানী হতে হবে। কারণ, এই প্রবণতা কতখানি ব্রিটিশ শাসনের ফলে, সে বিষয়ে সঠিক জানা যায় না। কৃষির আয়তনে এবং উৎপাদনে পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য এ ব্যাপারে সাবধানী করে দেয়।

এই প্রবণতার যা মুখ্য বৈশিষ্ট্য তা দেখাতে গিয়ে ব্লিন বলেছেন, "একর প্রতি উৎপাদনের উপর ঝোঁক না দিয়ে ফসলের জমি বেশি বিস্তার করা হয়েছিল এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও চাষের একর বাড়াবার ক্ষেত্রে মন্থরতা দেখা দিয়েছিল। বহুদিনের ঐতিহ্যবাহী জায়গায় এই কথাটা বিশেষভাবেই সত্য।"[৬৮] চাষের জমি বাড়িয়ে যাওয়াটা প্রযুক্তির পরিবর্তনের উপর তেমনভাবে নির্ভরশীল নয়। ফলে এই কাঠামোই ধরে নেওয়া হল উৎপাদন বাড়াবার সবচেয়ে সহজ উপায়। তখন চালু প্রযুক্তির প্রেক্ষিতে চাষ বাড়িয়ে যাওয়ার প্রধান বাধা ছিল। নতুন চাষের জমির সুযোগ কমে আসা — এই যুক্তি দিয়েই দেখান যায়, বৃহত্তর পাঞ্জাবে চাষাবাদ যখন বেড়ে চলেছে, বাংলার চাষবাসের সম্প্রসারণ তখন বিস্তারের শেষ সীমায় পৌঁছেছে। ব্লিন ১৮৯০-এর দশকে কাজ শুরু করে দেখেন, ছয়টি বৃষ্টি বহুল জায়গার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভেজা অঞ্চল বৃহত্তর বাংলা এবং তার বসতিই সবচেয়ে বেশি ঘন। বৃহত্তর পাঞ্জাব সবচেয়ে শুকনো জায়গা ছিল এবং বাংলার তুলনায় তার জনসংখ্যা অর্দ্ধেক ছিল। এই অঞ্চলে নতুন বসতি স্থাপন হচ্ছিল এবং যে সব জায়গায় নতুন খাল কাটার ফলে সেচের জল এসেছিল, সে সব জায়গায়ই দ্রুত বসতি তৈরি হয়েছিল। এই অঞ্চলগুলো বৃষ্টির জল পেত না বলে, এতদিন তেমন করে চাষের আওতায় আসে নি। পরে এগুলো ব্যবহার করা হয়। বৃহত্তর বাংলায় নতুন চাষের তেমন সুযোগ না থাকায় প্রজাদের আস্তে আস্তে প্রান্তীয় জমিতে চলে যেতে হয়।

এর একটা প্রধান কারণ, প্রযুক্তির অসম্প্রসারণ। এখানে প্রশ্ন ওঠে, এই বাধা কেন উপেক্ষা করা হয়নি। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, তখনও জানা ছিল না, কি করে প্রকৃতিকে বশ করা যায়, বিশেষ করে দুর্গম ভূখণ্ডে। এই সব অঞ্চলে কিছু সামাজিক গোষ্ঠী যথেষ্ট বিনিয়োগ করেনি — এই বলে এর ব্যাখ্যা দেওয়া চলে না। চতুর্দশ শতাব্দর ইউরোপের আর্থনীতিক ইতিহাসে দেখা যায়, এই প্রান্তীয় জমিকে চাষের আওতায় এনে প্রযুক্তিগত বাধাজনিত যে সমস্যা তার সমাধান করা হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দতে ইংল্যান্তে কৃষি বিপ্লবের ফলে চাষবাসের ব্যবস্থায় ও সরঞ্জামে নানা রকম পরিবর্তন এসেছিল। এরপর মাটি ও ফসল নিয়ে গবেষণা হয়েছিল এবং লোকের এ বিষয়ে জ্ঞান বেড়েছিল। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, প্রচলিত যা জ্ঞান ছিল, তাও ঠিকমত কাজে লাগান হয় নি। বৃহত্তর পাঞ্জাবে কৃষির সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছিল, কারণ সরকার সেচের কাজে প্রচুর অর্থব্যয় করেছিল বলে। বাংলায় এমন হয়নি। যদি বলা হয় যে, ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তা সম্ভব হয়নি, তাহলে বিষয়টাকে লঘুভাবে দেখা হবে। ভূসম্পত্তির মালিকরা যাতে উন্নয়নমূলক কাজে, যেমন সেচের জন্য, সরকারকে টাকা দেয়, সে বিষয়ে সরকারের নজর ছিল। যেখানে জমিদারের ক্ষমতা ছিল না, সেখানেও সরকার নামমাত্র খরচ করত। সরকার যেখানে দেখত বিনিয়োগের পরও লাভের আশা খুব ক্ষীণ, সেখানে কোন রকম পয়সাই ঢালত না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জমিদাররাও আর তেমন বিনিয়োগ করত না। প্রসঙ্গত বলে রাখা উচিত যে, শুধুমাত্র খাজনা থেকে বাধা আয় হত বলেই এমনটা হয় নি। এর পিছনে আরও নানা কারণ ছিল।

যে সব জায়গায় চাষ বেড়েছিল, বিশেষ করে গ্রামের বসতিগুলোয় তা প্রধানত ছোট চাষীদের উদ্যোগেই। এটা সম্ভব হয়েছিল চাষীদের নিজেদের বেঁচে থাকার তাগিদেই। ক্রমবর্দ্ধমান চাষীর দল হয় বড় ভূমি মালিকের সঙ্গে, না হয় বাজারের ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ফলে উৎপাদন কাঠামো সামান্যই বিঘ্নিত হয়েছিল। কিছু জায়গায় অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে ঠেকেছিল যে, চাষীরা নিজেরাই চাষ বাড়ানর অভিপ্রায়ে জমি চাষ করত। তারা সাধারণ অবস্থায় অবশ্য এটা করত না। উত্তর বিহারের অনেক জায়গায় এরকম দেখা গিয়েছে। জনবহুল মৈমনসিংহ এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু চাষী পরিবার আবাস গুটিয়ে আসামের নিম্ন উপত্যকায় এসে বসতি স্থাপন করে। এর প্রধান কারণ ছিল, এখানে চাষের উপযোগী প্রচুর উর্বর জমি ছিল। আসামে পাট চাষের সাফল্যের পিছনে এই পরিব্রাজক চাষীদের উদ্যোগের বিরাট ভূমিকা ছিল। এর কারণ অবশ্য পাটের বাজার সব সময়ই লাভজনক ছিল। বিংশ শতাব্দর প্রথম চার দশকে বাংলার জেলাগুলির চেয়েও আসামে চাষের বাজার খুব দ্রুত বেড়েছিল। তার প্রধান কারণই হল, পাটের দাম সর্বদাই চড়া ছিল (ডি. নারায়ণ, ১৯৬৫, ৬৮)।

জমিদার ও জোতদাররা অনেক সময়ই পাটচাষে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও অর্থ যুগিয়েছে।

জমিদাররা, বিশেষ করে, নিজেদের খাজনার আয় বাড়াবার কথা ভেবেই আরো বেশি করে নতুন চাষে উৎসাহ দেখায়। খুব অল্প সংখ্যক জোতদারই এই চাষে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। বিশেষ করে যারা বড় আকারের জমি পুনরুদ্ধারের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং এই কাজের সবচেয়ে খারাপ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছে। তবে এতেও এদের উদ্যোগ বেশি দিন টেকে নি। অন্য উৎসাহী লোক এদের হাত থেকে চাষের কাজ নিয়ে নিয়েছিল। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুন্দরবনের কমিশনার বলেছে, ভূস্বামী অথবা জমিদার বলতে যে সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠীর কথা ভাবা হয়, জোতদার (যারা জমি হাসিলের সঙ্গে লিপ্ত ছিল) বলতে সেই ছবি মনে আসে না।

জোতদারদের এই বিশেষ ভূমিকার সঙ্গে তাদের সাধারণ পরিচয় না মিশিয়ে ফেলাই ভালো। চাষের বৃদ্ধির সঙ্গে তাদের খুব সামান্যই যোগ ছিল, যদিও জমির মালিক হিসেবে তাদের একটা বড় রকম আয় ছিল কর ও খাজনা থেকে। কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া, অন্যত্র চাষবাসের উন্নতির ব্যাপারে তাদের প্রায় কোনই ভূমিকা ছিল না। তারা ভাগচাষীদের যে আর্থিক সাহায্য দিত, তাও ফসল তোলার সময় সুদে আসলে আদায় করে নিত। তারা আর্থিক সাহায্য দিত এই কারণে যে, অন্যথায় ভাগচাষ প্রথা পুরোটাই নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কা ছিল। ভাগচাষপ্রথা যাতে নষ্ট না হয়, সেদিকে তাদের দৃষ্টি ছিল। ভাদুড়ী মনে করেন, জোতদাররা চাইত, ভাগচাষীরা ধার নিয়ে চাষ করুক। এর ফলে ভাগচাষীদের উন্নতির বিশেষ আশা ছিল না।[৬৯]

বৃহত্তর বাংলায় উৎপাদনের অবনতির কারণ গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো দিয়ে পুরোপুরি বিশ্লেষণ করা যায় না। ধান জমির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সত্যি হলেও, অর্থকরী শস্যের উৎপাদন বেড়েছিল। যেহেতু ধানই চাষের জমির সিংহ ভাগ দখল করেছিল, সেহেতু যদি ধরা হয় যে, চাষের অবনতি হয়েছিল, তাহলে তা এই সব অঞ্চলের চাষের পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত বলেই মেনে নিতে হবে। ব্লিন ও ইসলাম দু'জনেই মনে করেন, যে এই অবনতি বাংলার চেয়েও বিহার ও উড়িষ্যায় বেশি হয়েছিল। ব্লিন অবশ্য অবনতি আদৌ হয়েছিল কীনা যে ব্যাপারে সন্ধিহান। তাঁর মতে সরকারি তথ্যে নিশ্চয়ই কিছু ভুল থেকে গিয়েছে।[৭০]

বাংলার অবস্থা এদের থেকে অল্পই ভালো ছিল। ১৯২০-৪৬-এর মধ্যে এখানে উৎপাদনের বৃদ্ধির হার বলতে গেলে শূন্য। নিচের তলায় উৎপাদনের ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে বলা যেতে পারে। চাষবাস এখানে এমন একটা স্থায়ী অবস্থায় এসে ঠেকেছিল, যার পরে উৎপাদনের আর অবনতি হওয়া সম্ভব নয় (ইসলাম, ৭৪-৭৫)।

বিংশ শতাব্দর প্রথম চার দশকে বৃহত্তর বাংলার কৃষি উৎপাদনে কেন এই নিশ্চলতা এসেছিল তা এক কথায় ব্যাখ্যা করা যাবে না। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় এই অবনতির কারণ আলাদা। এই সব কারণের সঙ্গে স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোর তেমন যোগ ছিল না। জন সংখ্যা বৃদ্ধির চাপে চাষীরা বিহারে বসতি স্থাপন করেছিল। এখানে তেমন বৃষ্টি হত না, সেচেরও বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। ফলে এসব জায়গায় সম্বৎসর চাষ হওয়ার উপায়

ছিল না। ব্লিন দেখিয়েছেন, ১৯১১ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে বৃষ্টিপাত ছিল অল্প। তাই এই সময়ে ধান উৎপাদন পড়ে যায়। বাংলার মধ্যে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোর এই জেলাগুলিতেও ধান জমি থেকে ক্রমশই কম ফসল উৎপাদিত হচ্ছিল। কারণ, গঙ্গার জলস্রোত পূর্ব দিকে সরে গিয়ে সমুদ্রে পড়েছিল। ফলে এই সব অঞ্চলে জল সরত না এবং ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেড়ে গিয়েছিল। তাছাড়াও, এই জায়গাগুলোয় আর বাৎসরিক বন্যার পর তেমন করে পলি মাটি জমত না। জমির উর্বরতাও কমে গিয়েছিল। বিংশ শতাব্দর অনেক আগেই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয়। জমির উর্ব্বরতার উপর "এর প্রভাব অবশ্যই পড়েছিল। যার ফলে, কিছু জমি উপ-প্রান্তীয় জমিতে পরিনত হয়।" এই পুরো ব্যাপারটাই স্থানীয় বলা চলে। কারণ চাষের জমির মাত্র ৫ শতাংশই এর ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পরিবেশ দূষিত হওয়ার দরুন ম্যালেরিয়া বার বার দেখা দেয়। বহু সংখ্যক চাষী-মজুরের মৃত্যু হয়, এবং যারা বেঁচে থাকে তাদেরও কর্ম-শক্তি হ্রাস পায়। এতে চাষের ভীষণ ক্ষতি হয়। এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এর প্রভাব পড়ে।

মৃতপ্রায় ব-দ্বীপের বাইরের অনেক জেলাও, যেমন বর্ধমান ও হুগলি উপরোক্ত জায়গাগুলোর চেয়ে অনেক বেশি দুর্দশাগ্রস্থ ছিল।

আরেকটি স্থানীয় ঘটনা যার জন্য উৎপাদন বিঘ্নিত হয়েছিল, তা হল অনেক ধান জমিতে লোকে বেশি মুনাফার আশায় আম চাষ শুরু করে। ১৯৩০-এর দশকে বিহারে যে ধান চাষের পরিমাণ ও উৎপাদন কমে গিয়েছিল, তার পিছনে ব্লিন এই যুক্তি দেখান। সেখানে আমের চাষ তিনশ হাজার একর বেড়ে চারশ হাজার একর হয় ১৯৩৩-৩৪-এ এবং সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছয় ১৯৪০-৪১এ, যখন উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত জমির পরিমাণ ছিল পাঁচশ হাজার একর। এক দশকে হঠাৎ এই ৬৬.৬ শতাংশ বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল, ধান জমিতে আম চাষ হয়েছিল বলে। তবে তা কতটা হয়েছিল, তা সঠিক জানা যায় না বলে, অনেক সময়ই এই ঘটনাকে বাড়িয়ে বলা হয়। যদি ধরা হয়, ১৯৪০-৪১-এ ধানের জায়গায় আম চাষের সম্প্রসারণ হয়েছিল, তাহলেও তা মূল ধান চাষের জমির ৪ শতাংশ মাত্র (ব্লিন, ১৭৪-৭৫)।

বাংলায় ধানের জায়গায় যেখানে পাট চাষ হয়েছিল, সেখানে ঘটনাটা অন্য রকম। অনেক জায়গায় আমন ধানের পরিবর্তে পাট চাষ হত। বাংলার প্রধান ধান চাষ অর্থাৎ রবি ফসলের জায়গায় তখনই পাট চাষ হয়েছে, যখন আবহাওয়া অনুকূল হত। এই সীমিত চাষের জন্য আমন ধানের জমিতে পাট করার প্রয়োজন হত না। কারণ হিসেবে দেখা গিয়েছে, ১৯২০-৪৬ সালের মধ্যে বার্ষিক হারে আমন ধান সেখানে ০.২ শতাংশ বেড়েছিল পাটের চাষ সেখানে সামান্য বেশি হারে অর্থাৎ ০.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এতক্ষণ বলা হয়েছে যে বৃহত্তর বাংলার কিছু জায়গায় কৃষি অর্থনীতিতে আবদ্ধতা এসেছিল, তার সঙ্গে গ্রামীণ ক্ষমতা-কাঠামোর বিশেষ যোগ ছিল না। তা বলতে এই নিশ্চলতার পিছনে এই কাঠামোর কোন ভূমিকাই ছিল না, তা বোঝান হয়। এখানে বলতে চাওয়া হয়েছে

যে, এই গ্রামীণ ক্ষমতা-কাঠামো ছাড়াও এই সময়ে কৃষি জগতে আরো নানা পরিবর্তন ঘটেছিল এবং সব মিলিয়েই এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল।

অন্যদিকে কৃষি জগতের ওঠানামার সঙ্গে এই ক্ষমতা-কাঠামোর কতটা কার্য কারণ সম্পর্ক ছিল তা আমরা সংখ্যা তথ্যের সাহায্যে মিলিয়ে দেখতে পারি না। উদাহরণ স্বরূপ ভাগ চাষের কথা বলা যায়। যে অবস্থায় আধিয়ার বা ভাগচাষীরা কাজ করত— যেমন খাজনার মাধ্যমে মালিকের শোষণ, তাও আবার মোট উৎপন্নের পরিমান অনুযায়ী নির্ধারিত হত। আজন্মকাল মহাজনের কাছে ঋণের জালে বাধা থাকায় এবং জমির মালিক চাষে তেমন বিনিয়োগ না করায় কৃষিতে কোন উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। ফলে, উৎপাদনও তেমন বৃদ্ধি পায় নি এবং চাষীদেরও উন্নতি হয় নি। অনুমান, যে সব অঞ্চলে ভাগচাষীদের লাঙল বলদ ইত্যাদি কিনে মালিককে ফেরত দিতে হয়েছিল, সেখানে চাষবাসের কাজ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এ সব জায়গায় মালিক লাঙল বলদ যোগানর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয় নি। অন্য দিকে আবার দেখা যায় যে, ভাগচাষী সচরাচর বর্গা চাষে অবহেলা দেখাত না। কারণ, এই চাষের উপরই তার পরিবারের জীবিকা নির্ভর করত। নিশ্চিত ভাবে বলা কঠিন, তবে বেশির ভাগ সময়ই দেখা গিয়েছে যে, আধিয়ার ভাগচাষের জমি ও তার নিজের জমি একই সঙ্গে চাষ করত।

যে সব অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থার অবহেলার কারণে ফসলের উৎপাদন পড়ে গিয়েছিল, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে জমিদাররা এর জন্য কত দূর দায়ী? অনেকে পুরনো বাঁধ ও সেচের কাজে তেমন নজর দেয় নি। তবে ব্রিটিশ রাজত্বকালের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো দোষ তাদের একার নয়। ইংরাজরা রাজস্ব ব্যবস্থায় যে অসম্ভব কাঠিন্য দেখিয়েছিল, তাও এর জন্য বহুলাংশে দায়ী। ফসলের অবস্থা যাই হোক না কেন, রাজস্ব আদায়ে কোন ছাড় নেই। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হল, জমিদাররা আর পুরনো বাঁধ সারাত না, সেচ-ক্ষতিগ্রস্ত হত। এতদিন তারা এই সব কাজে যতটা বিনিয়োগ করে এসেছে, এখন আর তা পারত না। এরকমটা দেখা যায় বর্ধমান ও মেদিনীপুরে। অনেক জায়গায় বড় পুকুর ও জলাশয় ক্রমশ বুজে যাওয়ায় চাষের কাজ ব্যাহত হয়। আগে জমিদাররা বহু খরচ করে যে পুকুর কাটাত তা চারপাশের আর্থিক উন্নতির জন্য নয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এর কারণ ছিল ধর্মীয়। ক্রমশঃ ধর্মীয় দুর্বলতা ফিকে হয়ে আসতে থাকে এবং পুকুর কাটা কমে যাওয়ায় সেচের কাজে বাধা পড়ে। যেখানে পুরনো জমিদারি নতুন লোকেরা নিলামে কিনে নিয়েছিল সেখানেও এরকম দেখা গিয়েছিল। আবার যেখানে জমিদারি ভাগ হয়ে অনেক অংশীদারের হাতে চলে যায়, সে সব জায়গায়ও জমিদাররা আর পূণ্যলাভের আশায় পুকুর দিঘি কাটাত না।

পরের দিকে দেখা যায়, জমিদাররা নিজেরা তেমন করে আর সেচ ব্যবস্থার উন্নতিতে মন দিত না। যে সব বিত্তবান চাষী নতুন জলাধার কাটাত বা গাছ লাগাত, জমিদাররা তাদের এসব কাজে বাধা দিত। তারা ভয় পেত, এই ভাবে চাষীরা জমিতে তাদের অধিকার পোক্ত

করে ফেলবে। প্রথানুযায়ী জমিদারের মত ছাড়া জলাশয় খনন করা যেত না। দেখা গিয়েছে, যে সব জায়গায় জমিদাররা এসব কাজে সম্মতি দিয়েছে, সেখানে তারা এর পরিবর্তে প্রচুর মূল্য নিয়েছে।

দক্ষিণ বিহারের কিছু জায়গায় সেচের অর্থাৎ 'আহার ও পহিন' এর কাজে যে অবনতি ঘটে, তা দুটি পর্যায়ে হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দর শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে, জমিদাররা আর তেমন করে ক্রমশঃ জটিল সেচ ও জল বন্টনের কাজে ক্ষমতা জারি করতে পারছে না। তারা যে কেবল নিজেদের জমিদারি দেখতে অক্ষম তাই নয়, তাদের ক্ষমতা পড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ হল, জমিদারির অংশীদারদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ। ভূ-সম্পত্তির দাম ক্রমশই বেড়ে চলেছিল। তার জন্যই প্রধানত ঝগড়া বাধে। এর সঙ্গে মালিকের সাথে খাজনা বাড়ান নিয়ে প্রজার বিরোধের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। উনিশ শতকের শেষ থেকে অবশ্য ফসলের মাধ্যমে চাষী খাজনা দিতে রাজি না হওয়ায় বিরোধ চরমে পৌঁছয়। জমিদার তখন থেকে সেচের কাজে আর অর্থ ব্যয় করত না বলে ক্রমেই তার অবনতি ঘটে। ফসলের দাম বাড়তে থাকায় জমিদার চাইত প্রজারা তাকে ফসলের মাধ্যমে খাজনা দিক। ওদিকে বাড়তি দাম থেকে মুনাফা পাবার আশায় প্রজারা অর্থে খাজনা দিতে চায়। যেখানে প্রজারা তাদের দাবি বজায় রাখতে পেরেছিল, সেখানে ব্যর্থ জমিদাররা তাদের আগের দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার করত। বাঁধ সংস্কার ও সেচের উন্নতিতে বাধা পড়ত, চাষীরা নিজেরাও কোন বিকল্প ব্যবস্থা করে উঠতে পারত না। ফলে ধীরে ধীরে তা নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। খাজনা আন্দোলনের ফলে জমিদার কৃষিতে আর বিনিয়োগ করত না। উনিশ শতকের শেষের দিকে এটা বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে যে, ক্ষেতের পরিমান যতদূর বাড়ান সম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তা সম্ভব হয়েছে নির্দিষ্ট আয়তনের জমির উৎপাদন বৃদ্ধি করে। জমিদারদের এতে বিশেষ উৎসাহ ছিল না। জমি পুনরুদ্ধারের সময়, জমিদারের যে ক্ষমতা ছিল, এখন তাও নেই। এখন তাকে ছোট চাষীর ইজারা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এর থেকে যা উৎপাদন হত, তার খানিকটা জমিদারের পাওনা ছিল। এক বড় সংখ্যক চাষী আইনত ভোগ- দখলস্বত্ব ভোগ করত। কাজেই জমিদার কৃষিতে কতটা অর্থ ব্যয় করেছে, সেই হিসেবে সে আর খাজনার পরিমান ধার্য করতে পারত না। এ ব্যাপারে আইনি অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও, কার্যতঃ প্রয়োগ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৭১]

এই সব ক্ষেত্রে গ্রামীণ ক্ষমতা-কাঠামো কিভাবে কৃষি উৎপাদনকে প্রভাবিত করেছিল, তা স্পষ্ট করে দেখান যায়, তবে এই প্রক্রিয়াকে সব সময় প্রতিনিধিত্বমূলক বলা চলে না।

গ্রন্থপঞ্জী

আর. আহমেদ (১৯৮১), *দি বেঙ্গলি মুসলিম, ১৮৭১-১৯০৬: আ কোয়েস্ট ফর আইডেন্টিটি* (দিল্লি, অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস)।

আন্দ্রে বেতেই (১৯৭৪), *স্টাডিস্ ইন দি অ্যাগ্রারিয়ান সোশাল স্ট্রাক্চার* (দিল্লি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস)।

অমিত ভাদুড়ী (১৯৭৩), ‘এ স্টাডি ইন এগ্রিকালচারাল ব্যাক্ওয়ার্ডনেস আণ্ডার সেমি-ফিউডালিজম্’, *দি ইকনমিক জর্নাল* , মার্চ।

রবার্ট ব্রেনার (১৯৭৬), ‘এগ্রিকালচারাল ক্লাশ স্ট্রাকচার অ্যাণ্ড ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট ইন প্রি-ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউরোপ’, *পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেন্ট*, ফেব্রুয়ারি।

ফ্রান্সিস বুকানন (১৯৫১, সেন্সাস অফ ইণ্ডিয়া-এডিশন), *এ জিওগ্রাফিক্যাল, স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাণ্ড হিস্টরিক্যাল ডেসক্রিপশন অফ দি ডিস্ট্রিক্ট অফ দিনাজপুর ইন দি প্রভিন্স অফ বেঙ্গল,* (বুকানন ১৮০৮ সালে এই জেলা পরিদর্শন করেন। এই প্রতিবেদনের কিছু অংশ পরে *সেন্সাস অফ ইণ্ডিয়া* নামে প্রকাশিত হয় ১৯৫১, ৬, ভাগ-১ সি)।

এন.কে. চন্দ্র (১৯৭৫), ‘অ্যাগ্রারিয়ান ট্রান্জিশন ইন ইণ্ডিয়া’, *ফ্রন্টিয়ার*, ২২ নভেম্বর, ৬ ডিসেম্বর।

বি.বি.চৌধুরী (১৯৬৯), ‘এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্শন ইন বেঙ্গল, ১৮৫০-১৯০০, কো-এক্সিসটেন্স অফ ডিক্লাইন অ্যাণ্ড গ্রোথ্’ *বেঙ্গল পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেন্ট*, জুলাই-ডিসেম্বর।

(১৯৭৫), ‘ল্যাণ্ড মার্কেট ইন ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া, ১৭৯৩-১৯৪০’, *ইণ্ডিয়ান ইকনমিক অ্যাণ্ড সোশাল হিস্ট্রি রিভিউ*, এপ্রিল-জুন।

(১৯৭৫), ‘দি প্রসেস অফ ডিপেজেন্টাইজেশন ইন বেঙ্গল অ্যাণ্ড বিহার, ১৮৮৫-১৯৪৭,’ *দি ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রিভিউ*, জুলাই।

(১৯৭৬), ‘এগ্রিকালচারাল গ্রোথ ইন বেঙ্গল অ্যাণ্ড বিহার, ১৭৭০-১৮৬৭ দি গ্রোথ অফ কাল্টিভেশন্ সিন্স দি ফ্যামিন অফ ১৭৭০’, *বেঙ্গল পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেন্ট*, জানুয়ারি-জুন।

(১৯৭৭), ‘মুভমেন্ট অফ রেন্টস ইন ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া, ১৭৯৩-১৯৩০’, *দি ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল রিভিউ*-৩, ২, জানুয়ারি।

‘এগ্রিকালচারাল প্রাইসেস ইন বেঙ্গল অ্যাণ্ড বিহার, ১৭৫৭-১৮৬০’, অপ্রকাশিত।

এইচ টি কোলব্রুক (১৭৯৫ প্রথম সংস্করণ), *রিমার্কস্ অন দি হাজ্ব্যাণ্ড্রি অ্যাণ্ড ইনটারনাল কমার্স অফ বেঙ্গল*, (কলকাতা)।

কনফিডেন্সিয়াল (অপ্রকাশিত) অফিসিয়াল ইনকোয়ারি ‘রিলেশনস্ বিটুইন বর্গাদারস্, অ্যাণ্ড দেয়ার ল্যাণ্ডলর্ডস্— তেভাগা মুভমেন্ট, ১৯৪৭’।

যতীন্দ্র নাথ দে (১৯৭৭), ‘দি হিস্ট্রি অব দি কৃষক প্রজা পার্টি অফ বেঙ্গল, ১৯২৯-১৯৪৭; এ স্টাডি অফ চেঞ্জেস ইন ক্লাশ অ্যাণ্ড ইন্টারকমিউনিটি রিলেশনস্ ইন দি অ্যাগ্রারিয়ান সেক্টর অফ বেঙ্গল’, অপ্রকাশিত পি এইচ ডি থিসিস, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়।

এ. ঘোষ, এ. কে দত্ত (১৯৭৭), *ডেভেলপমেন্ট অফ ক্যাপিটালিস্ট্ রিলেশনস্ ইন এগ্রিকালচার: এ কেস স্টাডি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ১৭৯৩-১৯৭১* (নিউদিল্লি, পিপল্স্ পাবলিশিং হাউস)।

আর.ই.ফ্রিকেনবার্গ (সম্পাদিত) (১৯৭৮), *ল্যাণ্ড টেনিওর অ্যাণ্ড দি পেজেন্টস্ ইন সাউথ এশিয়া* (নিউদিল্লি, ওরিয়েন্ট লংম্যান)।

আর.এইচ. হিলটন (১৯৭৫), *দি ইংলিশ পেজেন্ট্রি ইন দি লেটার মিডল এজেস্* (অক্সফোর্ড, ক্ল্যারেনডন প্রেস)।

এম.এম. ইসলাম (১৯৭৮), *বেঙ্গল এগ্রিকালচার, ১৯২০-১৯৪৬: এ কোয়ান্টিটেটিভ্ আনালিসিস্* (কেম্ব্রিজ, কেম্ব্রিজ ইউনিভাসিটি প্রেস।)

জে. আর. ম্যাকলেন (১৯৭৭), ‘রেভিনিউ ফার্মিং অ্যান্ড্ দি জমিনদারি সিস্টেম ইন এইটিন্থ্ সেঞ্চুরি বেঙ্গল,’ আর ই ফ্রিকেনবার্গ (সম্পাদিত), *ল্যাণ্ড টেনিওর অ্যাণ্ড দি পেজেন্টস্ ইন সাউথ এশিয়া* (নিউ দিল্লি, ওরিয়েন্ট লংম্যান)।

টি. আর. মেটকাফ (১৯৭৯), *ল্যাণ্ড, ল্যাণ্ডলর্ডস্ অ্যাণ্ড দি ব্রিটিশ রাজ: নর্দার্ন ইণ্ডিয়া ইন দি নাইনটিন্থ্ সেঞ্চুরি* (বার্কলে, ইউনিভাসিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া)।

পি. জে.মাসগে:ভ (১৯৭২), ‘ল্যাণ্ডলর্ডস, অ্যাণ্ড লর্ডস্ অফ দি ল্যাণ্ড, এস্টেট ম্যানেজমেন্ট অ্যাণ্ড সোশা। কন্ট্রোল ইন উত্তরপ্রদেশ ১৮৬০-১৯২০’, *মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ্* ৬ : ৩।

জি. মিরদাল (১৯৬৮), *এশিয়ান ড্রামা* (নিউ ইয়র্ক, প্যানথিয়ন)।

ডি. নারায়ণ (১৯৬৫), *ইমপ্যাক্ট অফ প্রাইস মুভমেন্টস অন দি এশিয়াস আণ্ডার সিলেক্ট ক্রপস্ ইন ইণ্ডিয়া: ১৯০০-১৯৩৯* (কেম্ব্রিজ, কেম্ব্রিজ ইউনিভাসিটি প্রেস)।

সি.ওয়াল্টার নিল (১৯৬২), *ইকনমিক চেঞ্জ ইন রুরাল ইণ্ডিয়া: ল্যাণ্ড্ টেনিওর অ্যাণ্ড্ রিফর্ম ইন উত্তর প্রদেশ, ১৮০০-১৯৫৫,* (নিউ হ্যাভেন, ইয়েল ইউনিভাসিটি প্রেস)।

ডব্লু. অ্যালেস্টার ওর, ‘এ কম্পারেটিভ স্টাডি অন এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট ইন দি ফর্থ ভ্যালি, স্কটল্যাণ্ড অ্যাণ্ড দি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ১৭৬০-১৮৪০’। পি.এইচ.ডি থিসিসের জন্য লেখা হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অফ ইকনমিক হিস্ট্রি, ইউনিভাসিটি অফ এডিনবার্গ।

জি. পাণ্ডে (১৯৭৮), *দি অ্যাসেণ্ডেন্সি অফ দি কংগ্রেস ইন উত্তর প্রদেশ, ১৯২৬-১৯৩৪: এ স্টাডি ইন ইমপারফেক্ট মবিলাইজেশন* (দিল্লি, অক্সফোর্ড ইউনিভাসিটি প্রেস)।

জগদীশ রাজ (১৯৭৮), *ইকনমিক কনফ্লিক্ট্ ইন নর্দান ইণ্ডিয়া এ স্টাডি অফ ল্যাণ্ডলর্ড টেনান্ট রিলেশানস্ ইন আওধ, ১৮৭০-১৮৯০* (বোম্বাই, অ্যালায়েড পাব্লিশার্স)।

রজত রায় ও রত্নলেখা রায় (১৯৭৩), ‘দি ডাইনামিজম্ অফ কনটিনিউইটি ইন রুরাল বেঙ্গল আণ্ডার দি ব্রিটিশ ইমপিরিয়াম...’ *ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্ অ্যাণ্ড সোশাল হিস্ট্রি রিভিউ,*’ সেপ্টেম্বর।

রত্নলেখা রায় (১৯৮০), *চেঞ্জ ইন বেঙ্গল অ্যাগ্রারিয়ান সোসাইটি*(দিল্লি, মনোহর)।

রিপোর্ট অফ দি বেঙ্গল ল্যাণ্ড রেভিনিউ কমিশন (১৯৪০), কলকাতা, গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল।

এইচ. সান্যাল (১৯৮১), *সোশাল মবিলিটি ইন বেঙ্গল,* (কলকাতা, প্যাপিরাস)।

টি.ডব্লু. শুলৎজ্ (১৯৮৪), *ট্রান্সফর্মিং ট্রাডিশনাল এগ্রিকালচার,* (নিউ হ্যাভেন, ইয়েল ইউনিভ্রাসিটি প্রেস)।

Scanned by CamScanner

(অক্সফোর্ড, ক্ল্যারেনডন প্রেস)।

অমর্ত্য সেন (১৯৮১), *পভার্টি অ্যাণ্ড ফ্যামিন* (অক্সফোর্ড, ক্ল্যারেনডন প্রেস)।

এম. এইচ. সিদ্দিকি (১৯৭৮), *অ্যাগ্রারিয়ান আনরেস্ট ইন নর্দার্ন ইণ্ডিয়া : দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস, ১৯১৮-১৯২২* (নিউদিল্লি, বিকাশ)।

ডেভিড ওয়াশব্রুক (১৯৮১), 'ল স্টেট অ্যাণ্ড সোসাইটি ইন কলোনিয়াল ইণ্ডিয়া'; সি. বেকার, ডি. জনসন ও এ. শীল (সম্পাদিত) *পাওয়ার প্রফিট অ্যাণ্ড পলিটিক্স্* (কেম্ব্রিজ, কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস)।

পাদটীকা

১. এই প্রবন্ধে 'গ্রামীণ ক্ষমতা' কথাটি সীমাবদ্ধ ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে 'ক্ষমতা' বলতে জমির অধিকার জনিত ক্ষমতা বোঝান হয়েছে। অনেক সময় গ্রামীণ 'ঋণ' ব্যবস্থার উপর আধিপত্য থাকার দরুণ এই ক্ষমতা আরো জোরদার হত। এছাড়া আরো উপসঙ্গ হল বর্ণ, যা থেকে অনেকাংশে 'ক্ষমতা' লাভ করা যেত।

২. সম্প্রতি আর ব্রেনার আবার এই বিতর্কের অবতারণা করেন (*পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেন্ট,* ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬)। এই বিষয়ে বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন *পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেন্ট*(ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮; মে, ১৯৭৮; জুন ১৯৭৯)।

৩. এই কমিশন বসে ১৯৩৮ এর নভেম্বরে। এর প্রতিবেদনে (১৯৪০) বল' হয়, এই প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সব শ্রেণীকে এক লোহার খাঁচায় আটকে রেখেছে, উন্নয়ণের সব রকম প্রচেষ্টাকে নিষ্পিষ্ট করছে।.... ১৭৯৩-এ যে সব কারণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কার্যকর করা হয়েছিল, তা বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে কোন রকমেই খাপ খায় না। জমিদারি প্রথায় এমন ভাবেই ঘূণ ধরেছে যে তা কোন রকমেই জাতীয় কল্যাণ সাধনে সক্ষম নয়।

৪. ভারতবর্ষে কৃষির অনুন্নতির মূল কারণগুলো নীল এই ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। গত অর্দ্ধশতাব্দ ধরে অনুন্নত জায়গার অগ্রগতির অভাবের জন্য তিনি পুঁজিবাদকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন যে, পুরনো কৃষি সমাজে ভাঙন ধরাবার মত যথেষ্ট পাশ্চাত্য উপাদান আমদানি করা হয়। কিন্তু এতে করে পশ্চিম দেশগুলো যে পরিমাণে আর্থিক উন্নতি-লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল, ভারতবর্ষ তত লাভবান হয়নি। দারিদ্রের মূল কারণ হিসেবে দেখান হচ্ছে মূলধনের অভাব, গ্রামে সামাজিক শ্রেণী বিভাগ এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রতি একান্ত অবজ্ঞা (পৃ.৪)। উত্তর প্রদেশের সামাজিক কল্যাণ ব্যবস্থার নিশ্চলতার যে নানা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তা খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, এর বেশিরভাগ বক্তব্য বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে তা সমস্যার মূলে পৌঁছয় না। বাজারে সমন্বয়ের অভাব, বিকল্প উপার্জনের জন্য পুঁজির অভাব ও বাজার-ব্যবস্থা বিরোধী ভারতের সামাজিক.নীতি এর কারণ (পৃ. ১৫৬)।

৫. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলতে দুটো জিনিষ বোঝাত। এক জমির খাজনা নির্ধারণের এক পাকাপাকি

বন্দোবস্ত এবং দুই, জমিদারের উপর এটা আদায়ের দায়িত্ব। যদিও বেশিরভাগ লোকেই এটা মানে না, তাহলেও ১৭৬০ থেকে ১৭৯৩-এর মধ্যে বাংলায় জমির খাজনা সংক্রান্ত যে সব নতুন পরীক্ষা চালান হয়, তাতে এই শ্রেণী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

৬. এখানে 'জমিদার' বলতে সরকার যাদের থেকে সরাসরি খাজনা আদায় করত, সেই সম্পত্তির অধিকারী শ্রেণীর কথা বোঝান হয়েছে।

৭. এই বন্দোবস্তের ফলে পরবর্তীকালে অর্থনীতি কতটা প্রভাবিত হয়েছিল, তা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে, "বিদেশী শাসক নিজের স্বার্থেই টাকায় খাজনা আদায়ে মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলন ও বাণিজ্যিক নিয়ম কানুন চালু করে। এই সব ব্যবস্থা যথাযথ সময় আসার আগেই চালু করা হয়েছিল। টাকায় খাজনা আদায় করার তাগিদে সামন্ত-সম্পত্তির বেচা-কেনা শুরু হয়। আবদ্ধ সামন্তবাদী অর্থনীতি লেনদেন ও বাণিজ্যের দরজা খুলে দেয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকায় খাজনা দিতে হবে, না হলে জমিদারের সম্পত্তি নিলামে উঠবে— এমন নির্দয় শাসন ব্যবস্থার ফলে বাজারের দরজা খুলে যায়।" আগে জমিদারের সঙ্গে চাষীর যে একটা চিরাচরিত ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল, ক্রমাগত জমি বিক্রির ফলে, তা নষ্ট হয়ে যায় এবং সেটা চুক্তি গত সম্পর্কে এসে ঠেকে। এখন থেকে জমিদারি সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করা অত্যন্ত লাভজনক হয়ে ওঠে। বয়সানুক্রমে সম্পত্তির উত্তরাধিকারে যে সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক বাধা ছিল, তা তুলে দেওয়া হল। (পৃ.৮-৯)

৮. চিরকালের জন্য পাকাপাকি রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত করতে গিয়ে, সরকার কঠোর হাতে সংগ্রহের ব্যবস্থা করে। ফলে যারা ঠিক সময়ে খাজনা দিয়ে উঠতে পারত না, তাদের জমিদারি নিলাম হয়ে যেত। যদিও একথা বহু প্রচলিত, কিন্তু ১৮৩০-এর আগে জমির বাজারে শহুরে ক্রেতার আধিপত্য ছিল না। (চৌধুরী, *ইণ্ডিয়ান ইকনমিক অ্যাণ্ড সোশাল হিস্ট্রি রিভিউ,* [এখন থেকে এটিকে আই ই এস এইচ আর লেখা হবে,] এপ্রিল-জুন, ১৯৭৫-দ্রষ্টব্য)।

৯. যে কৃষি ব্যবস্থায় জমিদাররা স্থায়ী স্বত্ব বা তাদের ভূ-সম্পত্তি পত্তনি দিচ্ছে তা প্রথম প্রয়োগ করেছে বর্ধমানের মহারাজা। এর পিছনে দুটো কারণ ছিল। এক, বিস্তৃত জমিদারি থেকে ঠিক সময়ে 'কঠোর' হতে খাজনা আদায় করার যে ঝামেলা, বিশেষ করে যখন রাজস্ব বেড়েই চলেছিল, তার থেকে রেহাই পাবার জন্য। এবং দুই, যেহেতু ইজারাদারকে জমিদার যা খাজনা দিত, তার থেকে অনেক বেশি দামে এই জমি নিতে হত, সেহেতু জমিদারের তাৎক্ষণিক অনেকটা লাভ হত। এ ভাদুড়ী, দি ইভোল্যুশন অফ ল্যাণ্ড রিলেশনস্ ইন ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া আণ্ডার ব্রিটিশ রুল' (আই.ই.এস.এইচ.আর., জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৭৬)-এ কৃষি অর্থনীতিতে এর প্রভাবের উপর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই মধ্যবর্তী ইজারাদারদের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার কারণে চাষীকে বেশি পরিমাণে উৎপাদন করতে হত। এর ফলে চাষী ধার করতে একরকম বাধ্য হত। এইভাবে ক্রমশই কৃষি ঋণের বোঝা বেড়ে যায়। চাষীর যত নগদ টাকার দরকার হতে থাকে, তত সে দায়ে পড়ে ফসল বেচতে থাকে। এই ভাবে দেনার চাপে চাষী বাজারের যাঁতা কলে পড়ে যায়। ঋণ মেটানর জন্য চাল না বেচে তার আর কোন উপায় থাকে না।

এক বিচিত্র লেনদেনের এই ভাবে সূত্রপাত হয়— ধানের বদলে ধান। এর ফলে কৃষির সঙ্গে অন্য উৎপাদিত বস্তুর যে লেনদেন, তা ব্যাহত হয় এবং চাহিদা মেটাতে গিয়ে শিল্প ও কৃষির যে পরস্পর নির্ভরতা, তা নষ্ট হয়ে যায়।

১০. যে কোন মহালের মধ্যে অনেক ছেটানো গ্রাম থাকত। আস্তে আস্তে এইসব ভূ-সম্পত্তির বিভাজন ঘটত, হয় ভাগ না হয় বিক্রি হয়ে যেত।

১১. এর থেকে একটু আলাদা এক বক্তব্য গ্রাম-সমাজে জোতদারদের ভূমিকার উপর বেশি জোর দিয়েছে। দেখা গিয়েছে, যদিও জমিদার কৃষি সমাজের মাথায়, কিন্তু অনেক সময়ই সে অনাবাসী। গ্রামের বাসিন্দা হিসেবে জোতদারই সবার উপরে এবং তার হাতে প্রচুর ভোগস্বত্ব জমি। সে নিজে দৈহিক পরিশ্রম করে না এবং জমি হয় ভাগচাষে দেয়, না হয় ভাড়াটে মজুর দিয়ে চাষ করায়। জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হবার আগে, প্রায় একশ' বছর ধরে এই জোতদাররা গ্রাম বাংলার জমিদারদের ক্ষমতা আত্মসাৎ করেছিল। [এন.কে.চন্দ্র (১৯৭৫), 'অ্যাগ্রারিয়ান ট্র্যানজিশন ইন ইণ্ডিয়া', *ফ্রন্টিয়ার*, ২২ নভেম্বর-৬ ডিসেম্বর]।

১২. এগুলো বেশির ভাগই ছোট ছোট নিষ্কর জমি, কিছু জেলা বাদে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলো চাষের জমির একটা সামান্য অংশ মাত্র।

১৩. এখানে খাজনা আদায়ের অধিকারের সঙ্গে জমির অধিকারের পার্থক্য করা হয়েছে।

১৪. জোত বলতে খাজনা প্রদানকারী রায়তিস্বত্ব বোঝায়, তবে জোতদার বলতে সাধারণত বড় ভূস্বামী বোঝায়।

১৫. সদ্‌গোপ বিষয়ে বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন, এইচ. সান্যাল (১৯৮১, পৃ. ৪৫-৪৭ এবং অধ্যায়)। মুসলমান সমাজের নানা বিভাজন এবং শেখদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, আর আহমেদ (১৯৮১, ১ম অধ্যায়)।

১৬. জমিদাররা শাসন কাজে নানা রকম সাহায্য করে থাকত, তা মনে রেখেই সরকার এই অধিকার দিত।

১৭. বিহারের ঠিকাদারদের এবং বাংলার ও গ্রন্থীদের এভাবে উৎপত্তি হয়।

১৮. জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে ভাগ করার আগে, মোট উৎপাদনের একটা অংশ গ্রামের পদাধিকারী ব্যক্তির জন্য সরিয়ে রাখা হত।

১৯. জমিদারের বাড়ির বিশেষ অনুষ্ঠানে, যেমন ছেলের জন্ম কিংবা পরিবারের কারো মৃত্যু কিংবা উপনয়ন বা পূজা পার্বনে এই উপকর ধার্য করা হত।

২০. ফসল ক্রোক করে, শারীরিক অত্যাচার করে, ব্যক্তিগত জেলখানায় চাষীকে আটকে রেখে জমিদার তার দমন নীতি চালাত।

২১. এই নবাগতরা ছিল উৎসাহী এবং এদের বেশির ভাগেরই ইউরোপীয় রাজস্ব বিভাগের বা উচ্চ পদস্থ কালেক্টর বা অন্য আমলার, যারা এদের স্বার্থ দেখবে, তাদের সঙ্গে যোগ ছিল। খাজনা আদায় ব্যবস্থা নিলাম হবার ফলে, জমিদারি রাজস্ব-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে এবং জমির উপর ক্ষমতা ক্রমশই নিচের দিকে চলে যায়—এমন বক্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য আর ফ্রিকেনবার্গ সম্পাদিত গ্রন্থে জে আর ম্যাকলেন এর প্রবন্ধ (১৯৭৭)।

২২. রাজশাহী, দিনাজপুর, বীরভূম ও নদিয়াতে দেখা গিয়েছে, অসৎ পথে উপার্জিত অর্থ দিয়ে আমলারা এই সময় প্রচুর জমি কিনেছে।

২৩. দিনাজপুরের কালেকটর হ্যাচের সংস্কারের ফলে সেখানকার রাজার ক্ষমতা অনেকটা কমে যায়।

২৪. এই সময় ভূ-সম্পত্তি অনাকর্ষক হওয়ার কারণের জন্য দ্রষ্টব্য বি.বি.চৌধুরী (১৯৭৫-এর প্রথম অংশ)।

২৫. এই সময়কার দুটি ভয়াবহ আইন, যার কথা মনে করে চাষীরা পরে শিউরে উঠত, তা হল, ১৭৯৯-এর 'রেগুলেশন সেভেন' এবং ১৮১২-এর 'রেগুলেশন ফাইভ'। এই দুটো আইন জমিদারদের সীমাহীন অত্যাচারের নিদর্শন হিসেবে চাষীদের স্মৃতিতে রয়ে গিয়েছিল।

২৬. জমিদারদের যে সব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি সম্পূর্ণ নতুন নয়। নতুনত্ব এইখানে যে, এখন থেকে স্থানীয় পুলিশ এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে জমিদারকে সাহায্য করবে।

২৭. উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে মাল ক্রোক-এর অধিকার এবং খাজনা না দেবার অজুহাতে যখন তখন রায়তকে জমিদারদের কাছাড়িতে ডাকা। এমনিতে দুর্বিনীত চাষীকে আতঙ্কিত করার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল।

২৮. এর ফলে কোথা থেকে খাজনা আসবে, তা সহজেই অনুমান করা যেত। যে সব জমিদারি সম্বন্ধে অল্প তথ্য জানা যেত, তারা কম খাজনা দিয়ে পার পেয়ে যেত।

২৯. ১৮৫৯-এ রেন্ট অ্যাক্ট ও ১৮৮৫-তে বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্ট পাশ করা হয়। এই আইনগুলো আবার ১৯২৮, ১৯৩৮ ও ১৯৪০ সালে সংশোধিত হয়।

৩০. এই নতুন আইন শুধু যারা একটানা বার বছর জমির দখলি স্বত্ব ভোগ করেছে, অর্থাৎ ভোগ দখলের স্বত্বাধিকারী চাষীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্ট পাশ হয়ে এই আইনের প্রয়োগকে সহজ করে দেয় এই বলে যে, চাষী যদি একই গ্রামে তার জমি একটানা বারো বছর ভোগ করে, তাহলে এই আইন বলবৎ হবে। এই ভোগ দখল স্বত্বাধিকারী রায়তের খাজনা তিনটি কারণে বাড়ান যেতে পারত: এক, যে সব জায়গায় চাষাবাদ বেড়েছিল; দুই, যেখানে ফসলের দাম বেড়েছিল; তিন, যেখানে সমতুল্য জমিতে বেশি খাজনা দেওয়া হয়ে থাকত।

৩১. উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, জমিদারের কাছারিতে চাষীকে ডাকার অধিকার এবং খাজনা জমা না দেওয়ার দায়ে প্রজাকে আটকে রাখার অধিকার ছিল। জমিদারের প্রভূত্ব না মেনে নিলে জমিদার এই ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করত।

৩২. প্রজা আন্দোলনের জন্য দ্রষ্টব্য যতীন্দ্রনাথ দে (১৯৭৭)। এই প্রজা বিদ্রোহ প্রধানত কৃষি ভিত্তিক হলেও, মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে ক্রমশঃ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চেহারা নেয়।

৩৩. এ বিষয়ে অনেক লেখা আছে। বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য এম এইচ সিদ্দিকি (১৯৭৮,

১ম অধ্যায়), জি গাওে (১৯৭৮, ১৩-২২)। টমাস. আর মেটকাফ যদিও মাসগ্রেভের সঙ্গে একমত হয়েছেন যে, 'জমি-মালিক বলতে জমির মালিক বোঝাত না', তা সত্ত্বেও তিনি মনে করেন যে, অধস্তন কর্মচারীর উপর আধিপত্য বিস্তার করতে জমিদার অক্ষম ছিল, এমন মনে করার কোন কারণ নেই। মেটকাফ, (১৯৭৯, ২৭০) এছাড়া দ্রষ্টব্য জগদীশ রাজ— 'দি স্ট্রাগল্ উইথ দি আণ্ডারপ্রোপ্রাইটরস্,' তৃতীয় অধ্যায়, *ইকনমিক কনফ্লিক্ট ইন নর্থ ইণ্ডিয়া: এ স্টাডি অফ ল্যাণ্ডলর্ড টেন্যান্ট রিলেশনস্ ইন আওধ, ১৮৭০-১৮৯০*। এই বইতে রাজ মাসগ্রেভের বক্তব্যের বিরুদ্ধে বিপরীত যুক্তি দিয়েছেন।

৩৪. এই রাজ যে সব অসুবিধায় পড়েছেছিল, তা জানার জন্য দ্রষ্টব্য বি.বি. চৌধুরী (১৯৭৬, ২৯৯-৩০২)।

৩৫. আর্থিক ক্ষমতা ও নিজেদের সংহতি সচেতন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে ধর্মান্তরীত হওয়ার ফলে সদ্‌গোপরা যা পেয়েছিল, তা আচার অনুষ্ঠানে তাদের উচ্চস্থান করে দেয়। নবশাক বর্ণ বলে তারা আলাদা ভাবে পরিচিতি পেয়েছিল। তাদের আদি বর্ণ গোপ এবং তারা ছিল অজল চল (ব্রাহ্মণরা তাদের হাতে জল খেত না)। সদ্‌গোপরা গোপদের থেকে আলাদা হয়ে যায়। তারা জল চল হয়ে যায়। এদের হাতে জল খেলে ব্রাহ্মণদের জাত যেত না।

৩৬. কেন সরাসরি চাষ পছন্দ করা হত, তার বিশেষ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, বি বি চৌধুরী (১৯৭৫, বি: ভাগ ১০ বি, ১৫৩-৫৪)।

৩৭. যেখানে ঋণদাতাই জমির ক্রেতা সেখানে সুদের টাকার উপর তার ক্ষমতা ছিল বলে, সে একই ক্ষমতা সাময়িক স্বত্বের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করত।

৩৮. বেতেই বলেছেন "জমির পত্তনিদার এবং অন্যান্যরা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল বর্ধমান, বীরভূম এবং বাঁকুড়ায়। তারা পরিবারের লোকদের সাহায্যে কিংবা ভাড়াটে চাষী দিয়ে চাষ করাত। সামাজিক কাঠামোয় এরা খুব নিচু জায়গা পেত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে সব জায়গায় ছিল না, সেখানে বড় স্বত্বাধিকারী কৃষক অর্থাৎ জোতদারদের দেখতে পাওয়া যেত (১৯৪৭, ৪র্থ অধ্যায়, ১৩১)।

৩৯. এ বিষয়ে সম্প্রতি সমালোচনা করেছেন অ্যালেস্টেয়ার ডব্লু ওর : ৭ম অধ্যায়।

৪০. এগুলো বেঙ্গল ল্যাণ্ড রেভিনিউ কমিশনার সংকলন করেছিল [১৯৪০, ভল্যুম ২, পরিশিষ্ট, তালিকা ৮(এফ)]; যে সব আমলা 'সেট্‌ল্‌মেন্ট'-এর কাজে ছিল তারাও।

৪১. এ বিষয়টি ইদানীং নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। চৌধুরী (১৯৬৯) ও (১৯৭৬), ইসলাম (১৯৭৮, ২, ৩ এবং উপসংহার)।

৪২. এই জ্বর কোন্ জায়গায় কতটা ছড়িয়েছিল এবং তার প্রভাব কৃষিজগতে কতখানি পড়েছিল, তার জন্য দ্রষ্টব্য চৌধুরী (১৯৬৯, ১৫৩-৬৬), এ বিষয়ে আদমসুমারির তথ্য নিচে দেওয়া হল।

জেলা	পার্থক্যের পরিমাপ ১৮৮১-৯১	শতাংশ ১৮৭২-৮১
বর্ধমান	-৬.২০	
বীরভূম	-৬.৯৫	-০.১
বাঁকুড়া	+৭.৫৫	+০.৬
মেদিনীপুর	-১.০৭	+২.৭
হুগলি	-১২.৪৯	+৪.৪
নদিয়া	+১১.৩১	+৬.০
যশোর	+৮.৬৬	-১.১
খুলনা	+৩.১৫	-৬.১
মুর্শিদাবাদ	+১.০৪	+৮.৪
দিনাজপুর	+০.৪২	+১.৯
রাজশাহী	+২.১৪	+২.৭
রংপুর	-২.৫৮	-১.২
বেগেড়া	+৬.৫১	-১.৬
পাবনা	+৮.২৬	+১১.২
		+৩.৯

সূত্র: *বেঙ্গল সেন্সাস রিপোর্ট* ১৮৮১, ভল্যুম ২, টেবিল ২; *সেন্সাস অফ ইণ্ডিয়া*, ১৮৯১, ভল্যুম-৩, পৃ. ৪৬-৪৭।

৪৩. সম্প্রতিকালের গবেষণা থেকে জানা যায়, যে সব সমাজকে কৃষি-সমাজ বলা হয়, তাতে বড় সংখ্যায় ক্ষেত মজুরের দল ছিল। ইউরোপের মধ্যযুগের সভ্যতার সঙ্গে এর তুলনা চলে। হিলটন (১৯৭৫, ২য় অধ্যায়)।

৪৪. ইউরোপ ছাড়া আর অন্য দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের পড়তির কারণে বাংলায় রূপোর আমদানি কমে যেতে থাকে, একই সঙ্গে রূপোর চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। দ্বিতীয় ঘটনাটাই এই সময়ে রূপোর সংকটের জন্য প্রধানত দায়ী। চৌধুরী 'এগ্রিকালচারাল প্রাইসেস ইন বেঙ্গল, ১৭৫৭-১৮৬০' (অপ্রকাশিত)।

৪৫. এ সময়ে খাজনা 'অসহনীয় বোঝা' জেনেও সরকার কঠোর হাতে তা আদায় করতে সচেষ্ট হয়। চৌধুরী (১৯৭৬, পৃ. ২৯৮-৯৯)।

৪৬. এই প্রবন্ধে ২য় ভাগ দ্রষ্টব্য।

৪৭. এর বিপরীত ছবি আসামে দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে পাশের পূর্ববাংলা থেকে মজুর এসে-ছিল ক্রমাগত। বিংশ শতাব্দর শুরু থেকে আসামে যে অভূতপূর্ব চাষ বেড়েছিল, তা শুধু

মাত্র উপরোক্ত কারণে নয়। এর প্রধান কারণ হল, এই মজুররা চাষ বাস, পতিত জমি উদ্ধার ও পাট জাতীয় অর্থকরী ফসল উৎপাদনে বিশেষ পারদর্শী ছিল।

৪৮. উত্তরবঙ্গের বারিন্দ অঞ্চলে দিনাজপুরের সরকারি জমির ব্যবস্থাপক সাঁওতালদের পতিত জমি উদ্ধারের কাজে লাগিয়ে উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন। পরে স্থানীয় জমিদাররাও তা অনুসরণ করে।

৪৯. আইনত তিনটি কারণে জমিদার খাজনা বাড়াতে পারত। এক, যদি উৎপাদন বাড়ত; দুই, ফসলের দাম বাড়ত; এবং তিন, যদি পাশের অঞ্চলগুলোয় খাজনার হার বেশি হত। যে জমিদার খাজনা বাড়াতে ইচ্ছুক তাকে দেখতে হত, এর কোন কারণটি তার জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৫০. আধুনিক মতবাদের জন্য দ্রষ্টব্য — ইসলাম (১৯৭৮, পৃ. ১৫৮-৫৯); রে (১৯৭৩, পৃ. ২৭৭-৭৯)।

৫১. ১৭৬০ থেকে ১৮১৪ সময়কালে ইংল্যাণ্ডে এনক্লোজার মুভমেন্টের উপর কৃষি পণ্যের দাম বৃদ্ধির প্রভাব নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে, তাতে কৃষিপণ্যের দামের ওঠানামাকে কৃষি দ্রব্যের চাহিদা পরিবর্তনের অন্যতম মাপকাঠি ধরা হয়েছে।

৫২. যে সব সমালোচক জমিদারদের পরগাছা মনে করেন, তারা এদের তৎপরতা সম্বন্ধে সব সময় সঠিক ধারণা পোষণ করেন না। ছোট জমির মালিকের অনেক সময়ই দেবার মত বিশেষ সঙ্গতি থাকত না। বিহারের বেশির ভাগ ছোট জমিদারই আজন্মকাল ঠিকাদারের কাছে ঋণী থাকত। এই ঠিকাদারদের এরা অনেক সময়ই নিজেদের জমিদারির অংশ বিশেষ সাময়িক স্বত্বে দিয়ে রাখত। জমিদারের আর্থিক দুর্গতির নানা কারণ ছিল। তার আয়ের তুলনায় পোষ্য অনেক বেড়ে গিয়েছিল। খাজনা থেকে তার যা আয় হত, তার তুলনায় জিনিষের দাম অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এসবের উপর প্রায় সময় জমিদারি বা সম্পত্তি ভাগ হয়ে যেত, যার ফলে জমিদারির মোট খরচ বেড়ে গিয়েছিল।

৫৩. সেখানে ফসলে খাজনা দেওয়া বিরোধের আসল কারণ ছিল না, সেখানে জমিদার চেষ্টা করত, চাষী যাতে নিজের অধিকার বিস্তার করতে না পারে। এমনও দেখা গিয়াছে, তারা অন্য অবস্থাপন্ন চাষীদের কৃষিতে বিনিয়োগ করতে নিরুৎসাহ করেছে। তাদের পুকুর কাটতে কিম্বা গাছ লাগাতে বারণ করেছে। এই ভয়ে যে, এতে চাষীদের জোর আরো বেড়ে যাবে। জমিদারদের এই মনোভাবের ফলে চাষীদের অবস্থা অনেক সময়ই সংকটাপন্ন হয়ে পড়ত। বিহারের অনেক জায়গায়ই দেখা গিয়েছে, জমিদার সাফল্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে যে, ভোগ দখল স্বত্ব বলে চাষীদের আইনত কোন অধিকারই ছিল না। মহাজন এর ফলে চাষীর জমি বন্ধক রেখে অনেক সময়ই ধার দিতে চাইত না।

৫৪. 'সেট্লমেন্ট' বলতে প্রচলিত খাজনা বাড়াবার আগে যে সরকারি সমীক্ষা হত তা বোঝাত। এই সমীক্ষায় দেখা হত কি পরিবেশে চাষ কতটা বেড়েছিল এবং ফসলের দাম কি অনুপাতে বেড়েছিল।

৫৫. ১৯৪৭-এ গোপনীয় সরকারি তদন্ত চালান হয়, তার অপ্রকাশিত প্রতিবেদন— "তেভাগা আন্দোলনে বর্গাদার ও জোতদারের সম্পর্ক।" এই তদন্তের প্রতিবেদন বহুল প্রচারিত। এতে প্রকাশিত হয়েছে, ভাগচাষের ব্যাপারে স্থানীয় কি রীতিনীতি ছিল, তেভাগা আন্দোলন কারা পরিচালনা করেছিল, কারা এতে নেতৃত্ব দিয়েছিল। যারা আন্দোলন করেছিল, তারা ভাগচাষ প্রথা তুলে দেওয়ার বিপক্ষে ছিল না। তারা চেয়েছিল আধিয়াররা অর্ধেকের জায়গায় এক-তৃতীয়াংশ উৎপন্ন জমির মালিককে দেবে।

৫৬. উপরোক্ত; রিপোর্ট ফ্রম দি সাব-ডিভিশনাল অফিসার, কুষ্টিয়া (৭মার্চ, ১৯৪৭)।

৫৭. উপরোক্ত; রিপোর্ট ফ্রম দি সাব-ডিভিশনাল অফিসার, শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ, ১৯৪৭।

৫৮. উপরোক্ত; রিপোর্ট ফ্রম দি ডেপুটি কমিশনার, জলপাইগুড়ি, ১১ মার্চ, ১৯৪৭।

৫৯. উপরোক্ত; রিপোর্ট ফ্রম দি সাব-ডিভিশাল অফিসার, সদর দিনাজপুর, ৮ মার্চ, ১৯৪৭।

৬০. উপরোক্ত; রিপোর্ট ফ্রম দি ডেপটি কমিশনার জলপাইগুড়ি, ১১ মার্চ, ১৯৪৭।

৬১. উপরোক্ত; রিপোর্ট ফ্রম দি সাব-ডিভিশনাল অফিসার, বাগেরহাট, ৭ মার্চ, ১৯৪৭।

৬২. উপরোক্ত; রিপোর্ট ফ্রম দি সাব-ডিভিশনাল অফিসার কাটোয়া, ৮ মার্চ, ১৯৪৭।

৬৩. উপরোক্ত; রিপোর্ট ফ্রম দি সাব-ডিভিশনাল অফিসার, ঠাকুরগাঁও, ১০ মার্চ, ১৯৪৭।

৬৪. উপরোক্ত; রিপোর্ট ফ্রম দি সাব-ডিভিশনাল অফিসার, খুলনা সদর ১০ মার্চ, ১৯৪৭।

৬৫. মিরদাল (১৯৬৮, ১০৬৫-৬৬)।

৬৬. এই সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য দ্রষ্টব্য বি বি চৌধুরী (১৯৭৫, বিভাগ ৩ ঘ)।

৬৭. সমবায় সংস্থাগুলির রেজিস্ট্রারকে যে স্থানীয় প্রতিবেদনগুলি পাঠান হত, বাংলা সরকার তা ১৯২৮-এ "মার্কেটিং অফ এগ্রিকালচারাল প্রডিউস ইন বেঙ্গল"— এই শিরোনামে প্রকাশিত করে। এই প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করে বাংলার ধান ও পাটের ব্যবসার আলোচনা করেছেন সৌগত মুখার্জী, *কলোনিয়াল ফ্রেমওয়ার্ক ফর এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং ইন ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া: রাইস অ্যাণ্ড জুট ইন বেঙ্গল, ১৯০০-১৯২১, ট্রেড প্রডাকশন, কনজাম্পশন অ্যাণ্ড প্রাইসেস* গ্রন্থের ১ম অধ্যায়।

৬৮. জর্জ ব্লিন (১৯৬৬), *এগ্রিকালচারাল ট্রেণ্ডস্ ইন ইণ্ডিয়া, ১৮৯১-১৯০৭* (ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভানিয়া প্রেস, ফিলাডেলফিয়া) পৃ. ১২৮; ইসলাম ১৯২০ থেকে ১৯৪৬-এর মধ্যে বাংলার কৃষি জগতে কীভাবে পুঁজি এসেছিল সে সম্বন্ধে বলেছেন, "অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থায় পুঁজি সংগঠন এমন ভাবে হয়েছিল যাতে মোট খেতের আয়তন ও পরিণাম বৃদ্ধি পায়। এবং নতুন এলাকায় চাষ বৃদ্ধির যদি সুযোগ না থাকত, তাহলে বছরে দু'বার ফসল দিতে পারে এমন জমি বাড়াবার চেষ্টা করা হত (ইসলাম, ১৯৭৮, অধ্যায় ৫, পৃ. ১৫৬। আরো দ্রষ্টব্য পৃ. ২০২)। প্রথাগত উপায়ে বাড়তি ফসল যা পাওয়া যেত, তা নিতান্তই সামান্য, তখনকার কৃষি ব্যবস্থায় যথেষ্ট বিনিয়োগ হয়নি এটা মূল সমস্যা নয়। মূল সমস্যা ছিল প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অভাব।

৬৯. ভাদুড়ী বলেছেন, "মহাজনী কারবার শোষণের একটা প্রধান উপায় ছিল, কারণ বেঁচে থাকার

জন্য চাষীকে সর্বদা ধার করতে হত। এই ব্যবসা চালু থাকার অর্থ হল চাষীদের খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য যে পরিমান ধানের প্রয়োজন, সব সময়ই যাতে তার থেকে কম পরিমাণ তাদের হাতে থাকে তাই দেখা। প্রযুক্তির উন্নয়ন হলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে— এমনটা ভূস্বামীরা কখনই চাইত না। বরং খাওয়ার জন্য যাতে কর্জ নিতে না হয়, তা বিবেচনা করে মালিক চাষীদের চালের পরিমাণ বাড়িয়ে দিত। তা না হলে যে আধা-সামন্ততন্ত্র চলে আসছে, তাতে বাধার সৃষ্টি হত। কারণ, কৃষানদের ঋণ জালে চিরকালের জন্য বেধে ফেলে ভূস্বামী তার আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বজায় রাখত।

৭০. ব্লিন লক্ষ্য করেছেন, (পৃ. ১২৯), তথ্যের এই অংশটি একটু পরীক্ষা করে দেখা উচিত। বাংলা বিহার ও উড়িষ্যায় একর প্রতি কতটা পরিবর্তন হয়েছিল, তা যদি মিলিয়ে দেখা হয়, তাহলে এই বক্তব্যের জোর বাড়ে।

৭১. ওয়াশব্রুক সম্প্রতি দেখিয়েছেন, ব্রিটিশ আইন ও সংস্থাগুলি ছোট চাষীর উৎপাদন ক্ষমতা রক্ষা করতে গিয়ে কিভাবে কৃষিতে বিনিয়োগের উদ্যোগকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তিনি বলেছেন, ভারতের সামান্য পুঁজিবাদী রূপান্তর সম্পর্কে উপনিবেশিক রাষ্ট্রের কোন সুনিশ্চিত মনোভাব ছিল না। ব্রিটিশরাজ যে আইনি ও রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, বাজারের নিয়ন্ত্রক শক্তি কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে ও পুঁজির অনুপ্রবেশের পথে তা বাধা সৃষ্টি করেছিল। এই পরিবেশ যে বাজারি সম্পর্কগুলিকে নষ্ট করে দিচ্ছিল বা ক্ষুদ্র কৃষি পণ্য উৎপাদনে পুঁজি বিনিয়োগের পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল, তা নয়, তবে উন্নয়নের সামাজিক সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিল। উৎপাদনের উপর পুঁজির নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করতে পারে নি এবং যে সব সামাজিক গোষ্ঠী বাজারের চাহিদাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করত, তাদের অনেক সুযোগ করে দিয়েছিল পুঞ্জীভূত মূলধন, তা সে রাজস্ব থেকে বা একচেটিয়া ব্যবসা থেকে, যেখান থেকেই সংগৃহীত হোক, অথবা বাইরে থেকে আমদানি করে হোক, কৃষি উৎপাদনে অনুপ্রবেশের এবং নিয়ন্ত্রনের পথে যে সব বাধার সম্মুখীন হয়েছিল, তার থেকেই এই সমস্যার চেহারা স্পষ্ট বোঝা যায়। এক্ষেত্রে পুঁজির নিয়ন্ত্রন বলতে অবশ্য বোঝাচ্ছে চাষীকে ভূমিচ্যুত করার ক্ষমতা। কিন্তু আইনে এমন পক্ষপাত ও ফাঁকফোকর ছিল এবং ডিক্রি পেলেও তা বলবৎ করা যেতে না বলে চাষীকে ভূমিচ্যুত করা, বিশেষ করে অকৃষি সম্প্রদায়ভুক্ত কারও পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। পুঁজির দিক থেকে এই অক্ষমতা বাজারে প্রতিযোগিতার সম্ভাবনাকে এবং কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিনিয়োগের সম্ভাবনাকে প্রতিহত করেছিল। জমিদাররা যদি প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে নির্দ্ধারিত খাজনা দাবি করতে না পারে, তা হলে চাষী কেন তার উৎপাদন বাড়াতে চাইবে? আবার, জমিদার যদি তার প্রজার জমি অধিগ্রহণ করতে না পারে, তাহলে কেন সে জমির উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ করবে? (১৯৮১, ৬৭৬-৭৮)।

২

জোতদারদের পশ্চাদপসারণ

রজত কান্ত রায়

আলোচনাটি পশ্চিম বাংলায় সি.পি.আই (এম)-এর তৎপরতায় বর্গা নথিভুক্ত করার ফলে জোতদারদের তথাকথিত 'অবনতির' বিষয়ে নয়। বলা হয়ে থাকে জোতদারদের পশ্চাদপসারণ নাকি প্রমাণিত। [সত্যিই কি তাই? সি.পি.আই (এম) অধিকৃত পঞ্চায়েতের নতুন গ্রামীণ ক্ষমতা গোষ্ঠী কারা?] আলোচনার প্রসঙ্গ অবিভক্ত বাংলার গ্রামীণ রাজনীতিতে জোতদারদের গুরুত্ব, অথবা গুরুত্বহীনতা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের বিতর্ক। দুটি প্রবন্ধ আলোচিত হবে।[১] লেখা দুটির মধ্যে আসমান জমিন পার্থক্য সত্ত্বেও, দুটি লেখাতেই, পনের বছর আগে রত্নলেখা রায় ও আমার লেখা প্রাক্ ঔপনিবেশিক বাংলায় সামাজিক গঠন এবং ব্রিটিশ শাসনে গ্রামীণ রাজনীতির বিকাশে[২] জোতদারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সংক্রান্ত বক্তব্যের ত্রুটি খোঁজা হয়েছে। আমাদের বক্তব্য শুধু বর্তমানে আলোচ্য সুগত বসু এবং আকিনবু কাওয়াই-এর প্রবন্ধেই নয়, পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও ওঙ্কার গোস্বামীর সাম্প্রতিক রচনাতেও সমালোচিত হয়েছে।[৩]

এই বিতর্ক কয়েকটি অবস্থানকে চিহ্নিত করেছে: (১) রায় ও রায়— ব্রিটিশদের ক্ষমতা অধিগ্রহণের আগে থেকেই জোতদাররা ছিল ধনী কৃষক শ্রেণী, বাংলায় জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক আন্দোলনে তাদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। (২) কাওয়াই— ব্রিটিশ শাসনে জোতদারদের আক্রমণের ফলে জমিদারদের অবস্থার অবনতি হয়েছিল, রায়দের এই প্রস্তাব সঠিক নয়। কারণ, গ্রামাঞ্চলে জোতদারদের চেয়ে জমিদাররাই বেশি ক্ষমতাবান ছিল। ১৯৩০-এর দশকে তাদের পতনের কারণ, ব্রিটিশ শাসনকালে জোতদারদের উত্থান নয়, অন্য কিছু। (৩) বসু— ব্রিটিশ শাসনের আগে থেকেই সীমান্ত বাংলায় জোতদাররা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ব্রিটিশ শাসন কালেও তাদের সেই অবস্থান থেকে গিয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তাদের সেই অবস্থান ছিল না। সেখানে জমিদাররা খামারের এক বড় অংশ বেগার শ্রমিক দিয়ে চাষ করাত। পূর্ববঙ্গে একই অবস্থা ছিল। সেখানে মোটামুটিভাবে সমতাবাদী ও স্ব-কৃষিতে নিযুক্ত কৃষকদের ধনী চাষী, ও দরিদ্র চাষীতে বিভাজন করা সম্ভব ছিল না। (৪) গোস্বামী (এর অবস্থান চ্যাটার্জীও কিছুটা সমর্থন করেন)— মহাজন ও জমিদারদের দুর্বলতার সুযোগে শুধু ১৯৩০-এর দশকেই জোতদাররা গ্রামাঞ্চলে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল। (চ্যাটার্জী অন্যদিকে বসুর মতই জোর দিয়েছেন পূর্ববঙ্গের অতিমন্দার আগে সমৃদ্ধ ও সমতাবাদী মুসলমান

কৃষক শ্রেণীর সমপ্রকৃতির উপর। একই সঙ্গে তিনি জোর আরোপ করেছেন যে, কম সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গে এমন কি মন্দারও আগে কৃষক শ্রেণী বিভক্ত দরিদ্র ও অসংহত হয়ে পড়েছিল। কাওয়াই, চ্যাটার্জী এবং গোস্বামী সবাই-ই অতিমন্দার ১৯৩০-এর দশককে গ্রামীণ বাংলার ইতিহাসে সন্ধিক্ষণ হিসেবে দেখিয়েছেন। তখন কৃষি সমাজের শ্রেণী বিন্যাসে বিস্তর পরিবর্তন হয়েছিল।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের পরে জমিদারদের ক্ষমতা কমে গিয়েছিল কিনা এই প্রশ্নটি আগে বিবেচনা করা যাক। রত্নলেখা রায় ও আমার আগের যুক্তি অনুযায়ী এই আইন জমিদারদের বিরুদ্ধে জোতদারদের শক্তিশালী করে তুলেছিল। কাওয়াই এই যুক্তির প্রতিবাদ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্-এর অধীন চারটি বড় জমিদারির কার্য-নির্বাহ দেখেছেন (তিনি সেই সরকারের ওয়ার্ড্স্ ব্রাঞ্চের ভূমি রাজস্বের নথিপত্র ব্যবহার করেছেন) : বর্ধমানরাজ জমিদারি (১৮৮৫ থেকে ১৯০২ এবং ১৯২৯ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত কোর্ট অফ ওয়ার্ডস-এর অধীন), কাশিমবাজার রাজ জমিদারি ১৯২৯ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত কোর্ট অফ ওয়ার্ড-এর অধীন), সৈয়দপুর অছি জমিদারি (১৮১৮ থেকে সরকারি পরিচালনাধীন) এবং এ.এন. রায় জমিদারি (১৮৮০ থেকে ১৮৯৭ এবং ১৯০৬ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত কোর্ট অফ ওয়ার্ড এর অধীন)। যে বিতর্কিত প্রশ্নটি কাওয়াই উত্থাপন করেছেন, তা হল এই জমিদারিগুলি কতটা রাজস্ব আদায় করতে পারত। তিনি দেখিয়েছেন, এই চারটি জমিদারিই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এবং তার পরেও ভালোভাবে চলেছিল এবং একমাত্র অতি মন্দার সময়েই খাজনা থেকে এদের আয় যথেষ্ট কমে গিয়েছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, শস্যহানি এবং পাটের সাময়িক মূল্য হ্রাস প্রাক-যুদ্ধ পর্বের কয়েকটা বছরে খাজনা আদায়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। স্বাভাবিক বছরগুলিতে প্রায় চাহিদানুযায়ীই খাজনা আদায় হত এবং অতি মন্দার আগে খাজনা থেকে আয়ের দীর্ঘস্থায়ী হ্রাস ঘটেনি। জোতদারদের প্রতিরোধকেও খাজনা বাবদ আয় কমে যাওয়ার কারণ বলা যায় না। ১৯৩০-এর দশকেই একমাত্র রাজস্ব আয়ে ঘাটতি হয়েছিল এবং তার কারণ ছিল সার্বিক আর্থনীতিক সংকট, জোতদারদের ক্রমবর্দ্ধমান ক্ষমতা নয়।

আকিনবু কাওয়াই কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ এর নথিপত্র দেখেছেন, তবে আদত জমিদারির কাগজ (অর্থাৎ জমিদারদের পরিচালনাধীন জমির নথিপত্র) নয়। বাংলার কৃষি ঐতিহাসিকদের মধ্যে একমাত্র রত্নলেখা রায়ই অন্ততঃ চারটি জমিদারির নথিপত্র দেখেছিলেন। সুরুল জমিদারির কাগজপত্র (পুরনো বাংলায়), ঝামাপুকুর জমিদারির নথিপত্র (রাজা দিগম্বর মিত্রের জমিদারি), পোনাবালিয়া রায় চৌধুরীদের নথিপত্র (লেখিকার পিতামহের এজমালি জমিদারি) এবং মহেশগঞ্জের পাল চৌধুরীদের জমিদারির কাগজপত্র (এই নথিপত্রই তিনি সব শেষ দেখেছিলেন)। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত নদীয়া জেলার মহেশ গঞ্জের পালচৌধুরীদের ইতিহাস কাওয়াই এর কয়েকটি পর্যবেক্ষণকে সমর্থন করেছে। পাল চৌধুরীদের জমিদারি (এবং আমার মতে সুরুল জমিদারিও, তবে বাখরগঞ্জের পোনাবালিয়া জমিদারি নয়) অতিমন্দার

সময়কাল পর্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কার্যকর ব্যবস্থায় খাজনা সংগ্রহ করত, কিন্তু পরবর্তীকালে বিশ শতকের তিনের ও চারের দশকে কৃষি অর্থনীতিতে ভাঙনের ফলে তা সম্ভব হত না।[4] আগে ছোট জমিদারদের ক্ষুদ্র এজমালি জমিদারিগুলি (যেমন, পোনাবালিয়ার রায় চৌধুরীরা) কৃষকদের কাছ থেকে পুরো খাজনা আদায় করতে বেশ অসুবিধায় পড়ত। বড় ও দক্ষ জমিদারিগুলির ক্ষেত্রে এটা হত না। এই শতকের প্রথম থেকেই তাদের অবস্থার পতন শুরু হয়েছিল। বড় এবং তৎপর জমিদাররা বড় জোতদারদের সংগঠিত এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ মোকাবিলা করতে বাধ্য হয়। যেমন কাশিমবাজার জমিদারির সঙ্গে 'বাহারবন্দ' জোতদারদের বিবাদ সেই আঠার শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের চার দশক পর্যন্ত চলেছিল।[5] মোটের উপর অতিমন্দা শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত বাংলার জমিদাররা, বিশেষতঃ বড় জমিদাররা, জমিতে ক্ষমতাশালী ছিল।[6]

এবার জোতদারদের বিষয়ে নজর দেওয়া যাক। এ বিষয়ে উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর ও রংপুর জেলার ক্ষেত্রে বুকানন হ্যামিলটনের দেওয়া উদাহরণগুলি খুবই স্পষ্ট। সেখানে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পর্যবেক্ষণের সময়, জোতদার ও ভাগচাষীর (আধিয়ার) মধ্যে তিনি শোষণের সম্পর্ক দেখতে পেয়েছিলেন। এই সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সুগত বসু আমাদের সঙ্গে একমত যে, এই অঞ্চলে প্রাক ঔপনিবেশিক যুগ থেকেই কৃষি-সমাজ ব্যবস্থায় জোতদাররা ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী।[7] প্রজাস্বত্ব আইন (বিশেষ করে ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন) জোতদারদের কতকগুলি সুবিধা দিয়েছিল এবং উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জায়গায় জোতদার-আধিয়ার সম্পর্ক কৃষি ব্যবস্থার মুখ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[8] বসুর মতে, এই ব্যবস্থা উত্তরবঙ্গের নিজস্ব বিষয়। এই সীমান্ত অঞ্চলে ধনী জোতদাররা বড় বড় জমি চাষের আওতায় এনেছিল। (সুন্দরবনেও বড় জোতদাররা ছিল গুরুত্বপূর্ণ)। পশ্চিমবঙ্গের আবাদ অঞ্চলে জমিদাররা নিজেদের চাষের আওতায় জমির এক বড় অংশ রাখত।[9] পূর্ববঙ্গেও উন্নত এলাকাগুলিতে সাধারণতঃ কৃষকরা ছিল অবস্থাপন্ন।

কিন্তু এই অবস্থাটা কি সর্বাংশে সত্য? ধরে নেওয়া যায় যে, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আমরা পুরো বাংলায় জোতদারদের ক্ষমতা সম্পর্কে অতিশয়োক্তি করছি। কিন্তু আমার মতে বসু বিপরীত দিকে অনেক বেশি ঝুঁকেছেন। আমি মনে করিনা যে শুধুমাত্র বিশ শতকের তিনের দশকে মন্দার ফলে বাংলায় জোতদাররা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল (যেমন ওঙ্কার গোস্বামী মনে করেন), যদিও এটা গ্রহণ করতে আমার আপত্তি নেই যে, এই শতকের তিনের ও চারের দশকে জোতদাররা গ্রামাঞ্চলে প্রাধান্য পাচ্ছিল। পর্যবেক্ষকরা পুরো উনিশ শতক জুড়ে, এমনকি আঠার শতকেও তাদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন, যদিও এটা স্পষ্ট যে, বুকানন হ্যামিলটন (আরও এক শতক বাদে, ওর পরে এস.ও.বেল ও এ.সি.হার্টলে) উত্তরবঙ্গে যে সব বড় জোতদারদের দেখেছেন, এই প্রদেশে আর কোথাও অন্তত সেই রকমের জোতদার দেখতে পাওয়া যায় না।

পর্যবেক্ষকদের মধ্যে অগ্রণী স্যার জন শোর (১৭৮৯) এবং এইচ. টি. কোলব্রুক (১৭৯৪)।

এদের মন্তব্য শুধুমাত্র উত্তরের জেলাগুলি নয়, পুরো বাংলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিশেষ করে, কোলব্রুক এক শ্রেণীর কৃষি মধ্যস্বত্বভোগী বা 'মধ্যস্বত্বপ্রজার' অস্তিত্ব গোটা বাংলা জুড়ে লক্ষ্য করেছেন। এমন কি তারও আগে রাজশাহীর কালেকটর পিটার স্পিক তার জেলায় (একটি কেন্দ্রীয় জেলা যা আদপেই বাংলার উত্তর সীমান্তের জেলা নয়) লক্ষ্য করেছেন (১৮৮৭) যে, সম্পত্তির অধিকারী এক শ্রেণীর প্রজা জমির বড় অংশ ইজারা দিত এবং ভাড়াটে মজুরদের দিয়ে চাষ করাত।[10] কোলব্রুকের মতে এই 'মধ্যস্বত্বশ্রেণী'র সংখ্যা ছিল অনেক। যেখানেই মধ্যস্বত্ব প্রজা ব্যবস্থা ছিল, সেখানেই ভাগচাষে নিযুক্ত কৃষকরা ছিল অত্যন্ত দরিদ্র। 'ছোট প্রজারা ফসলের মাধ্যমে প্রচুর খাজনা দিত। গবাদি পশু, শস্য, বীজ ও জীবন ধারণের প্রয়োজনে নেওয়া ঋণ ও তার সুদের টাকা কখনই তারা শোধ করতে পারত না।'[11] পরবর্তীকালে, ১৮২৮ সালে যশোহরের (মধ্য বাংলা) নীলকররা বড় কৃষকদের অস্তিত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করেছে যে, এরা পুরনো এবং সুবিধাজনক ইজারাগুলি দখল করেছিল এবং জমিদারদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখত। কিন্তু এরাই আবার ছোট চাষীদের দমন করার জন্য জমিদারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। অন্যত্র, ঠিক উত্তরের সীমান্ত এলাকায় নয়, ১৭৯৩ থেকে জোতদাররা জমিদারদের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ শুরু করেছিল, এবং শেষ পর্যন্ত ১৯২৮-এ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনীর মাধ্যমে তাদের দাবি আদায়ে সমর্থ হয়েছিল। এরা ছিল ঠাকুর পরিবারের পাতিলাদহ জমিদারির মুসলমান জোতদার (উনিশ শতকের এই জমিদারি মৈমন সিংহ থেকে রংপুর জেলায় এসেছিল)। পাতিলাদহের জোতদাররা ৫০ একর জমি অধিকার করেছিল এবং সাধারণত ভাগচাষীদের দিয়ে চাষ করাত।[12]

এবার রাঢ় (পশ্চিমবঙ্গ) এবং বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ)-এর কেন্দ্রভূমির শক্তিশালী কৃষকদের উদাহরণের জন্য জমিদারি নথিপত্রের দিকে নজর দেওয়া যাক। সুরুল জমিদারি নথিপত্রে মহম্মদ আকমল নামে এক ক্ষমতাবান কৃষকের উল্লেখ আছে, যার অধীনে ন'জন মুসলমান চাষী কাজ করত। তাদের বীরভূম জেলায় সুরুল জমিদারির নতুন কেনা জমিতে জোর করে বসিয়েছিল। আকমল সফলভাবে চার বছর (১৮০৭-১১) সুরুল জমিদারের খাজনা দেওয়া বন্ধ রেখেছিল।[13] পরবর্তী সময়ের পোনাবালিয়া জমিদারির নথিপত্র এবং আরও অন্যান্য বিবরণ থেকে প্রকাশিত হয় যে, বাখরগঞ্জের যথেষ্ট সুরক্ষিত মুসলমান কৃষকরা ছোট ছোট হিন্দু তালুকদারদের অধীনে হাওলাদার, ওসাত হাওলাদার বা নিম হাওলাদার প্রভৃতি সুবিধাভোগী স্বত্বের অধিকারী ছিলেন।

একই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যশোহরের গাঁটিদাররা। তারাও ছিল সুবিধাভোগী কৃষক। বসু দেখিয়েছেন, হাওলাদার ও গাঁটিদাররা যেমন উত্তরবঙ্গের বড় জোতদারদের সঙ্গে তুলনীয় নয়, তেমনি পূর্ববঙ্গে ভাগচাষও এত ব্যাপক ছিল না। সুবিধাভোগী অধিকারী কৃষকরা অবশ্যই সাধারণ কৃষকদের থেকে এক ধাপ উপরে ছিল। মধ্য ও পূর্ববঙ্গে গাঁটি ও হাওলার অধিকারী মুসলমান বা মেদিনীপুর জেলার তমলুক ও কাঁথির চক অধিকারী মাহিষ্য গ্রামবাসীদের পক্ষে

জমি চাষের জন্য নিজেদের সম্প্রদায়ের ভাগচাষী বা মজুর নিয়োগ অস্বাভাবিক ছিল না। বসু দেখিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র মাহিষ্য কৃষকদের মধ্যে এটি ক্রমে রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল। বিশেষত, হাওড়া ও হুগলি জেলায় অস্পৃশ্য বাউড়ি ও বাগ্দী মজুরদের নিজেদের জমিতে নিয়োগ তাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। বীরভূমে বিশ শতকের গোড়ায় ধনী সদ্গোপ কৃষকদের প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে জানা যায়, তারাও বাগ্দী ও বাউড়ি শ্রমিক নিয়োগে অভ্যস্ত ছিল। দিনাজপুর ও চট্টগ্রাম জেলাতেই একদা কর্মরত এক ইংরেজ কর্মচারী জোর দিয়ে বলেছেন, "এই জেলাতেই অসংখ্য অবস্থাপন্ন কৃষক ছিল। এরা নিজেদের গ্রাম ও একেবারে নিকটবর্তী এলাকায় যথেষ্ট প্রভাবশালী তো ছিলই, জমিদারদের তুলনায় তাদের অবস্থাও সচ্ছল ছিল।" এই পর্যবেক্ষণ ১৮৭৫ সালের এবং লক্ষ্যনীয় যে, দুই জেলা বাংলার দুই প্রান্তে অবস্থিত। পরিশেষে আমরা জনৈক লেখকের *বেঙ্গল ভিলেজ বায়োগ্রাফিস্*-এ প্রকাশিত কৌতুহলোদ্দীপক তথ্য নিয়ে আলোচনা করব। লেখক মধ্য বঙ্গের যশোহর জেলার দুটি গ্রাম সমীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তিনি পুরো বাংলা সম্পর্কেই তার ১৮৫৮ সালের নিবন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। তার পাশের এলাকাগুলির ধনী গ্রামবাসীরা গাঁটিদার নামে পরিচিত ছিল। তিনি আলোচনা করেছেন যে, এ সব লোকদের স্থানীয় নামটা কি ছিল সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই রকম বহু আঞ্চলিক নাম সর্বত্র পাওয়া যায়। তার মতে আসল কাজ হল, এইরকম বহুবিধ নাম করণের পিছনে যে সাধারণ বিষয়টি লুকিয়ে আছে সেটা টেনে বের করা। যে নামেই পরিচিত হোক না কেন,[14] এই সব লোকেরাই আসল গ্রাম-নিয়ন্ত্রক। দুর্বল জমিদাররা এদের বিরুদ্ধে কখনই দাঁড়াতে পারত না। কৃষকরা বাঁশ লাঠি বর্শা নিয়ে এদের সাহায্যে এগিয়ে আসত। তাদের খাজনার হার মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট ছিল এবং ইচ্ছেমত বাড়ান যেত না। নিজেদের জমি স্বত্বভোগী ও ভাগচাষীদের ইজারা দেওয়া ছাড়াও, বাস্তুভিটা চষ করাত ভাড়াটে মজুর দিয়ে। শুধু সমীক্ষা করা দুটি গ্রাম নয়, পুরো বাংলাকে মাথায় রেখে লেখক ক্যালকাটা রিভিউ-এর পাঠকদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে,

> প্রথমত: জমিদার বা তালুকদার যারা একটি গ্রাম, ছ'টি গ্রাম অথবা পুরো পরগণা থেকে খাজনা আদায় করে সরকারকে রাজস্ব দেয়; তারপর সম্পন্ন ছোট ভূম্যধিকারী, তাদের যে উপাধিই থাকুক না কেন, যারা দৃশ্যতঃ মধ্যস্বত্বভোগী এবং একটি গ্রামের অর্দ্ধাংশ বা এক-চতুর্থাংশ অথবা এক-অষ্টমাংশের মালিক; তারও পরের স্তরে রয়েছে যে কোনও কৃষক, যার ভূমি স্বত্বাধিকার রয়েছে এবং পদমর্যাদা ছাড়া উপরোক্ত ছোট ভূমধ্যকারীদের থেকে অন্য বিষয়ে খুব আলাদা নয়; সব শেষে আছে সেই শ্রেণীর মানুষ যারা, বিনা স্বত্বে জমি ভোগ দখল করে, সাময়িক অথবা চিরস্থায়ী স্বত্বে জমি ইজারা নেয় এবং কোন সুনির্দিষ্ট অধিকার ছাড়াই কৃষি কাজ চালিয়ে যায়। যদিও সহজেই এদের অধিকার নির্দিষ্ট করা যায় সারা দেশ জুড়েই।[15]

আমার মতে এটাই যথাযথ বিবরণ এবং লেখক সঠিক বলেছেন যে, গ্রামগুলিতে জমিদারের বিরুদ্ধে একদল শক্তিশালী লোক ছিল যারা দিন মজুর অথবা কৃষকের থেকে উন্নত। *বেঙ্গল*

ভিলেজ বায়োগ্রাফিস্ -এর লেখক মন্তব্য করেছেন যে "সকলেই তখনও একই স্তরের ক্ষমতায় স্থিত হয়নি।" তার এই পর্যবেক্ষণ অবহেলা করা যায় না। সুগত বসু, যিনি বাংলার জটিলতা সম্পর্কে সচেতন, তিনিও উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ বা গাঙ্গেয় বঙ্গে গ্রাম জীবনে স্তর ভেদের বিষয়টি এড়িয়ে যান নি। পূর্ববঙ্গের ক্ষেত্রে পার্থ চ্যাটার্জী এবং সুগত বসু প্রমাণ করেছেন যে, সেখানে স্বত্বভোগী কৃষক যারা নিজেদের জমি নিজেরাই চাষ করে, তারাই সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ। পার্থ চ্যাটার্জী সেটলমেন্ট রিপোর্ট এবং বেঙ্গল ল্যাণ্ড রেভিনিউ কমিশন রিপোর্ট থেকে যে সব পরিসংখ্যান-প্রমাণ একত্র করেছেন, আমার মতে, এই বিষয়ে সেগুলি অকাট্য। স্পষ্টতই পূর্ববঙ্গে কৃষকদের মধ্যে এত স্তর বিভাজন দেখা যায় না। সেখানে পাট চাষ এবং জমির উর্বরতার জন্য বেশি লাভবান হওয়ায় কৃষকদের মধ্যে একটা মোটামুটি সমান উন্নতি ঘটেছিল। পক্ষান্তরে স্তর বিভাজনের ফলে উত্তরবঙ্গে জোতদাররা সাধারণ চাষীদের চেয়ে অনেক বেশি স্বচ্ছল ছিল এবং পশ্চিমবঙ্গে ধনী কৃষক বা কৃষি কাজে যুক্ত সাধারণ গ্রামবাসীদের চেয়ে অনেক অর্থবান ছিল। পূর্ববঙ্গে দুর্দশাগ্রস্ত ভাগচাষী বা কৃষি মজুরের সংখ্যা মুখ্যত কমই ছিল।

এখানে একটু সতর্কবাণী দিয়ে রাখা চাই। রামকৃষ্ণ মুখার্জীর ১৯২০ এবং ১৯৪২ সালের বগুড়ার ছ'টি গ্রাম সমীক্ষার পরিসংখ্যান দেখিয়েছে, ১৯২০তে গ্রামীণ জনসংখ্যা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত: প্রথম শ্রেণী — জমিদার ও ধনী কৃষক; দ্বিতীয় শ্রেণী — ভাগচাষী ও তৃতীয় শ্রেণী — ক্ষেত মজুর। ১৯৪২-এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর হাতেই ভূমির মালিকানা কেন্দ্রীভূত হয়ে গিয়েছিল।[১৬] পূর্ববঙ্গের পাট অর্থনীতি সংক্রান্ত ওঙ্কার গোস্বামীর পর্যবেক্ষণ এই তথ্য সমর্থন করেছে। সেখানে দেখান হয়েছে, অতিমন্দা বহুসংখ্যক কৃষককে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। গ্রামীণ মহাজনরা (জোতদার) ক্ষতিগ্রস্ত পাট ব্যবসায়ী ও পেশাদার মহাজনদের দুর্দশার সুযোগে অর্থনীতির উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রন বিস্তার করেছিল। পার্থ চ্যাটার্জীও একই ছবি এঁকেছেন। হিন্দু মহাজন ও জমিদার কর্তৃক মুসলমান কৃষকদের ঋণদান প্রক্রিয়ায় সহসা যে বাধার সৃষ্টি হয়, তা সুগত বসু আরও ভালোভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, মুসলমান কৃষকরা তাদের সংহতি বজায় রেখেছিল। সেই কারণেই বিশ শতকের তিন ও চার দশকে ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে মুসলমান কৃষকরা জোটবদ্ধ হয়েছিল। চ্যাটার্জী ও গোস্বামীর বিশ্লেষণ স্বাধীন পূর্ব-পাকিস্তানের ও বাংলাদেশের গ্রামীণ অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কয়েকজন সমাজতত্ত্ববিদের গবেষণা অনুযায়ী সেখানে ধনী কৃষকরাই এই শতকের পাঁচ-এর দশক থেকে গ্রাম নিয়ন্ত্রণ করছিল। আমার যুক্তিতে, এর বহু আগে থেকেই, মন্দার অনেক আগেই পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে জোতদাররা প্রভাবশালী ছিল। ইবন মাজুদ্দিন আমেদ[১৭] এর লেখা *আমার সংসার জীবন* গ্রন্থের উপর বদরুদ্দিন আহমদ ও আমার বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, কিভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধেরও আগে ধনী মুসলমান গ্রামবাসীরা হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে আক্রমনাত্মক মানসিকতা গড়ে তুলেছিল। কি ভাবে তারা মুসলমান গ্রামবাসী ও ভাগচাষীদের এই প্রচারে সামিল করেছিল। প্রথম

বিশ্বযুদ্ধের আগে ও পরে পাবনা জেলায় হিন্দু জমিদার ও মুসলমান ভাগচাষীদের যে লাগাতার সংঘাত হয়েছিল, তা কিছুটা এইভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সমকালীন ইংরেজ কর্মচারীদের লেখাতেও হিন্দু জমিদারদের সঙ্গে সংঘাতে ধনী মুসলমান গ্রামবাসীদের নেতৃত্বের কথা রয়েছে। ১৯২৬ সালে মৈমনসিংহের কালেক্টর হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে মুসলমান কৃষকদের দাঙ্গার বিষয়ে লিখতে গিয়ে আলোচনা করেছেন, এই জেলায় হিন্দু জমিদার ও মুসলমান তালুকদার বা জোতদারদের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান আর্থনীতিক প্রতিযোগিতা কত দূর এগিয়ে গিয়েছিল। মুসলমান নির্বাচকদের আগ্রহে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন বিলটি এই জন্য পাশ হয়েছিল।

আমার বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, ১৭৯০-এর দশকে অথবা ১৮৮৫ ও ১৯২৮-এর বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের মধ্যবর্তী সময় বা অতিমন্দা ও ১৯৪৫-এর দুর্ভিক্ষের মধ্যবর্তী সময়ে জোতদার ও বর্গাদারের সম্পর্কই বাংলার কৃষিতে প্রধানতম সম্পর্ক। বুকানন হ্যামিলটনের সময়ে অথবা এইচ. ও. বেল. এবং এ.সি. হার্টলের আমলে জমি বন্দোবস্তের কালে উত্তরবঙ্গে এই অবস্থা ছিল, এমন দাবিও করি না। সেখানে ১৯০৮ এবং ১৯৩০-এর দশকে স্বকৃষিতে নিযুক্ত কৃষকই সংখ্যাগরিষ্ঠ। পূর্ববঙ্গে ধনী কৃষকরা সংখ্যায় নগন্য একথাও অস্বীকার করব। বিষয়টি প্রথে। উত্থাপনের উৎসাহে রত্নলেখা রায় এবং আমি ১৯৭৩-এর একটি লেখায় অতিশয়োক্তি করেছিলাম দুই শতকের ব্রিটিশ শাসনে গ্রাম বাংলায় মহাজনী কারবারে সমৃদ্ধ জোতদার ও বর্গাদারের মধ্যে প্রভু ভৃত্যের সম্পর্কটাই ছিল প্রধানতম কৃষি সম্পর্ক।[১৯] ১৯৮০ সালে আরও পরিণত বিচারের ফলে রত্নলেখা রায় লিখেছিলেন, উপরের স্তরে নতুন বনিক-জমিদারশ্রেণী যেমন পুরনো অভিজাত বর্গের ভূসম্পত্তি পুরোপুরি অধিগ্রহণ করতে পারে নি, সেই রকম নিচের স্তরেও নতুন কৃষক জমিদারশ্রেণী কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষকদের কৃষি জমি খুব একটা বড় আকারে আত্মসাৎ করতে পারেনি।[২০]

তাহলে সুগত বসু সমালোচিত জোতদার তত্ত্বটি কতটা সংশোধন করা দরকার? এই তত্ত্বটি অনেকখানি সংশোধিত হয়েছে, কিন্তু আমার ধারণা, কাওয়াই অথবা বসু যে রকম ভেবেছেন, সে রকম ভাবে নয়। *বেঙ্গল ভিলেজ বায়োগ্রাফিস*-এর লেখককে অনুসরণ করে কৃষি নির্ভরশীল গ্রামের মানুষকে পাঁচটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায় (ঐ লেখকের মত চারটি গোষ্ঠী নয়। সেখানে মজুর ও ছোট প্রজাদের একটি দলে রাখা হয়েছে):

(ক) ভূমধ্যধিকারী—এর অন্তর্ভূক্ত জমিদার, তালুকদার ও ভূমি স্বত্বভোগীদের অনেকে;

(খ) ধনী কৃষক—এর মধ্যে বেশির ভাগই হল বড় দখলিস্বত্বভোগী কৃষক এবং কিছু ভূমি-স্বত্বভোগী;

(গ) কৃষক—সাধারণ কৃষক অথবা ছোট প্রজা, যারা নির্দিষ্ট অধিকারের ভিত্তিতে জমি চাষ করত;

(ঘ) ভাগচাষী—কৃষকশ্রেণীর অনুন্নত অংশ, যাদের মধ্যে অনেকেরই হয়ত ছোট চাষের জমি ছিল, এরা কোন রকম দখলিস্বত্ব ছাড়া ভাগে চাষ করত;

(ঙ) ক্ষেতমজুর—আদপেই কৃষক নয়, বরং ভাড়াটে দিন মজুর (মুনিষ), ক্ষেত-মজুর,

যারা ফসলের এক তৃতীয়াংশ পেত (কৃষাণ); ভৃত্য (মাহিন্দার) এবং গোলাম।

এই বিভাগ আরও সংক্ষিপ্ত করলে বাংলার কৃষিকাজে তিন ধরণের সম্পর্কের অস্তিত্ব আমরা পাই: (১) কৃষক, যারা নিজেদের জমি নিজেরা চাষ করত (২) ভূম্যধিকারী (জমিদার অথবা ধনী কৃষক) ও ভাগচাষীর মধ্যে সাময়িক চুক্তির ভিত্তিতে জমি চাষ। (৩) জমিদার অথবা জোতদারদের ভৃত্য নিয়োগে চাষ। সুগত বসু যে কৃষি সম্পর্কের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকরণ নির্মাণ করেছিলেন, সেই কাঠামোয় উত্তরবঙ্গ ও সুন্দরবনে আধিয়ার-জোতদার সম্পর্কই প্রধানতম। পশ্চিমবঙ্গে ছিল কৃষিতে যুক্ত জমিদার ও কৃষিভৃত্য সম্পর্ক এবং পূর্ববঙ্গে ছিল জমির ভূ-স্বত্ব ভোগী কৃষকের নিজস্ব চাষ পদ্ধতির অস্তিত্ব। এই আঞ্চলিক পার্থক্যগুলির উপর দৃষ্টি দিয়ে তিনি ঠিকই করেছেন। পার্থ চ্যাটার্জীর বিশ্লেষণ থেকেও এটি প্রকাশিত। কিন্তু এই পার্থক্যগুলিকে তিনি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এমন পৃথক পৃথক ভাবে শ্রেণী বিন্যস্ত করেছেন যে বাংলাকে তিনটি পৃথক কৃষি রাজ্য বলে মনে হয়, সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে। যা প্রয়োজন তা হল, সমগ্র বাংলার উৎপাদন সম্পর্কের সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ চরিত্রায়ন (এবং অবশ্যই ভারতবর্ষেরও)। এই দিক থেকে দেখতে গেলে বেঙ্গল ল্যাণ্ড রেভিনিউ কমিশনের নমুনা সমীক্ষার ভিত্তিতেই দেখা যায় যে, বাংলায় অতিমন্দার পরেও সর্বত্র ভাগচাষী বা ক্ষেত মজুরদের দিয়ে জমিচাষের তুলনায় মালিক-কৃষকদের দিয়ে বেশি জমি চাষ হত। কিন্তু প্রথম ধরণের চাষ সব জায়গাতেই ছিল। আর অঞ্চল বিশেষে তা বেশি গুরুত্বপূর্ণও ছিল।

যুক্তিটি আর একটু বিশদভাবে রাখা প্রয়োজন। প্রথমেই বলা দরকার যে, ১৯৩৯ সালে সর্বত্র জমির বড় অংশ কৃষক পরিবারগুলির সদস্যদের দিয়ে চাষ করান হত। এছাড়া, জমিতে তাদের নির্দিষ্ট অধিকার ছিল। বেঙ্গল ল্যান্ড রেভিনিউ কমিশনের নমুনা সমীক্ষায় ব্যতিক্রম ছিল দুটি জেলা— বীরভূম ও খুলনা। সেখানে অর্দ্ধেকেরও বেশি জমি মজুর ও ভাগচাষীদের দিয়ে চাষ করা হত। বাংলায় অন্য জেলাগুলিতে ৫১ শতাংশ বা আরও বেশি জমি মূলত ভূস্বত্বভোগী কৃষকরা তাদের পরিবারের সদস্যদের দিয়ে চাষ করাত। হাওড়া, যশোহর, ফরিদপুর, মৈমনসিংহ, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রংপুর, বগুড়া, পাবনা এবং মালদহের দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি জমিতে এই ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। কিন্তু সমগ্র প্রদেশে দুই তৃতীয়াংশের কিছু কম জমি এই ভাবে চাষ করা হত।[২১] বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ২৪ পরগনা, নদীয়া, ঢাকা ও বাখরগঞ্জে প্রায় অর্ধেক জমি (৪০ শতাংশ ও তার বেশি) চাষ করত ভাগ চাষী ও মজুররা। এই ভাগচাষী ও মজুররা মোট জমির ৩২.২ শতাংশ চাষ করত, এবং তারাই ছিল কৃষিতে নিযুক্ত শ্রমশক্তির ৩৪.৭ শতাংশ। বসু একথা ঠিকই ধরেছেন যে, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গেই জোতদারদের অধীনে ভাগ চাষ হত এবং পশ্চিমবঙ্গে জমিদার ও ধনী কৃষকদের অধীনে ভাড়াটে বা ভৃত্য শ্রেণীর কৃষি শ্রমিকদের দিয়ে চাষ করান হত, অন্যত্র অতটা নয়। কিন্তু উপরোক্ত পরিসংখ্যান নির্দেশ করে যে বাংলার কোথাও ভাগচাষী ও মজুরদের দিয়ে জোতদারদের কৃষিকাজ চালান কৃষিব্যবস্থার

তুচ্ছ উপাদান বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।[২২]

এই বিতর্ককে আমি যেভাবে দেখেছি তার সার-সংক্ষেপ করলে দাঁড়ায়— বাংলার কৃষি ব্যবস্থা আদতে মধ্যচাষী কৃষক কর্তৃক স্বয়ং চাষের ব্যবস্থা, যা জমিদারদের তত্ত্বাবধানে পালিত হত। এই সব জমিদার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে অতিমন্দার সময় পর্যন্ত যথেষ্ট ক্ষমতাশালী ছিল। প্রতি তিন জন কৃষকের মধ্যে অন্ততঃ দুইজন কৃষক নিজের জমির স্বত্বাধিকারী হিসাবে চাষ করত। তবে তারা জমিদারদের ক্ষমতা এবং প্রভাবের অধীনে থেকে নিজেদের রায়তি জমি চাষ করত। তৃতীয় যে চাষী বাকি রইল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে সে কিন্তু রায়ত নয়, সে ছিল ভাগচাষী অথবা মজুর এবং সে জমির মালিকের কঠোর নিয়ন্ত্রণে থাকত। এই জমি ছিল জমিদারের নিজ জোত অথবা ধনী কৃষকের জোত। কৃষি ব্যবস্থায় এটি কোন নতুন ব্যবস্থা নয়, কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে থেকে শুরু করে গোটা উনিশ শতকে এর অস্তিত্ব ছিল। ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন রায়তি ভূস্বত্বভোগী কৃষকের দখলিস্বত্বকে অনুমোদন করেছিল এবং জমিদারের বিরুদ্ধে ধনী কৃষকের অবস্থানকে কিছুটা শক্তিশালী করেছিল। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে বড় জোতদাররা তাদের বড় জমিতে ভাগ চাষী নিয়োগ করত। অন্যত্র বড় কৃষকরা ততটা বড় ছিল না এবং পূর্ববঙ্গে তারা বাকি গ্রামবাসীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে বর্ণবিভক্ত কৃষকরা নিজেদের উদ্বৃত্ত রায়তি জমিতে জমিদারদের মতই অস্পৃশ্য কৃষি মজুর নিয়োগ করত। জমিদাররা এই অঞ্চলে নিজ জোত ব্যবস্থা বহুলাংশে বজায় রেখেছিল।

ভূস্বত্বভোগী কৃষকরা সর্বত্রই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং ধনী কৃষকরাও ছিল জমিদারদের অধীনস্থ। অতিমন্দার আগে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। অতিমন্দা, বাংলার দুর্ভিক্ষ এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের প্রভাবে এই ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। তুলনামূলক ভাবে উন্নত পূর্ববঙ্গে, যেখানে স্বত্বভোগী কৃষকরা ছিল সংখ্যা গরিষ্ঠ এবং কৃষক শ্রেণীর মধ্যে বিভাজন গভীরতর হয়নি, সেখানে পাটের মূল্যহ্রাস হওয়ায় তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।

বিবিধ কারণে, বিশেষত ক্ষুদ্র কৃষি অর্থনীতির ভাঙ্গনের জন্য জমিদাররা কৃষি উদ্বৃত্তে তাদের অংশ আদায় করতে অক্ষম ছিল। বণিক ও মহাজনদের কাছ থেকে ঋণের সুযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সর্বত্র ধনী কৃষকরাই গ্রামীণ ঋণের প্রধানতম উৎস হয়ে উঠেছিল। পশ্চিমবঙ্গে অসংখ্য ছোট জমিদার ও তালুকদার যারা বড় আকারে নিজ জোত ব্যবস্থা বজায় রাখত, তারা জমিদারের ক্ষমতা হ্রাস ও জমিদারির (নিজ জোত থেকে স্বতন্ত্র) পতনের ফলে অসচেতনভাবে কৃষক শ্রেণী থেকে উদ্ভূত জোতদারের কাছাকাছি চলে এসেছিল। ১৯৪৭-এর পরে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গে জমিদারি বিলোপ আইনের পরে দুই বঙ্গেই জোতদাররা সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী প্রধান গোষ্ঠী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল।

সূত্র নির্দেশ

১. সুগত বসু, *আগ্রারিয়ান বেঙ্গল: ইকনমি, সোশাল স্ট্রাকচার অ্যাণ্ড পলিটিক্স, ১৯১৯-১৯৪৭*

(কেম্ব্রিজ, কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস), ১৯৮৬, পৃ ৩০৬; আকিনবু কাওয়াই, *'ল্যাণ্ডলর্ডস্' অ্যাণ্ড ইম্পিরিয়াল রুল: চেঞ্জ ইন বেঙ্গল অ্যাগ্রারিয়ান সোসাইটি-. সি. ১৮৮৫-১৯৪০*, দুই খণ্ড, (টোকিও) মার্চ, ১৯৮৬ এবং ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭, পৃ ১-১০৭, ১০৮-২১৬। দুটি গ্রন্থেই নানা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আছে। কিন্তু এই পর্যালোচনায় জোতদারদের গুরুত্ব তাঁরা দুজনেই কতটা কমিয়ে দেখেছেন, তার উপর আরো আলোকপাত করব।

২. রজত রায় এবং রত্নলেখা রায় 'ডাইনামিক্স্ অফ কন্‌টিনিউইটি ইন রুরাল বেঙ্গল আণ্ডার ব্রিটিশ ইম্পিরিয়াম', *ইণ্ডিয়ান ইকনমিক অ্যাণ্ড সোশাল হিস্ট্রি রিভিউ*, ১৯৭৩; রজত রায় এবং রত্নলেখা রায়, 'জমিন্দারস্ অ্যাণ্ড্ জোতদারস্, এ স্টাডি অফ রুরাল পলিটিক্স্ ইন বেঙ্গল', *মডার্ন এশিয়ান স্টাডিস্*, ভল্যুম-৯, পার্ট ১, ১৯৭৫। রত্নলেখা রায়, *চেঞ্জ ইন বেঙ্গল অ্যাগ্রারিয়ান সোসাইটি: ১৭৬০-১৮৫০* (দিল্লি, মনোহর) ১৯৮০।

৩. রত্নলেখা রায় জীবিত নেই, তাঁর হয়ে (যতদূর সম্ভব) আমার দায়িত্ব হল, বসু, কাওয়াই এবং অন্যান্যদের নতুন গবেষণার আলোকে জোতদারদের বিতর্ককে পুনর্বিবেচনা করা। বিদ্বৎ-সমাজের কাছে জানান কর্তব্য যে, এই বিষয়ে তাঁর খোলা মন ছিল। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত তাঁর শেষ নিবন্ধ থেকে বোঝা যায় যে, জীবনের শেষ প্রান্তে তাঁর ধারণার অবস্থান কাওয়াই-এর কাছাকাছি। রত্নলেখা রায়, 'চেঞ্জিং ফরচুন্‌স্ অফ দি বেঙ্গলি জেন্ট্রি— দ্য পাল চৌধুরীজ্ অফ মহেশগঞ্জ ১৮০০-১৯৫০', *মডার্ণ এশিয়ান স্টাডিজ*, ভল্যুম ২১, পার্ট ৩, জুলাই, ১৯৮৭। পার্থ চ্যাটার্জী, *বেঙ্গল ১৯২০-১৯৪৭: দ্য ল্যাণ্ড্ কোয়েশ্চন*, ভল্যুম ১ (কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী) ১৯৮৪; ওঙ্কার গোস্বামী, অপ্রকাশিত পি এইচ ডি গবেষণা পত্র, অক্সফোর্ড।

৫. কাওয়াই, একটি পুরো অধ্যায় কাশিমবাজার এস্টেট নিয়ে লিখেছেন। তিনি এই বিতর্ক সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, এবং এ. সি. হার্টলের 'ফাইনাল রিপোর্ট অন দ্য সার্ভে অ্যাণ্ড্ সেট্‌ল্‌মেন্ট অপারেশনস্ ইন দ্য ডিস্ট্রিক্ট অফ রংপুর' ও রজত রায় এবং রত্নলেখা রায়ের 'জমিন্দারস্ অ্যাণ্ড জোতদারস' প্রবন্ধটি পড়েন নি।

৬. কাওয়াই-এর পর্যবেক্ষণ যা রত্নলেখা রায় সমর্থিত, সুগত বসুর প্রতিপাদ্যের বিপরীত। সুগত বসু বলেছেন পশ্চিমবঙ্গের জমিদাররা ১৯৩০ দশকে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী ছিল, কিন্তু কাওয়াই-এর প্রমান এর বিরুদ্ধে। (তবে বসুর মতে পূর্ববঙ্গে জমিদাররা ঐ দশকে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল)। বর্ধমান, সৈয়দপুর এবং মহেশগঞ্জের এস্টেটগুলি খাজনা আদায়ের কষ্টকর প্রচেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিল। নথিপত্র থেকে আমারও ধারণা যে, পূর্ববঙ্গের ছোট জমিদাররা, যেমন বিক্রমপুরী বাবুরা মন্দার আগে থেকেই, বস্তুত এই শতকের গোড়া থেকেই, খাজনা আদায়ে ব্যর্থ হচ্ছিল।

৭. বিশেষতঃ রংপুরের বাহারবন্দ এস্টেটে জোতদারদের প্রতিপত্তির দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ওখানে তাদের অস্তিত্ব কাওয়াই-এর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে।

৮. বসু, *অ্যাগ্রারিয়ান বেঙ্গল*, পৃ. ১২।

৯. সাম্প্রতিক সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের প্রমাণ উল্লেখ করে বসু দেখাচ্ছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে জোতদার শব্দটি ভাগচাষীদের বোঝায়, অর্থাৎ ধনী কৃষকদের বিপরীত। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর

বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত যত্নবান পর্যবেক্ষকরা ভাগচাষীদের জোতদার নয়, ভাগ জোতদার (যে জোত অথবা স্বত্ব দখলি ভাগে চাষ করে) হিসাবে উল্লেখ করেছেন। বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ারেও দেখান হয়েছে যে, ঐ অঞ্চলে জোতদার আসলে ভাগ-জোতদার (ভাগচাষী) শব্দের ভুল সংক্ষিপ্তকরণ। অবশ্য বসু সঠিকভাবে বলেছেন, যে আদতে জোতদার শব্দটির বিবিধ প্রয়োগ ছিল এবং বিশ শতকের রাজনৈতিক পরিভাষাতে কুলাক বা ধনী চাষী বোঝাতে শুরু করে।

১০. রত্নলেখা রায়, *বেঙ্গল অ্যাগ্রারিয়ান সোসাইটি*, পৃ.২৬৫।

১১. পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ২৬৬।

১২. রজত রায় ও রত্নলেখা রায়, 'জমিন্দারস অ্যাণ্ড্ জোতদারস', *মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ*, ভল্যুম ৯, পার্ট ১, ১৯৭৪, পৃ. ৯০-৯২।

১৩. রত্নলেখা রায়, *বেঙ্গল অ্যাগ্রারিয়ান সোসাইটি*, পৃ. ২৬২, ২৬৩, পাদটীকা।

১৪. দ্য বেঙ্গল রেন্ট্ ল কমিশন নিম্নলিখিত অভিধাগুলিকে তালিকাভুক্ত করেছিল: উত্তরবঙ্গে জোতদার, যশোহরে গাঁতিদার, বাখরগঞ্জে হাওলাদার এবং পশ্চিমবঙ্গে মণ্ডল। মণ্ডলদের তালিকা-বহির্ভূত রাখা উচিত ছিল। সুগত বসু সঠিকভাবে নির্দেশ করেছেন যে, পশ্চিম মেদিনীপুরে মণ্ডল হল উপজাতীয় প্রধান, ধনী কৃষক নয়। দক্ষিণ ও পূর্ব মেদিনীপুরের চকদাররা, দিনাজপুর, রংপুর, কোচবিহার জলপাইগুড়ি, মৈমনসিংহ এবং রাজশাহীর কিছু অংশের জোতদারের সমার্থক। আমার চিন্তায় হাওলাদার ও গাঁতিদার যদিও এক নয়, তবে সমার্থক। সুগত বসুর বিপরীত ধারণার জন্য দ্রষ্টব্য: *অ্যাগ্রারিয়ান বেঙ্গল*, পৃ ২, ১৬, ১৭।

১৫. রত্নলেখা রায়, *বেঙ্গল অ্যাগ্রারিয়ান সোসাইটিতে* উদ্ধৃত, পৃ ২৮২-৮৩।

১৬. রামকৃষ্ণ মুখার্জী, *সিক্স ভিলেজেস্ ইন বেঙ্গল* (বম্বে, পপুলার প্রকাশন) ১৯৭১, পৃ.১৯১-৯২, ২০৮।

১৭. রফিউদ্দিন আহমদ, *দ্য বেঙ্গল মুসলিমস্, ১৮৭১-১৯০৬: এ কোয়েস্ট ফর আইডেন্‌টিটি* (দিল্লি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস) ১৯৭৪ পৃ ১০২; রজত কান্ত রায়, *সোশাল কনফ্লিক্ট্ অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল আনরেস্ট ইন বেঙ্গল: ১৮৭৫-১৯২৭* (দিল্লি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস), পৃ ৭২-৭৩।

১৮. রায়, *সোশাল কনফ্লিক্ট্*, পৃ ৩৬০।

১৯. রজত রায় ও রত্নলেখা রায়, 'দ্য ডাইনামিকস্ অফ কন্‌টিনিউইটি'.....।

২০. রত্নলেখা রায়, *বেঙ্গল অ্যাগ্রারিয়ান সোসাইটি*, পৃ ২৭১।

২১. সমগ্র বাংলায় ৬৫.৯ শতাংশ জমি চাষ হত স্বত্বভোগী কৃষকদের দ্বারা, ১১.১ শতাংশ বর্গাদারদের দ্বারা এবং ১৩.১ শতাংশ মজুরদের দ্বারা। পার্থ চ্যাটার্জী, *বেঙ্গল*, পৃ. ৪১, সারণি ৬, পৃ. ৪৩-এ, সারণি-৭।

২২. সুগত বসু দেখিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে যারা মজুর নিয়োগ করত, তারা অনেকেই ছিল জমিদার, যারা নিজেদের খামার বা নিজ জোত চাষ করত। একই সঙ্গে অনেক মাহিষ্য, সদ্‌গোপ বা অন্যান্য কৃষকরা যাদের উদ্বৃত্ত জমি ছিল, মজুর ও ভাগ চাষী নিয়োগ করত।

৩

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের গ্রাম বাংলায় গতিময় ধারাবাহিকতা : পরিবর্তনশীল বিশ্বে অনুন্নত সমাজে প্রায়-স্থিত ভারসাম্যের আলোচনা

রজত কান্ত রায় ও রত্নলেখা রায়

ইতিহাস ও সমাজবিদ্যার পারস্পরিক সম্পর্ক অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ হয়েছে। ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি পড়েছে অনুন্নত দেশগুলির সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তনের এবং বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকার উপর। ভারতবর্ষের মত পূর্ব-উপনিবেশগুলির সামাজিক বিবর্তনের প্রধান বৈশিষ্ট্য গত দু'শ বছরে ঘটে যাওয়া পরিবর্তন নয়, বৈশিষ্ট্য হ'ল ভারতবর্ষের, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের বৈষয়িক জীবনযাত্রা বহুলাংশেই প্রাক-ঔপনিবেশিক কালের স্তরে থেকে যাওয়া। জীবন যাত্রার মানে কোনো সর্বাত্মক পরিবর্তন চোখে পড়ে না এবং গ্রামের ক্ষুদ্র পরিবেশে যে ভাবে জীবনযাত্রা সংগঠিত হত তাতেও কোনো আমূল পরিবর্তন হয়নি। এই অপরিবর্তনীয়তার পর্যাপ্ত ও বিশেষণাত্মক ব্যাখ্যার প্রয়োজন সহজেই অনুভব করা যায়। ঐতিহাসিকরা ধরে নেয় যে, গতির অভাব নয়, বরং গতিই হল ব্যাখ্যার বিষয়। এই ধরে নেওয়া বা অনুমান প্রায়শই অসুবিধার সৃষ্টি করে। প্রাচীন, মধ্য ও নতুন রাজ্যের অধীন মিশরের সমাজ সংগঠনের ধারাবাহিকতার বিষয়টি অনেকেরই জানা। কিন্তু ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে ভারতবর্ষের আপাত অপরিবর্তনীয়তা মিশরের তুলনায় গুণগত ভাবে পৃথক প্রক্রিয়া। বাণিজ্য ও শিল্প বিপ্লবের ফলে, অতলান্তিক সাগরের নিকটবর্তী সম্প্রদায়গুলির উন্নতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক উপাদানকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সমাজগুলিতে গতিহীনতার থেকে বেশি ছিল, বিরুদ্ধগতির ফলে প্রগতি ব্যাহত হওয়া। এই প্রগতি ও বিরুদ্ধ গতির বিন্যাস গ্রামের আর্থ-সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপাত ভারসাম্য বজায় রেখেছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশেই প্রথম ইংরাজ শাসন কায়েম হয়েছিল। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়, বাংলা দেশের গ্রামীণ সমাজের ক্রিয়াশীল শক্তি দু'শ বছর ধরে পরিবর্তনের তুলনায় ধারাবাহিকতাই বজায় রেখেছে। এই বিশেষ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কারণ, বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের আপাত

স্থায়ীত্ব অপরিবর্তনীয় উপাদানের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল ছিল না। এটি নির্ভর করত পরিবর্তনকামী নতুন শক্তির বিরূদ্ধ এক পাল্টা পদ্ধতির উপর।

বিশ্লেষণের আগে এই সামাজিক প্রক্রিয়াটিকে ঐতিহাসিক ভাবে প্রমাণ করা দরকার যে, সমাজটা সত্যি সত্যি আপাত পরিবর্তনহীন হয়ে পড়েছিল। এর কারণ, বাংলাদেশের গ্রামীণ ইতিহাসের প্রচলিত তত্ত্বে বিরাট কালান্ত ঘটে গিয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনকালে বাংলা দেশের সমাজে এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিল, এই ধারণার উপর ভিত্তি করে বর্তমানে বাংলার গ্রামের অনেক ইতিহাস নতুন করে রচিত হচ্ছে। ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের প্রাক্তন অধিকর্তা অধ্যাপক রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আমলে গ্রাম বাংলায় পরিবর্তনের এক বিশদ ও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম ও বাংলা দেশের বগুড়া জেলার কয়েকটি গ্রামের পরিসংখ্যান ও তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর এই সমীক্ষা ও ঐতিহাসিক গবেষণার ফলাফল উঁচুমানের দুটি সমাজতাত্ত্বিক রচনা গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।[১] কিন্তু গ্রন্থ দুটি ঐতিহাসিকদের কাছে যোগ্য মর্যাদা পায় নি।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব। পরিবর্তনের যে উদাহরণ তিনি দেখিয়েছেন, আলোচনার সময় তা হয়ত সরল মনে হতে পারে। বীরভূম ও বগুড়া জেলার বিভিন্ন গ্রামের পারিবারিক আয় থেকে দেখা যায় যে, ইংরেজ শাসন কালে বাংলা দেশের গ্রামীণ সমাজ তিনটি বিরুদ্ধ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। শ্রেণী ১ : জমির মালিক ('জমিদার,' 'তালুকদার,' 'পত্তনিদার') এবং ধনী চাষী ('জোতদার', 'গাঁতিদার', 'হাওলাদার')। শ্রেণী ২ : স্বয়ং নির্ভর কৃষক ('রায়ত')। শ্রেণী ৩: ভাগচাষী ('বর্গাদার') এবং কৃষি শ্রমিক ('কৃষাণ')। এই শ্রেণী বিভাগ প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজে ছিল না। চিরাচরিত গ্রামীণ সমাজের মধ্যে সাম্য ও সৌভ্রাত্রের উপর ভিত্তি করে ছিল এক স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষক শ্রেণী। এদের নিয়েই তৈরি হয়েছিল গোটা কৃষিজীবী সম্প্রদায়। স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্থনীতিক ব্যবস্থায় রায়ত নিজেদের পরিবারের প্রয়োজনীয় খাদ্যের জন্য নিজের ক্ষেতে নিজেই কাজ করত। সরকার ও সরকার নিযুক্ত বংশানুক্রমিক কর সংগ্রাহক জমিদারশ্রেণী ছাড়া এদের উপরে কোন উচ্চপর্যায়ের আর্থনীতিক ক্ষমতাগোষ্ঠী ছিল না। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে গ্রামীণ সমাজে প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর উদ্ভব হল এবং সম্পন্ন কৃষক ও জোতদার এবং ভূমিহীন কৃষক ও বর্গাদার-এর মধ্যে এক নতুন আর্থনীতিক সম্পর্ক তৈরি হল। এক দিকে এক শ্রেণীর হাতে জমি কুক্ষিগত হতে থাকল, অন্যদিকে বৃদ্ধি পেল ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা। এই দ্বৈত প্রক্রিয়ায় স্বয়ংনির্ভর কৃষক সম্প্রদায়ের বিন্যাস ত্বরান্বিত হয়েছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত পরিবারের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়া থেকে এটা বোঝা যায়।

এই প্রক্রিয়ার সূত্রপাত লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় থেকে। কর্ণওয়ালিস আইন করে জমির উপর স্বত্ব সৃষ্টি করে। প্রাক্তন জমিদারদের বংশানুক্রমিক

কর-সংগ্রাহকের ভূমিকার পরিবর্তে জমির মালিকানা দিয়ে জমি-মালিক হিসাবে এক নতুন শ্রেণীর জন্ম দেওয়া হয়। সাবেক জমিদারদের হাত থেকে জমি চলে এল এক নতুন শ্রেণীর অর্থলোভী ব্যবসায়ী ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কিছু অসৎ কর্মচারী ও দালাল-মুৎসুদ্দিদের হাতে। এরা জমির মালিক হয়েই খাজনার পরিমাণ বাড়িয়ে দিল। উদ্ভব হল এক পরগাছা জমির মালিক শ্রেণীর। আয়ের এই নতুন সম্ভাবনার দিকে অনেকেরই নজর পড়ল। অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিসেবে দেখা দিল জমির ক্রম-বিভাজন ও অত্যাধিক কর বৃদ্ধি। একই সময়ে ব্রিটিশ শিল্পের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলার গ্রামীণ শিল্পও ধ্বংস হয়ে গেল এবং কৃষিকাজই হয়ে দাঁড়াল গ্রামীণ জনতার একমাত্র জীবিকা।

করবৃদ্ধি, জীবিকার প্রচলিত উপায়গুলির বিনাশ ও দৈনন্দিন জীবন যাত্রার বর্দ্ধিত খরচের ফলে কৃষকরা দরিদ্র হয়ে পড়ল। তারা মহাজনদের কাছে আরও বেশি পরিমানে টাকা ধার করতে বাধ্য হল। ক্রমে ক্রমে তাদের জমিজমা মহাজনদের হাতেই চলে যেতে লাগল। জমির কেন্দ্রীভবন ও জমির মালিকানা হারানো এই সম্পদ অসাম্যের কারণে গ্রামে ধনিক শ্রেণী ও সর্বহারা শ্রেণীর উদ্ভব হয়। শুধুমাত্র জমির মালিকানার এক নতুন ধারণার ফলেই এদের উদ্ভব সম্ভব ছিল না, অর্থনীতিক পরিবর্তনের প্রবণতাও এ ব্যাপারে সাহায্য করেছিল। বাজারি ফসলের অধিক মাত্রায় চাষ ও কৃষি উৎপাদনের বাণিজ্যকরণের কারণে সহায়ক অর্থনীতিক শক্তি তৈরি হয়েছিল। বাজারি শস্যের উৎপাদনের জন্য জমি থেকে লাভের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। এই সম্ভাবনা না থাকলে মহাজনরা তাদের খাতকদের কাছ থেকে জমি নিয়ে নিতে উৎসাহিত হত না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কয়েক দশকের মধ্যে বাংলার বহির্বাণিজ্যের রপ্তানি পণ্য শিল্প দ্রব্য থেকে বদলে হল কাঁচামাল ও খাদ্য শস্য। বাজারের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কৃষি উৎপাদন নির্ধারণ করার ফলে দেখা দিল জমিদারি প্রথা, জমি কুক্ষিগত হওয়া ও কৃষি উৎপাদনে 'ভাগ' ও 'কৃষাণি' ব্যবস্থা। নতুন গড়ে ওঠা বাজারে কৃষি উৎপাদন 'পণ্য' হয়ে উঠল এবং এর মূল্য বৃদ্ধি ঘটে গেল। ঔপনিবেশিক শাসনে কৃষির বাণিজ্যকরণের ফলে এক ধনী কৃষক শ্রেণী 'জোতদার'-এর উদ্ভব হয়েছিল।

কৃষি কাজের পরিবর্তনের এই বিশ্লেষণ যতই যুক্তিপূর্ণ হোক প্রকৃত ঘটনা কিন্তু এরকম ছিল না। ঐতিহাসিকভাবেও এই ব্যাখ্যা সঠিক নয়। মার্ক্‌স্‌বাদী এবং অমার্ক্‌স্‌বাদী বহু গ্রাম-ইতিহাস রচনাকার এই ব্যাখ্যাই ভিত্তি করে লিখেছেন।[২] অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যার অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ অনুমানগুলি নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা হবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উদ্ভূত জমিদাররা প্রধানত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সংযুক্ত শহুরে পুঁজিপতি— এটা সঠিক নয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের পর যারা জমিদারি ও তালুকদারির অধিকার নিলামে কিনেছিল, তাদের এক বড় অংশই জেলার ছোটখাটো ভদ্রলোক। তারা নিজেরাই হয় তালুকদার অথবা ছোট জমিদার ছিল অথবা, বড় জমিদারিতে কিংবা কোম্পানির সরকারে কাজ করত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর এই স্থানীয় ভদ্রলোকেরা জমির স্বাধীন মালিক হিসেবে

নিজেদের অবস্থাকে আরোও দৃঢ় করে তোলে।[৩] অনেক ক্ষেত্রে এরা আগে বড় রাজা ও জমিদারদের উপর নির্ভরশীল ছিল। তাছাড়া জমির মধ্যস্বত্ব অধিকারের উদ্ভব ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী সময়ের ঘটনা নয়! অনেক আগে মুঘল যুগেই এর অস্তিত্ব ছিল। বর্ধমানের রাজার অধীন জমিতে পত্তনি, দরপত্তনি, সেপত্তনি নামের কুখ্যাত মধ্যস্বত্ব প্রথা প্রথম চালু করে মহারাজা তেজচাঁদ ১৭৯৩ এর পর। এর আগে জমিদারি পরিচালনায় জমি ইজারা দেবার ব্যবস্থা চালু ছিল। 'সদর মুস্তাজির' প্রধান ইজারাদার, 'ইজারাদার' ও 'কটকিনদার' (গ্রামের ইজারাদার) ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগীদের জমি ইজারা দেওয়া হত। বর্ধমান রাজ্যের জমিদারি পরিচালনায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর অস্থায়ী ইজারাদার বদলে অধিক পরিমাণ স্থায়ী পত্তনির প্রচলন হয়।[৪] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারদের এক দিনেই ইংল্যাণ্ডের ল্যাণ্ডলর্ডদের মত জমির মালিকানাও হয়নি, জমি ও শ্রমের উপর প্রকৃত কর্তৃত্বও তৈরি হয়নি। আগে জমিদাররা উৎপন্ন ফসলের একটি অংশ পেত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এটিকেই জমির খাজনায় তাদের মালিকানার অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই অধিকার বিক্রি করা, বন্ধক দেওয়া কিংবা দান করা বা বংশধরদের জন্য রেখে দেওয়া যায়। কিন্তু বাস্তবে জমি বংশ পরম্পরায় কৃষক পরিবারগুলিরই দখলে ছিল। কৃষকরা ইংরেজ প্রজাদের মত জমিদারদের কাছ থেকে স্বল্প মেয়াদে জমি নিত না। মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর জমিদারের ইচ্ছায় তারা উচ্ছেদ হত না। আর্থনীতিক বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনো কল্পিত আইনি ব্যবস্থা উৎপাদনের সামাজিক ভিত্তিকে সহসা পরিবর্তন করতে পারে না।

এবার অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণের মূল অনুমান আলোচনা করা যাক। আদম সুমারি ও গ্রামীণ সমীক্ষার সাক্ষ্য থেকে জমি জোতের কেন্দ্রীভবনের পরিমাণ ও ভূমিহীন শ্রমিকদের সংখ্যার লক্ষণীয় বৃদ্ধি প্রমাণিত হয় না। নিজের জমিতে নিজেই চাষ করা কৃষকের সম্পূর্ণ বিলুপ্তির সম্ভাবনা কখনো দেখা দেয়নি।[৫] মালিক চাষী তখনও গ্রামীণ সমাজের এক উল্লেখযোগ্য অংশ। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দেও পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ জন সমষ্টির ৩৪.৪ শতাংশ ছিল এই শ্রেণীভুক্ত। ঐ একই বছরে ১৫.৭ শতাংশ ছিল ভাগচাষী, ২৪ শতাংশ কৃষি শ্রমিক এবং ০.৬ শতাংশ কৃষিকাজ ছাড়া অন্য কাজে নিযুক্ত জমির মালিক।[৬] গ্রামে এই তিন স্তরে বিভক্ত শ্রেণী কাঠামো একটি প্রমাণিত বিষয়। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারির সময়ের গ্রামীণ সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে কয়েকটি উচ্চবর্ণ, যেমন, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, এবং জল চল শূদ্র বর্ণ, যেমন সদ্‌গোপ, আগুড়ি— তাদের গ্রামে বেশির ভাগ জমি নিয়ন্ত্রণ করে। আর ভূমিহীন ভাগচাষী ও কৃষি শ্রমিকরা নিম্ন বর্গের মানুষ। উদাহরণ, সাঁওতাল উপজাতি, অস্পৃশ্য জাতের বাগ্‌দি ও বাউড়ি, কৃষি জাতের মাহিষ্য এরাই কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত লোকের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ।[৭]

সারণি ১ ভূমিহীন চাষীদের পরিমাণ এবং জোতদার ও ভূমিহীন চাষীদের জাত পরিচয়, পশ্চিমবঙ্গের চারটি গ্রাম, ১৯৬১

গ্রাম	জেলা	কৃষকদের মধ্যে ভাগচাষী ও কৃষি শ্রমিকদের শতকরা হিসাব	জোতদারদের জাত	ভূমিহীন চাষীদের জাত
রায়বাঘিনী	বাঁকুড়া	৯২.০	তন্তুবায়, তাম্বুলি, কৈবর্ত, শঙ্খবনিক	বাউড়ি, বাগ্দী
কামনাড়া	বর্ধমান	৪৪.০	গোয়ালা, আগুড়ি	সাঁওতাল, বাগ্দী, বাউড়ি
ঘটমপুর	হুগলি	৬৪.২	মুসলমান, সদগোপ, গোয়ালা	কোরা, কেওড়া, দেশওয়ালি, কার্মকক, বাউড়ি
চন্দ্রভাগ	হাওড়া	৪২.৮	ব্রাহ্মণ, তন্তুবায়	মাহিষ্য

সূত্র: *সেন্সাস অফ ইণ্ডিয়া,* ১৯৬১, ভল্যুম ১৬, পার্ট ৪, ভিলেজ সার্ভে মোনোগ্রাফ নম্বর ১, ৩, ৪, ও ৬।

প্রথম শ্রেণীর হাতে জমিজোতের কেন্দ্রীভবনের ফলে গ্রামীণ সমাজে দ্বিতীয় শ্রেণী ধীরে ধীরে তৃতীয় শ্রেণীর সঙ্গে মিশে যাচ্ছে এমন একটা মত নিয়ে সংশয় আছে।

১৯২০ থেকে বাংলার গ্রামের জন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং কৃষি সংকট ঘনীভূত হওয়ার ফলে প্রতি বছরই কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত অনেক পরিবার মহাজনদের হাতে চলে যাওয়া তাদেরই জমিতে ভাগচাষী বা কৃষি শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এর ফলে গ্রামীণ সমাজে শ্রেণী অবস্থানের অনুপাতের মধ্যে কোনো আমূল পরিবর্তন দেখা দেয় নি। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বগুড়া জেলার ছ'টি গ্রামের যে সমীক্ষা করেন তাতে দেখা যায়, ১৯২০ থেকে ১৯৪২-এর মধ্যে কোনো পরিবারই জমি পুরোপুরি হারায় নি। এই সময়ে ২৩২টি পরিবারের মধ্যে ১৭০টির জমির পরিমাণ একই ছিল, ২৬টির জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ৩৬টি পরিবার কিছু পরিমাণে জমি হারিয়েছিল। তাঁর হিসাব অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীর মালিকানাধীন জমির পরিমাণ গড়পড়তা ২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অথচ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষেত্রে জমির মালিকানার পরিমাণ গড়ে হ্রাস পেয়েছিল যথাক্রমে ২ ও ৩ শতাংশ। কৃষিজীবী ও অ-কৃষিজীবী দুই শ্রেণীকে একত্রে যোগ করে এই হিসাব পাওয়া যায়। কৃষিজীবী শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় জোতদারদের জমির পরিমাণ গড়ে ১.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল, স্বয়ংনির্ভর রায়তদের ক্ষেত্রে তা বৃদ্ধি পেয়েছিল ৩.২ শতাংশ। আর অল্প কয়েক বিঘা জমির মালিক ভাগচাষী ও কৃষি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ০.১৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।[৮] হাসিম আমির আলি

শান্তিনিকেতনের কাছে কয়েকটি গ্রামে ১৯৩৩ ও ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে একই ধরণের সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। তাঁর পরিসংখ্যানে দেখা যায়, এই ২৫ বছরে জমি জোতের পরিমাণ অতি সামান্যই পরিবর্তিত হয়েছিল।[৯] এই গ্রামগুলিতে গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা ৪০ থেকে কমে হয়েছিল ৩৯। অর্থাৎ ৪৬ শতাংশ থেকে কমে হয়েছিল ৩৭ শতাংশ। এই সময়ের মধ্যে জনসংখ্যাও বেড়ে গিয়েছিল। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে এক'শ বিঘার বেশি জমি ছিল দু'টি পরিবারের হাতে। ১৯৫৮ সালে এমন কোনও পরিবার ছিল না। বড় বড় ক্ষেতগুলি বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল অনেক ভাগে। মোটামুটি ভাবে ১৯৩৩ ও ১৯৫৮— দুটি বছরেই নিম্ন বর্ণের লোকেরা ভূমিহীন রয়ে গিয়েছিল, আর ২০ বিঘার বেশি সমস্ত খামারেরই মালিক ছিল উচ্চ ও মধ্যবর্ণের লোকেরা।[১০]

জমির ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রীভবন ও ভূমিহীনদের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রক্রিয়ার যে তত্ত্ব তার অনুমান যে, অতীতে সমস্ত জমি গ্রামের সমস্ত পরিবারের মধ্যে সমান ভাবে বণ্টিত হত। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ১৭৯৩ এর অব্যবহিত আগের সময় সম্পর্কে এই ধারণা করে নিয়েছেন।

সারণি ২ বর্ণ ভিত্তিক জমি-মালিক পরিবার গোয়াল পাড়া জেলা, ১৯৩৩ ও ১৯৫৮

জাতি	ভূমিহীন		১০ বিঘার কম জমির মালিক		১০-২০ বিঘা জমির মালিক		২০-১০০ বিঘা জমির মালিক		১০০ বিঘার বেশি জমির মালিক	
	১৯৩৩	১৯৫৮	১৯৩৩	১৯৫৮	১৯৩৩	১৯৫৮	১৯৩৩	১৯৫৮	১৯৩৩	১৯৫৮
উচ্চ	১	২	-	-	১১	৮	১৯	৩৪	২	-
মধ্য	৩	২	৪	৯	৯	৮	১	৫	-	-
নিম্ন	৩৬	৩৫	১	৩	-	-	-	-	-	-
মোট	৪০	৩৯	৫	১২	২০	১৬	২০	৩৯	২	-

জমির এই সমবণ্টন তত্ত্বে এটাই ধরে নেওয়া হয় যে, পরিবারের লোকেরাই তাদের প্রয়োজনে চাষাবাদ করত। অর্থাৎ একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এই অনুমানগুলি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগেকার সময় সম্পর্কে ঐতিহাসিক সত্য নয়। আঠার শতকে বাঙালী জমিদাররা প্রধানত নগদে খাজনা আদায় করত। চাষীরা এই অর্থ সংগ্রহ করত খাদ্যশস্য তুঁত, তুলা, আখ, লবন (বিশেষত: মেদিনীপুর বা বাখরগঞ্জে) ও অন্যান্য অর্থকারী ফসল বিক্রি করে।

অর্থকরী ফসলের চাষ, অর্থের সংগঠিত বাজার, বাণিজ্য কেন্দ্র ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উন্নতির ফলে বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার আগেই গ্রামের চিরাচরিত স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থনীতি অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। এমনকি রংপুরের মত একটা পিছিয়ে পড়া কৃষি

নির্ভর জেলাও চাল, তেল-বীজ, সুপারি, আদা, তামাক, আফিং, গালা, রেশম, চিনি, নীল, কাগজ, বাঁশ, কাঠ, পাট, গবাদি পশু, মাছ, হাতি প্রভৃতি রপ্তানি করত। আর আমদানির তালিকায় ছিল ডাল, লবন, তুলা, তামা, টিন, লোহা, কচ্ছপের খোলা, চুন, ফল, নারকেল, পাথরের থালা, কম্বল, শাল, সুগন্ধী দ্রব্য, ঘোড়া প্রভৃতি।[১১] ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে যখন হ্যামিলটন বুকানন সমীক্ষা করেছিলেন, তখন রংপুরে মোট বাজারের সংখ্যা ছিল ৫১২। অর্থাৎ প্রতি সাড়ে চোদ্দ বর্গ মাইলে একটি বাজার। সেই সময় এই পশ্চাদপদ জেলার আমদানি ও রপ্তানির সামগ্রীক মূল্য ছিল এই জেলার কৃষি উৎপাদনের মোট মূল্যের ২৪ শতাংশ।[১২] আগের জেলা দিনাজপুর ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনেক বেশি এগিয়েছিল। সেখানে সাপ্তাহিক হাট ও বন্দর ছিল ৬৩৫ টি। অর্থাৎ প্রতি সাড়ে ৮ বর্গ মাইলে একটি। আমদানি ও রপ্তানির মূল্য ছিল জেলার কৃষি উৎপাদন মূল্যের ৩০ শতাংশ।[১৩]

সমাজের স্তর বিন্যাস গ্রামীণ অর্থনীতিতে জটিলতা তৈরি করে। আঠার শতকের বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের সচলতা ও সাম্যের ছবিটা ঠিক নয়। প্রচুর অর্থভিত্তিক বাণিজ্যের ফলে গ্রামীণ সমাজে শোষণ ও সম্পদের কেন্দ্রীভবন দেখা যায়। মহাজনী ব্যবস্থা, মুদ্রার বিনিময় ও খাদ্য শস্যের ব্যবসার ফলে এটা সম্ভব হয়েছিল। প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক মালিক ও মুদ্রা বিনিময়কারীকে বলা হত 'সরাক'। গ্রামে এদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। প্রধানত শহরই ছিল এদের কর্মস্থল। গ্রামে মহাজনী কারবার সাধারণতঃ গ্রামের সম্পন্ন চাষী এবং খাদ্য শস্যের ব্যবসায়ীরা করত। এরাই কৃষি কাজের এবং খাজনা দেওয়ার টাকা যোগাত। রায়ত ও প্রজারা তাদের কিস্তির টাকা দেবার জন্য এদের কাছ থেকে অত্যন্ত চড়া সুদে টাকা ধার করত। মহাজনরা চাষীদের যে শস্য আগাম দিত, তা দিয়েই চাষাবাদ চলত। এই মহাজনরা মফঃস্বলের সব জায়গায়ই ছিল।[১৪] এরা খাদ্য শস্যের ব্যবসাও করত। কৃষিকাজের মরশুমের শুরুতে এরা চাষীদের আগাম শস্য অথবা টাকা দিত। এর ফলে কয়েকটা মরশুমে এই ব্যবসায়ীরা খাদ্য শস্যের এমন একচেটিয়া কারবার ফেঁদে বসেছিল যে, খাদ্য শস্যের অনটনের সময়ে প্রথম যুগের ইংরেজ কালেক্টররা এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছিল।[১৫] আখ, তুঁতে, তেলবীজ প্রভৃতি ব্যয়সাধ্য অর্থকরী ফসলের চাষাবাদ প্রায় সব ক্ষেত্রেই সম্ভব হত চিনি রেশম ও তেল প্রস্তুতকারকদের দেওয়া দাদন দিয়ে। এই দাদনের সুবাদে তারা কৃষকদের কাছ থেকে বাজার দরের চেয়ে অনেক শস্তায় শস্য কিনত।[১৬] জমি মালিকানার উল্লেখযোগ্য বৈষম্যের সঙ্গে আর্থিক বৈষম্যের সুযোগ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে থেকেই এই বৈষম্য ছিল। আজকের বাংলার গ্রামের শ্রেণী-কাঠামো, শ্রেণী-গঠন ব্যাখ্যার জন্য ইংরেজ শাসন কালে জমি-মালিকানার কেন্দ্রীভবনের তত্ত্ব হাজির করা অপ্রয়োজনীয়।

এইচ টি কোলব্রুক (১৭৯৪) ও হ্যামিলটন বুকাননের (১৮০৩) রচনায় গ্রামের কৃষি অর্থনীতিতে শ্রেণী পার্থক্যের প্রচুর সাক্ষ্য আছে। অধ্যাপক রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এটা জানেন না, তা নয়। তিনি অবশ্য প্রধানত দুটো কারণে এই সাক্ষ্য গ্রহণ করেন নি। প্রথমতঃ

তাঁর মতে, এই সময়ে কৃষি ক্ষেত্রে বৈষম্যকে অর্থবহ করে তোলার মত কোন বাণিজ্যিক কৃষি ব্যবস্থা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ তিনি মনে করেন বুকানন বর্ণিত ভাগ চাষ ও ভাড়া করা শ্রমের পরিমাণ এই সময়ে নগন্য ছিল। আমরা অবশ্য আগেই লক্ষ্য করেছি যে, ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে ফসল যথেষ্ট পরিমাণেই বাজারে বিক্রী করা হত। এমন বিশ্বাস করার মত যথেষ্ট কারণ আছে যে, অন্ততঃ কয়েকটি জেলায় ইংরেজ আমলেই সর্বপ্রথম বাণিজ্যিক ফসলের চাষ শুরু হওয়া দূরে থাক বরং অর্থকরী ফসলের জমি ধান উৎপাদনের জমিতে পরিণত করা হয়েছিল। যেমন, মেদিনীপুর জেলায় ১৮০৩ সালে মোট জমির ৭৫ শতাংশে ধান উৎপাদন হত। বাকি জমিতে তুলা, আখ, তেলবীজ, তামাক, তরকারি প্রভৃতি দামি ফসলের চাষ হত। কিন্তু ১৯১০ থেকে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এ. কে. জেমিসনের সমীক্ষায় দেখা যায় যে, কার্যত চাষ করা জমির ৯৪.৩২ শতাংশে ধান উৎপাদন হত।[১৭] সংখ্যা তথ্য থেকেও দেখা যায় যে, ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিকে কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত শ্রমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ভাগচাষী ও কৃষি শ্রমিকরা। আর্থনীতিক ভাবে তারা ধনী জোতদার শ্রেণীর অধীনস্থ। এই জোতদাররা আইনের চোখে জমিদার ও তালুকদারের প্রজা হলেও, গ্রামের জমি ও শ্রমের নিয়ন্ত্রক হিসাবে ছিল জমির প্রকৃত মালিক। এফ ও বেল ১৯৩৪ থেকে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দিনাজপুর জেলায় সমীক্ষা করতে গিয়ে গ্রামাঞ্চলে জোতদারদের প্রবল রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক ক্ষমতা লক্ষ্য করেছিলেন। বুকানন হ্যামিলটনের দিনাজপুর জেলার ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের সমীক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করে বেল লিখেছিলেন, 'এই সম্পন্ন জোতদাররা জেলার কোন নতুন বৈশিষ্ট্য নয়। এরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সৃষ্টি নয়।'[১৮]

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কোলব্রুকের লেখা *রিমার্কস্ অন দি হাজবেন্ড্রি অ্যাণ্ড কমার্স অফ বেঙ্গল* গ্রন্থে বর্ধিষ্ণু চাষী 'জোতদার' ও ভূমিহীন চাষী 'বর্গাদার'দের মধ্যে গড়ে ওঠা এক আর্থনীতিক সম্পর্কের কথা পাওয়া যায়। সম্পন্ন প্রজারা যে গরীব চাষীদের জমি ভাড়া দিত, কোলব্রুক সে বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে, এই ধরণের মধ্যস্থ ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। কারে কারো স্বত্ব এমন যে তাদের খাজনা ও জমির সীমানা সুনির্দিষ্ট ছিল। অনেকের দলিলেই আবার এই অনুমতি স্পষ্ট করে উল্লেখ করা থাকত। তবে অধিকাংশের ক্ষেত্রেই এর পিছনে কোন সমর্থনযোগ্য যুক্তি ছিল না। এই অত্যন্ত ক্ষতিকারক প্রথাটি অত্যাচারের নামান্তর ছিল। উপ-প্রজারা শস্যে দেয় অতিরিক্ত খাজনার ভারে এবং গবাদি পশু, ধান ও নিছক বেঁচে থাকার জন্য নেওয়া ঋণ পরিশোধের চাপে বিপর্যস্ত ছিল। তারা কিছুতেই নিজেদের ঋণ মুক্ত করতে পারত না। এই দুর্বিসহ অবস্থায় তারা কিছুতেই উৎসাহের সঙ্গে কাজ করতে পারত না। তাদের অতি সামান্য আয় হত। যেখানেই মধ্যস্বত্বভোগী প্রজা ব্যবস্থা সেখানেই নিঃস্ব কৃষক ও বিশৃঙ্খল চাষাবাদ।[১৯] জমিদারদের অধীনস্থ ভাগচাষী উপ-প্রজাদের কাছে মূলধন কখনো থাকত না। ফলে তারা প্রত্যেক মরসুমে জোতদারদের কাছ থেকে বীজ, খাদ্য ও টাকা ধার নিত। টাকা দিয়ে গবাদি পশু ও যন্ত্রপাতি কিনত। সুদের হার ছিল ২৫ থেকে ৫০ শতাংশ, আর এর জন্য পণ্য জামিন রাখতে হত। এই

ধরণের দাদন প্রথা গরীব চাষীদের চিরকালের জন্য ঋণগ্রস্থ ও প্রায় দাস করে রেখেছিল। কোলব্রুক মন্তব্য করেছিলেন যে, এই শ্রেণীর চাষীদের দুর্দশার কারণে বা ঋণের চাপে এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।[২০] (দিনাজপুর ও রংপুর জেলার ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের যে বর্ণনা বুকানন দিয়েছেন, তাতেও দেখা যায় যে, ঋণ ব্যবস্থা ছিল গ্রামের শ্রেণী বিভাজনের প্রধান কারণ। ব্যবসা ও কৃষি কাজ থেকে যে লাভ হত, তার তুলনায় সুদের হার ছিল বেশি। তাই সম্পন্ন ব্যক্তিরা গ্রামের লোকেদের জামিনের বিনিময়ে টাকা বা শস্য ধার দিত। এমন শর্তে ধার দিত যে, সেই ঋণ প্রায় কখনই শোধ করতে পারা যেত না। বুকানন মন্তব্য করেছিলেন যে, এই ব্যবস্থার ফলে ধনী ব্যক্তির হাতে আর মূলধন জমা হত্না। মূলধনের জায়গায় অনেকগুলি দুঃস্থ, আশ্রিত মানুষ তার হাত এসে পড়ত। তাদের খোরাক যুগিয়ে সেই ধনী ব্যক্তি যা হাতে পেত, তা মূলধনের উপর সুদ নয়, বরং তাদের শ্রম শক্তির উপর দখল। এই মানুষগুলি দাসত্বের একেবারে নিম্নতম পর্যায়ে অর্থাৎ দেউলিয়া খাতকে পরিণত হত।[২১])

গ্রামে আয়ের কাঠামো জমি বন্টনের ধরনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বুকানন হ্যামিলটন সমীক্ষার সময় রায়তি জমির এক চেটিয়া মালিকানা লক্ষ্য করেছিলেন। এখনকার দিনে একজনের অত বেশি জমি দেখা যায় না। সবচেয়ে বড় জোতদারদেরও নয়। রত্নপুর জেলায়, বিশেষ করে পাতিলদহ ও বাহারবন্ধ পরগনায় তিনি এক শ্রেণীর খুব বড় জোতদারের সন্ধান পেয়েছিলেন। এদের অধিকাংশই ছিল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও উচ্চবর্গের মুসলমান। বাহারবন্ধ পরগনার বেশিরভাগ জমিই ভোগ করত বড় প্রজারা। এদের মধ্যে কয়েকজনের ৬০০০ একরের বেশি জমি ছিল। পরগনার অর্দ্ধেকের বেশি অংশে সেই সব জোতদারদের মালিকানা ছিল, যাদের জমির পরিমাণ ছিল হাজার একর কিংবা তারও বেশি। পাতিলদহর জোতদারদের মধ্যেও পাঁচশ' একরের বেশি জমির মালিক ছিল অনেকে। এই ধরণের খুব বড় জোতদাররা মাত্র কয়েক একর জমি তাদের পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য নিজেদের দখলে রাখত। বাকি জমির একটা অংশ আধিয়ার প্রথায় ভাগচাষ করাত আর একটা অংশ অত্যধিক খাজনায় 'প্রজা' বা 'চুকানিদার'দের ভাড়া দেওয়া হত। খুব বড় জোতদারদের নিচে বড় জোতদার, যারা পঞ্চাশ একর জমির মালিক, এই জমি তারা নিজেদের দখলেই রাখত। এর কিছুটা পরিবারের লোক ও ভাড়া করা শ্রমিকদের দিয়ে আর বাকিটা ভাগচাষীদের দিয়ে চাষ করানো হত। তাদের ক্ষেত আয়তনে ছোট ছিল বলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে তাদের প্রভাব ছিল গভীর।[২২] দিনাজপুর জেলায় বড় জোতদারদের সংখ্যা ছিল কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত জন সংখ্যার ৬ শতাংশ। তারা প্রজাদেরকে ভাড়া দেওয়া জমির ৩৬.৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করত। এর বিপরীতে, ৫২.১ শতাংশ কৃষিজীবীর কোনো জমিই ছিল না (৩নং সারণি দ্রষ্টব্য)। গ্রামের অর্থনীতির উপর জোতদারদের নিয়ন্ত্রণ এবং দরিদ্র গ্রামবাসীদের উপর তাদের সামাজিক ও আর্থনীতিক কর্তৃত্বের বিষয়টি ডাঃ বুকানিন হ্যামিলটন সহজ সরল ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।[২৩]

"প্রতি ১৬ জন কৃষকের মধ্যে ১ জন ৩০ থেকে ১০০ একর জমি চাষ করায়। তারা নিজেরা খাটে না। তাদের বাড়িতে যত জন পোষ্য ততগুলি লাঙল রাখে। আরও দু'তিন

জন লোক ভাড়া করে। বাকি জমি ভাগচাষে দেয়। এদের প্রচুর মূলধন। তারা ভাগচাষীদের ও দরিদ্র প্রতিবেশীদের টাকা বা ধান, কিংবা দুটোই আগাম দিয়ে দেয়, যাতে চাষ চলাকালীন এদের গ্রাসাচ্ছাদন চলে। বলা যায় যে, দেশের চাষাবাদের অর্দ্ধেকটাই এই লোকেদের মূলধণের ভিত্তিতে চলে। বেশির ভাগ আধিয়ার[২৪] আর ছোট ছোট চাষীরা যে পরিমাণ ঋণ নিয়ে থাকে, তার পরিমাণ তাদের গোটা মূলধনের চেয়ে বেশি। বিত্তবান চাষীরা যদি খোরাকের ধান অগ্রিম না দেয়, তাহলে চাষীরা ছয় মাস খেতেই পাবে না। এমনকি বীজ ধান পর্যন্ত অগ্রিম দেওয়া হত। এদের কেউ অসন্তুষ্ট হলে, সে জোতজমা ছেড়ে সমস্ত পোষ্য সমেত অন্য এমন এক জমিদারির আওতায় চলে যেত, যেখানে পতিত জমি আছে এবং সেই জমি আবাদের জন্য নিজের মূলধন দিয়ে সে পরিষ্কার করে নিতে সমর্থ। যে গ্রাম সে ছেড়ে যায়, সেই সব জমি কয়েক বছর অনাবাদি পড়ে থাকে। জমিদার যদি ওই রকম ভ্রাম্যমান আর একজন কৃষককে ধরতে পারত, তবেই আবার চাষ শুরু হত। সে জন্য জমিদারকে অনেক অনুনয় বিনয় করতে হত। তারপরই লোকজন সমেত সেই কৃষক আবাদির কাজে লাগতে রাজি হয়। এই জন্য জমিদাররা এই শ্রেণীর লোকদের পছন্দ করত না। কিন্তু তাদের কাজ চলবে না, যদি না জমিদার নিজে গরীব প্রজাদের টাকা ধার দিতে প্রস্তুত থাকে। এই বড় চাষীরা নিজের নিজের পোষ্যদের যে টাকা ধার দেয়, তার বদলে তারা বিপুল মুনাফা অর্জন করে। তবুও তারা পোষ্যদের অশেষ উপকার করে। কারণ, তাদের সাহায্য ছাড়া এরা সাধারণ জন মজুর এমন কি ভিখারিতে পরিণত হয়।"

সারণি ৩ কৃষকদের মধ্যে জমির বন্টন, ১৮০৮

কৃষকদের বর্গ	কৃষিজকাজে নিযুক্ত মানুষের শতাংশ	মোট জমির শতাংশ
প্রধান কৃষক গড়ে ১৬৫ বিঘা জমির মালিক	১.৫	১৬.৫
বড় চাষী গড়ে ৭৫ বিঘা জমির মালিক	২.০	১০.০
স্বচ্ছল কৃষক গড়ে ৬০ বিঘা জমির মালিক	২.৫	১০.০
স্বচ্ছল কৃষক গড়ে ৪৫ বিঘা জমির মালিক	৪.৫	১৩.৫
দরিদ্র কৃষক গড়ে ৩০ বিঘা জমির মালিক	১২.৫	২৫.০
দীন কৃষক গড়ে ১৫ বিঘা জমির মালিক	২৪.৪	২৫.০
ভূমিহীন ভাগচাষী	৩৪.০	০
ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক	১৮.১	০

সূত্র: বুকানন, *জিওলজিক্যাল ডেসক্রিপ্শন অফ দিনাজপুর*, পৃ. ২৩৬, ২৪৪।
টীকা: ২, দিনাজপুর বিঘা = ১ একর

গ্রামে ভিক্ষা বৃত্তি ও দাসত্ব এবং কৃষকদের গ্রাম ত্যাগ করার পেছনে রয়েছে জোতদারদের কাছ থেকে সহজে পাওয়া ঋণ। রংপুর জেলার কয়েকটি অঞ্চলে ভাগচাষীরা সম্পন্ন চাষীদের কাছ থেকে খাদ্য, বীজ ও গবাদি পশু পেত। আর যত বেশি বার তারা এসব নিত, তত তাদের কষ্টের পরিমান যেত বেড়ে। তাদের নিজেদের কিছু না থাকায় প্রভুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে তারা দুর্বিসহ জীবন যাপন করত। বীজের সঙ্গে গবাদি পশুও দেওয়া হয়েছে, এই অঞ্চলায় সম্পন্ন চাষীরা উৎপন্ন ফসলের প্রায় সবটাই নিয়ে নিত।[২৫] কৃষাণ বা কৃষি শ্রমিক টাকা দিয়ে ভাড়া করা হত এবং তাদের লাঙল সরবরাহ করা হত। অগ্রিম টাকার বিনিময়ে তারা এক বছরের জন্য তাদের শ্রম বন্ধক রাখত। কিন্তু সুদ মেটাতে না পারায় বেশির ভাগ সময় তাদের এক বছরের বেশি কাজ করতে হত। দিনাজপুর জেলায় একজন তরুণ কৃষাণ বিয়ের খরচপত্র যোগানের উদ্দেশ্যে দু'বছরের জন্য একজন মালিকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। সে তার পুরো মজুরিটাই অগ্রিম হিসেবে নেয় এবং সেটা বিয়েতে খরচ করে। তারপর দু'বছর তার স্ত্রীকে যে ভাবেই হোক নিজের খরচ চালিয়ে নিতে হয়।

কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে তার স্ত্রী যদি অসুস্থ বা তার কোন সন্তানাদি হত, তা হলে অসম্ভব চড়া সুদের বিনিময়ে আবার শ্রম বন্ধক দিয়ে নতুন ভাবে টাকা অগ্রিম নিতে হত। গোটা পরিবারটাই ঋণগ্রস্থ অবস্থায় দূরবস্থার মধ্যে থাকত।[২৬] রংপুর জেলার পূর্ব দিকে মজুরি অগ্রিম দেওয়ার শর্ত আরও কঠোর ছিল। প্রজারা টাকা অগ্রিম নিয়ে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা শোধ করে দিতে চেষ্টা করত। গোটা পরিবারই ঋণ দাতার জমিতে খাটত। যে পরিমাণ কাজ করত, তাতে পরিবারের কোনও ক্রমে ভরণ পোষণ চলত ও সুদ জমা দেওয়া যেত। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা শোধ করতে না পারলে পুরো পরিবারই দাস হয়ে যেত এবং প্রভুর ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের এক সঙ্গে অথবা আলাদা আলাদা বিক্রি করা হত।[২৭]

বুকাননের হিসাব অনুযায়ী, কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত লোকদের মধ্যে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দিনাজপুরে ৫২.১ শতাংশ ও রংপুরে ৫০ শতাংশ ছিল। বর্তমান শতকের সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, বুকাননের সময় থেকে ভূমিহীন কৃষকের অংশ কমেছে। ১৯৩৮-৪০ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় ভূমি রাজস্ব কমিশনের সমীক্ষা অনুযায়ী ভূমিহীন চাষীর অংশ দিনাজপুর জেলায় শতকরা ৩৭.৩ ভাগ ও রংপুর জেলায় শতকরা ৩২ ভাগ। তবে এই সমীক্ষা থেকে অনেক ভাগচাষীরও কয়েক বিঘা জমি আছে, এমন ক্ষেত মজুরদের বাদ দেওয়া হয়েছিল। ১৯৬১ সালে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে যে জনগণনা হয় তাতে দেখা যায় যে, ভাগচাষী, ক্ষেতমজুর ও অন্যের কাছ থেকে জমি ভাড়া নিয়ে চাষ করে এমন গরীব কৃষকদের (যেমন চুকানিদার এবং বর্গাদার) পরিমাণ ছিল দিনাজপুর জেলায় ৪৬ শতাংশ এবং রংপুর জেলায় ৩৮.২ শতাংশ। ১৮০৮ থেকে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় ভূমিহীন কৃষকদের অংশ কমে গিয়েছিল, এটা প্রমাণ করা বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। (সারণি ৪ দ্রষ্টব্য)। জমি যত ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হতে থাকবে, ভাগচাষীদের ততবেশি প্রজায় পরিণত হওয়ার সুযোগ ঘটবে, এই সম্ভাবনাকে বাদ দেওয়া যায় না। বুকাননের সমীক্ষা ভূমিহীন কৃষকের অংশকে হয়ত ছাড়িয়ে গিয়েছিল। রংপুর জেলার স্পেশাল ডেপুটি কালেক্টর গোপাল চন্দ্র দাস আরও সঠিক হিসাব করেছিলেন।[২৮] তিনি দেখিয়েছিলেন যে, ১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে রংপুর জেলার চাষীদের মধ্যে যাদের কোন জমি বা বলদ নেই — এমন কৃষকের সংখ্যা ৩৫ শতাংশ। সে যাই হোক, যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তা থেকে জমি জোতের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রমাণিত হয় না।

সারণি ৪ ভূমিহীন কৃষক শ্রেণী রংপুর ও দিনাজপুর জেলা ১৮০৮, ১৯৩৮, ১৯৬১

	১৮০৮	১৯৩৮	১৯৬১
দিনাজপুর			
ভাগচাষী	৩৪.০	১৩.৮	৯.২
কৃষিশ্রমিক	১৮.১	২৩.৫	১৬.০
আংশিক মালিক, আংশিক ভাড়া দেওয়া ও ভাড়ায় কাজ করা কৃষক	—	—	—
মোট ভূমিহীন কৃষক	৫২.১	৩৭.৩	৪৬.৬
রংপুর			
ভাগচাষী	৩৯.৪	১৯.১	৬.০
কৃষি শ্রমিক	১১.৬	১২.৯	১৪.৮
আংশিক মালিক, আংশিক ভাড়া দেওয়া ও ভাড়ায় কাজ করা কৃষক	—	—	—
মোট ভূমিহীন কৃষক	৫০.০	৩২.০	৩৮.২

সূত্র ও টীকা: বুকানন, *জিওগ্রাফিক্যাল ডেসক্রিপশন অফ দিনাজপুর*, পৃ ২৩৬, ২৪৪; বুকানন হ্যামিলটন ম্যানাস্ক্রিপটস্, এম.এস.এস. ই ইউ আর জি, জি ১২. *অ্যাকাউন্ট অফ রংপুর*, ভল্যুম ২, ৩৬ নং সারণি। *গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল, রিপোর্ট অফ দি বেঙ্গল ল্যাণ্ড রেভিনিউ কমিশন*, ভল্যুম ২, ৮ নং সারণি (ডি) (আলিপুর, ১৯৪০); *সেন্সাস অফ পাকিস্তান*, ১৯৬১, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৫-১৬। ১৮০৮, ১৯৩৮ ও ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের পরিসংখ্যান পুরোপুরি তুলনার যোগ্য নয়। কারণ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শ্রেণীর সংখ্যা ও জেলার সীমানায় পার্থক্য ঘটেছিল।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ওয়েস্টম্যাক্ট্ ও ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে বেল দিনাজপুর জেলার কৃষি অর্থনীতির অন্তর্গত উৎপাদন সম্পর্কের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, তা ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে বুকানন হ্যামিলটনের বর্ণনার অনুরূপ। প্রজাস্বত্ব বিষয়ে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের এক প্রশ্নের উত্তরে দিনাজপুর জেলার কালেক্টর ই.ডি. ওয়েষ্টম্যাক্ট্ লিখেছিলেন যে, জোতদাররা জমিদারদের যে খাজনা

দিত, অধীনস্থ প্রজা ও ভাগচাষীরা টাকা ও শস্যে জোতদারদের তার তিনগুণ দিত। চাহিদা ও যোগানের সূত্র অনুযায়ী জমির জন্য যে প্রতিযোগিতা, তা চাষীরা জোতদারদের যে খাজনা দিত, তার পরিমাণ নির্ধারণ করত। আর জমিদার যে খাজনা পেত, তা প্রথা অনুযায়ী নির্ধারিত হত বলে তার পরিমাণ জমির আর্থনীতিক খাজনার (রিকার্ডিয় অর্থে) চেয়ে অনেক কম। তাছাড়া যেহেতু জোতদার নিজেই টাকা ধার দিত ও বীজ, শস্য ভরণ পোষণ ও অনেক সময়ে লাঙল বলদ দিয়ে কৃষি কাজের মূলধন যোগান দিত, অতএব খাজনার ব্যাপারটা এই ক্ষেত্রে জটিল। খাজনা সুদের সঙ্গে মিশে যেত, আর জোতদার যা পেত তা দিয়ে জমিদারদের কী পাওয়া উচিত, তা নির্ধারণ করা যেত না।[২৯] দিনাজপুরের সেটেলমেন্ট অফিসার এফ.ও. বেল ১৯৩৪ থেকে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে সমীক্ষা করেছিলেন, তাতে দেখিয়েছেন যে, গ্রামাঞ্চলে মহাজনরা ছিল অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন কৃষিজীবি এবং এরাই দক্ষ শোষক, অকৃষি ব্যবসায়ী ও মহাজনরা নয়।[৩০] বেল লক্ষ্য করেছিলেন যে, সামাজিক জীবনে ও বিভিন্ন পরিবারের দিন যাপনের মানের অসাম্য গ্রামীণ সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক গ্রামেই সম্পন্ন কৃষকদের কয়েকটি বড় পরিবার ছিল। এই জোতদার কৃষকরাই ছিল গ্রামের নেতা।

জোতদারদের পরিবারগুলি কয়েক শ' এমনকি কয়েক হাজার বিঘা জমিরও মালিকানা ভোগ করত। এরাই গ্রামাঞ্চলের মহাজন। ভাগচাষীরা তাদের প্রভুর জমিতে চাষ করে যা উৎপাদন করত তার রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত বাজারে বিক্রি করত।[৩১]

একটি কৃষিজীবী পরিবারের অবস্থা সময় বিশেষে একেক রকম হত। কোন কোন পরিবার জোতদার শ্রেণীতে উঠে যেত। আবার কেউ কেউ কোনো রকমে গ্রাসাচ্ছাদনে সমর্থ চাষীর স্তরে নেমে যেত। এই শ্রেণী কাঠামোর মধ্যে ওঠা পড়া বা গতিময়তা ছিল, বিশেষত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে। মূলতঃ আদিবাসী ও নিম্নবর্গের মানুষদের নিয়ে গঠিত তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে উর্দ্ধগতি দেখা যেত না। কাঠামোটি প্রায় অপরিবর্তিত রয়ে গিয়েছিল। দু শ' বছর ইংরেজ শাসন কালে বাংলার গ্রামের উৎপাদন-সম্পর্কের প্রধান চরিত্র ছিল আধা সামন্ততান্ত্রিক। ছোট ছোট আয়তনের জমি, শ্রমিক নির্ভর কৃষিকাজ, জোতদার ও বর্গাদারদের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক ও মহাজনী কারবার এর প্রধান লক্ষণ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রণেতারা ভেবেছিল বেশি মূলধন বিনিয়োগ করে ও উন্নত কলাকৌশলের সাহায্যে বড় মাপের পুঁজিবাদী কৃষিকাজ, তা বাংলাদেশে হয় নি। সেটা হলে ছোট জমিতে ভাগচাষ প্রথা আর থাকত না। কিন্তু এই প্রথা আগের মতই গ্রামীণ অর্থনীতির একটি প্রধান লক্ষণ হিসেবে রয়ে গিয়েছিল।

নতুন ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে কৃষিকাজকর্মে কেন আধা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল, তা ব্যাখ্যা করা দরকার। বিদেশী মূলধন ও দেশের কৃষি অর্থনীতির মধ্যে এমন এক আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্র তৈরি করে, যা গ্রামীণ ও শহুরে অর্থনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক পাল্টে দেয়। এই পরিবর্তিত আর্থনীতিক-সম্পর্কে গ্রামগুলি ইংল্যাণ্ডে তৈরি জিনিসের এক

নতুন বাজার হয়ে উঠল। এই গ্রামগুলিই আবার ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্য ও শিল্প-অর্থনীতির পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য পাঠাত। ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের প্রধান আর্থনীতিক স্বার্থ ছিল আমদানির তুলনায় রপ্তানির আধিক্য। ভারত ছাড়া অন্যান্য দেশের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্য ঘাটতি ছিল। এই ঘাটতির পরিমাণ বিপুল। বাণিজ্য ঘাটতির দুই পঞ্চমাংশ তারা মিটিয়ে দিত ভারতের রপ্তানির উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করে। হোম চার্জ এবং অদৃশ্য পরিসেবা (জাহাজের ভাড়া, বীমা ইত্যাদি)-র এক জটিল পদ্ধতির মাধ্যমে এই আত্মসাৎ চলত। ঊনবিংশ শতাব্দর শেষের দিকে ভারতের গ্রাম থেকে যে সব জিনিষপত্র রপ্তানির জন্য নিয়ে যাওয়া হত, সেগুলিই ইংল্যাণ্ডের বিশ্বজোড়া বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের পুরো কাঠামোটাকে মদত দিয়েছিল।[৩২] বাংলা থেকে প্রথম রপ্তানি-পণ্য ছিল ঊনবিংশ শতাব্দতে নীল আর বিংশ শতাব্দতে পাট। কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্রমশ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্দ্ধারণ করা এবং বাণিজ্যের দিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অর্থনীতিতে রসদের আমূল পুনার্বিন্যাস ঘটল। প্রত্যাশা ছিল এর ফলে গ্রামে কৃষি উৎপাদন-সম্পর্কে প্রগাঢ় পরিবর্তন আসবে। তার থেকে ব্রিটিশ রাজ ও ব্রিটিশ বাণিজ্য সংস্থা রসদ সংগ্রহ করবে।

পরিবর্তন না আসার কারণ, এক জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইংরেজদের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গ্রামের প্রধান গোষ্ঠীগুলির সম্পর্কের ইতিবাচক পুনর্বিন্যাস, সমঝোতা ও সুসংগতি গড়ে ওঠা। বিদেশী পুঁজি ও আধা সামন্ততন্ত্রের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের পুনর্বিন্যাস যে কোনো গোলযোগ ছাড়াই ঘটেছিল, তা কিন্তু নয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের নীল বিদ্রোহ। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত এমন এক ধরনের ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, যাতে অধিকাংশ আঘাতই কোনো বিশৃঙ্খলা ছাড়া সামলে দেওয়া গিয়েছিল। এই ব্যবস্থায় ইংরেজ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি কম দামে প্রচুর রপ্তানিযোগ্য পণ্য লাভ করত এবং গ্রামের প্রধান গোষ্ঠীগুলিও তাদের আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্য বজায় রাখত। কোন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এটা ঘটেছিল, এমনটা নয়। বরং গোটা ব্যবস্থার অন্তর্গত প্রধান শক্তিগুলির মধ্যে অসচেতনভাবে গড়ে উঠেছিল। সামাজিক চাপের মুখে সরকারি নীতি যে ভাবে রচিত হয় তাও এই সমঝোতা গড়তে সাহায্য করেছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রণেতারা আশা করেছিল যে, পুঁজিবাদী চাষের সুবাদে যে পরিমাণ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, তা দিয়ে রপ্তানির (ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তথাকথিত 'বিনিয়োগ'-এর) পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, কৃষিনির্ভর উৎপাদনের জন্য সম্প্রসারণশীল বৈদেশিক বাজারের সঙ্গে জমিদারদের জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার দিয়ে দিলে পুঁজিবাদী চাষাবাদকে উৎসাহিত করা হবে। আশা করা হয়েছিল যে, ধীরে ধীরে এই প্রথা ছোট চাষীদের চিরাচরিত চাষ পদ্ধতির জায়গা নিয়ে নেবে। এটা দেখা গেল যে, কৃষি থেকে আরো বেশি উদ্বৃত্ত সংগ্রহ এবং কৃষি উৎপাদকের কাছ থেকে রপ্তানির প্রয়োজনে বাণিজ্য শস্য ক্রয় নিশ্চিত করার জন্য গ্রামে উৎপাদন-সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে উৎপাদিকা শক্তির বিশাল বৃদ্ধি আবশ্যক নয়। চিরাচরিত কৃষি ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে অর্থকরী

ফসলের চাষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কারণ, টাকা, বাণিজ্য ও ঋণের চল চিরাচরিত ব্যবস্থার মধ্যেই যথেষ্ট ছিল। বিশ্ব বাজারের প্রতি কৃষি অর্থনীতি উদাসীন ছিল না। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাটচাষের জমির পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি। কাঁচা পাটের দামের বছর পিছু বাড়া কমার সঙ্গে পাট চাষের পরিমাণের বাড়া কমা ছড়িয়ে ছিল। ফলে, ছোট কৃষকদের ছোট ছোট ক্ষেত থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ বাণিজ্যিক পণ্য সংগ্রহ করার কোন সমস্যা ছিল না। তাছাড়া কৃষকরা যে পদ্ধতিতে চাষ করত তাতে খরচও কম পড়ত এবং বড় বড় ক্ষেত্রে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে বাগিচা মালিক ও জমিদাররা যে চাষ করত, তার থেকে সস্তা হত। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কোলব্রুক মন্তব্য করেছিলেন যে, এদেশে চাষবাস হয় অত্যন্ত মিত ব্যয়ে, সরল পথে। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ভারতে অন্য যে কোনো বাণিজ্যিক দেশের তুলনায় সস্তা। আবার ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলায় বেশি শস্তা। সবচেয়ে সহজ খাওয়া-দাওয়া আর স্বল্প পরিধান কৃষকদের পক্ষে যথেষ্ট। ফলে শ্রমের মূল্যও কম। কৃষি কাজে ব্যবহৃত প্রতিটি যন্ত্রপাতিই ছিল সস্তা। গবাদি পশুও সাধারণ ক্রেতার কাছে খুব দামী ছিল না এবং সাধারণ মালিকের পক্ষে খরচ সাপেক্ষ ছিল না।[৩৩]

বাংলাদেশে নীল চাষের মত বিদেশী উদ্যোগ চাষীদের পুরোপুরি মজুরির বিনিময়ে কৃষি শ্রমিকে পরিণত করার পরিবর্তে তাদের চাষের জন্য টাকা ধার দেওয়া ও বাজারের সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়াকেই বেশি লাভজনক মনে করত। নীল চাষের অবস্থা অবশ্য খুবই খারাপ ছিল। বিশ্বের বাজারে নীলের যা দাম ছিল, তাতে নীল কুঠির মালিকদের পক্ষে চাষীদের যথেষ্ট আকর্ষণীয় দাম দেওয়া সম্ভব হত না। চালের দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে, নীল মালিকরা যা দাম দিত, তা উনবিংশ শতাব্দর মধ্যভাগে এসে চাষীদের কাছে আর গ্রহণযোগ্য ছিল না। খুব কম দামে ফসল পাবার জন্য নীল কুঠির মালিকরা ঋণ বা দাদন দিয়ে চাষীদের নীল চাষে আটকে রাখত। গ্রামে উৎপাদন সম্পর্কে এক অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ঘটল। নীল মালিকরা গোটা মহাজনী ব্যবস্থার উপর তাদের প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে নীল বিদ্রোহের সময়ে চাষীরা নীল চাষকে বয়কট করেছিল। এতে নেতৃত্ব দিয়েছিল গ্রামের প্রধান গোষ্ঠীগুলি। নীলচাষ খুব সফল হয় নি। কারণ নতুন ঔপনিবেশিক অর্থনীতি গ্রামের আধা সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে খুব ভালো ভাবে খাপ খায় নি।[৩৪]

পাট শিল্পের অবস্থা ছিল সবল, ফলে চাষীরা ভাল দাম পেত। কাঁচা পাটের ব্যবসায়ী ইউরোপিয় বাণিজ্য সংস্থাগুলি নীল প্রস্তুতকারকদের মতো সস্তায় পর্যাপ্ত পণ্য সরবরাহের জন্য উৎপাদন পদ্ধতি ও ঋণ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করে নি। চাষীরা দাদন দেওয়া মহাজনকে নয়, খোলা বাজারে সবচেয়ে বেশি দাম দিতে চাওয়া ক্রেতাকেই তাদের পণ্য বিক্রি করত। কিন্তু আসলে কাঁচা পাটের বাজারে চাষীরা স্বাধীন ছিল না। ইউরোপিয় এক-চেটিয়া বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি এই বাজার নিয়ন্ত্রণ করত। এরা এমন ভাবে মূল্য স্থির করত যে, বিশ্বের বাজারে পাটের বাড়তি দামের জন্য মুনাফা পাট চাষীদের কাছে পৌঁছত না, সেটা যেত কলকাতা ও ডান্ডির পাট শিল্পে। অন্যদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কাঁচা পাটের

দাম অর্দ্ধেকেরও বেশি কমে যাওয়ায় পূর্ববঙ্গের চাষীদের প্রচণ্ড দুর্দশার মধ্যে পড়তে হয়েছিল।

এর বিপরীত ছবি কলকাতার পাট শিল্প। সেখানে মুনাফা হত প্রচুর। আদায়কৃত মূলধনে নীট লাভ (সুদ বাদ দিয়ে)-এর অনুপাতের হিসাব ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের অংককে ১০০ ধরে ১৯১৫-তে ৫৮০, ১৯১৬-তে ৭৫০ এবং ১৯১৭-তে ৪৯০। ভারতীয় পাটকল সংস্থার পৃষ্টপোষকতায় ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা সংঘবদ্ধ হয়ে এই মুনাফা করত। ভারতীয় পাটকল সংস্থাগুলি একমাত্র ক্রেতা হওয়ার সুবাদে ও সরকারের উপর রাজনৈতিক প্রভাব থাকার ফলে কাঁচা পাটের দাম অস্বাভাবিক কমিয়ে রাখত।[৩৫] যেহেতু পৃথিবীর বাজারে পাট চাষে বাংলার একাধিপত্য ছিল, এই আয় থেকে কৃষির প্রভূত উন্নতি হতে পারত, কৃষি উৎপাদনের সম্পর্ক আধা-সামন্ততান্ত্রিক থেকে পুঁজিবাদী ধরণে রূপান্তরিত হতে পারত। কিন্তু কৃষকের ফসল ধরে রাখার অক্ষমতায় ও সংগঠনের অভাবে পাটের বাজারের মৌলিক কাঠামোগত দুর্বলতা ছিল। অন্যদিকে, পাট ক্রেতাদের ছিল জোরাল সংগঠন ও ক্ষমতা। ফলে, বাংলাদেশে কৃষিতে পুঁজি তৈরির হার বাড়তে পারে নি।[৩৬]

যখন এইরকম ভাবে বিদেশী পুঁজিপতি সংস্থাগুলি একান্তই নিজেদের নিয়ে একটা শক্তপোক্ত গোষ্ঠী তৈরি করে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের সর্বোচ্চ স্তরে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, তখন কৃষি ব্যবস্থা আধা-সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতেই চলছিল।

সারণি ৫ চট ও কাঁচাপাটের তুলনামূলক দাম ১৯২০-১৯৩৪

বছর	কৃষকের পাওয়া পণ্যমূল্য	কারখানায় পাওয়া চটের মূল্য	শিল্পের অতিরিক্ত প্রাপ্তি (চটের মূল্য- উৎপাদন খরচ ও পণ্যের মূল্য)	কলাম ১-এর শতাংশে কলাম-৩
	১	২	৩	৪
১৯২০-১৯২৪	২৩৫	৯২৫	৩৬৫	১৫৫
১৯২৫-১৯২৯	২৮৫	৯১৬	৩৩২	১১৬
১৯৩০-১৯৩৪	১০০	৪৩৬	১০৯	১৫৯

সূত্র: এম আজিজুল হক, *দ্য ম্যান বিহাইন্ড দ্য প্লাউ* (কলকাতা, ১৯৩৯)

বাণিজ্যিক শস্যের চাষের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে কোন কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে নি। বাজারে ক্রেতার আধিপত্যের ফলে শস্য বাণিজ্যের লাভ উৎপাদকদের কাছে আসে নি। একদিকে জাহাজ, বহির্বাণিজ্য ও পুঁজির সংগঠিত বাজারের উপর নিয়ন্ত্রণের ফলে আমদানি রপ্তানির কাজে নিযুক্ত ইংরেজ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির প্রবল ক্ষমতা; অন্যদিকে অসংগঠিত, নিরক্ষর, অসংখ্য বিচ্ছিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে থাকা কৃষকদের দুর্বলতা। তারা শক্তিশালী বাণিজ্য

ও শিল্প সংস্থাগুলির সঙ্গে দরদামে পেরে উঠত না। এই সব বিচ্ছিন্ন গ্রামের প্রধান গোষ্ঠীগুলি মহাজনী কারবার ও অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের মাধ্যমে চাষীদের চূড়ান্ত শোষণ করত এবং এরা বিদেশী বাণিজ্য সংস্থা ও দেশীয় দালালদের তুলনায় কৃষকদের আরও দুর্বল করে দিয়েছিল।

পুজোর সময় পাট কেনা পাট ব্যবসায়ের এক দীর্ঘ দিনের কৌশল। ফসল কাটার সময় চাষীদের উপর খাজনা, সুদ, কর প্রভৃতির দাবিদারদের প্রচণ্ড চাপ থাকত। ফলে, তারা ফসল ওঠার পরই চাল, পাট ও অন্যান্য শস্যকে বাজারে নিয়ে যেত। আর তখন শস্যের দাম সবচেয়ে কম। ঋণ, কর ও খাজনার চাপে কৃষকরা এত বিপর্যস্ত ছিল যে, ইউরোপীয় রপ্তানিকারীরা বাংলাদেশের গ্রাম থেকে অস্বাভাবিক কম দামে কৃষি পণ্য কিনে নিয়ে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিত। জোতদাররা চড়া হারে খাজনা ও সুদ আদায় করত বলেই ইউরোপীয় রপ্তানিকারীরা এত কমদামে কৃষি পণ্য কিনতে পারত। রপ্তানির পরিমাণ বাড়ানর জন্য উৎপাদন শক্তিগুলির সম্প্রসারণ খুব জরুরি ছিল না। খাদ্য শস্যের রপ্তানি ও খাদ্য শস্যের জায়গায় অ-খাদ্য শস্যের চাষ প্রবর্তন করে গ্রামে গার্হস্থ্য ভোগের পরিমাণ কমিয়ে এনে একই উদ্দেশ্য সাধন করা যেত।[৩৭] আভ্যন্তরীণ গার্হস্থ্য ভোগের পরিমাণ কমিয়ে রাখার ব্যাপারে গ্রামের আর্থনীতিক অসাম্য, সরকারের রাজস্বনীতি (করের অনড় চাহিদা), সরকারি আর্থিক নীতি (দেশ থেকে পণ্য বের করে নিয়ে যাবার জন্য, রূপোর অনিয়ন্ত্রিত আমদানি), ফসলের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে ক্রেতা হিসেবে বিদেশী সংস্থাগুলির একাধিপত্য — এই সবই কারণ হিসাবে দেখা দিয়েছে।

নতুন আর্থনীতিক শক্তি হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ গ্রামে জোতদার শ্রেণীর রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক প্রাধান্যের নির্দিষ্ট ধরণের সঙ্গে মানিয়ে গিয়েছিল। বীরভূম জেলার ২৬টি গ্রাম নিয়ে ডঃ অমিত ভাদুড়ির ১৯৭০-এর সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ধনী কৃষকের প্রাধান্য গ্রামের অর্থনীতিতে এক ধরণের মন্দা সৃষ্টি করত। জোতদাররা জমিদার ও মহাজনের এক যৌথ ভূমিকা পালন করত। উৎপাদন সামান্য বাড়ালে তার যত বেশি লাভ হত, তার থেকে অনেক বেশি টাকা সে আদায় করত সঙ্কুচিত উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে দায়বদ্ধ ভাগচাষীদের কাছ থেকে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে ভাগচাষীরা ঋণ মুক্ত হতে পারত। ফলে সুদ থেকে জোতদারদের লাভ বন্ধ হয়ে যেত, তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অবসান হত। খাজনার বৃদ্ধি যদি সুদের তুলনায় বেশি হত, তবেই জোতদাররা উন্নত কৃষি ব্যবস্থায় আর্থনীতিক ভাবে উৎসাহী হতে পারত। কিন্তু কৃষি পণ্যের আভ্যন্তরীণ বাজারের সম্প্রসারণের অভাবে বাংলায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই ধরণের বিরাট পরিবর্তন সম্ভব ছিল না। ১৮৯১ সালে বাংলায় মোট জনসংখ্যায় শহুরে মানুষের সংখ্যা ছিল ৫ শতাংশেরও কম। দ্রুত শিল্পায়নের অভাবে শহরাঞ্চলের বাজার কৃষি উৎপাদনে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। কৃষি উৎপাদনের বৃহত্তর বাজার গ্রামাঞ্চলে। কৃষকদের দারিদ্র্যের ফলে এই বাজারে ছিল মন্দাভাব। কৃষকের ভোগ্যপণ্য কেনার ক্ষমতা কম, তাই কৃষি উৎপাদন গ্রামের বাইরে চলে যেত। বাংলার গ্রামগুলিতে সামাজিক ও আর্থনীতিক সম্পর্কগুলির মধ্যে পরিবর্তনহীনতার প্রবণতা

লক্ষ্য করা যায়। গ্রামের প্রধান গোষ্ঠীগুলির রাজনৈতিক প্রভাব ও আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করত অপরিবর্তনীয় উৎপাদন ব্যবস্থার উপর।

সাম্রাজ্যবাদের নির্দিষ্ট আর্থনীতিক লক্ষ্যের জন্য গ্রামে কৃষি সম্পর্কের আমূল পুনর্বিন্যাস প্রয়োজনীয় ছিল না। কৃষির চালু পরিকাঠামোয় এই লক্ষ্য পূরণ হতে পারত। এই কাঠামো যতটা ভাবা গিয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রস্তুত হয়েছিল। বিরাট কৃষি উদ্বৃত্ত বের করে আনা এবং বাণিজ্যিক শস্যের ক্রমবর্দ্ধমান অংশকে বাজারে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছিল গ্রামীণ সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসে। প্রথমতঃ জটিল বাণিজ্যিক ব্যবস্থায় ফসল কলকাতার বাণিজ্য কেন্দ্রমুখী হয়ে ওঠে। সেখানে এক নতুন ইউরোপীয় ব্যবসায়ী শ্রেণী তৈরি হয় এবং তারা সংগঠিত ব্যাঙ্কিং বহির্বাণিজ্য, জাহাজের ব্যবসা প্রভৃতির মাধ্যমে পূর্বের অসংগঠিত অর্থনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে। বৈদেশিক বাণিজ্য সংস্থাগুলি অর্থনীতিতে গভীর দাপটের সঙ্গে কৃষি ও অ-কৃষির মধ্যে বাণিজ্যের শর্তাদি নিয়ন্ত্রণ করত। দ্বিতীয়তঃ একটি শক্ত পোক্ত খাজনা আদায়কারী কাঠামো 'এস্টেট' বানিয়ে তা গ্রামের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রাজস্ব সংগ্রহের জন্য এই এস্টেটগুলির মদতে ছিল শক্তিশালী রাষ্ট্রশক্তি, তার আইন ও পুলিশ আদালত। শক্তিশালী আধুনিক রাষ্ট্র গঠন করার এই প্রক্রিয়ায় বর্ধমান, বীরভূম বা বিষ্ণুপুরের রাজাদের মত সামন্ত প্রভুদের বিশাল অঞ্চলের পরিবর্তে এসেছিল ইউরোপীয় আমলা শাসিত জেলা। ফলে রাষ্ট্র ও গ্রামের মধ্যে সংযোগকারী, রাজন্যদের দিন শেষ হয়ে যায়। এইভাবে গ্রামের পুরো আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক চিত্র পাল্টে গিয়েছিল। অথচ গ্রামের সামাজিক কাঠামো আগের মতই রয়ে গিয়েছিল। লণ্ডন ও কলকাতার মত বৃহত্তর নগরের পরিবর্তন গ্রামের ক্ষুদ্র জগতের অপরিবর্তনের ধারাবাহিকতাকে টিকিয়ে রেখেছিল।

নির্দেশিকা

১. রামকৃষ্ণ মুখার্জি, *ডাইনামিক্স্ অফ এ রুরাল সোসাইটি,* (বার্লিন) ১৯৫২; *সিক্স ভিলেজেস্ অফ বেঙ্গল্* (বোম্বে, পপুলার প্রকাশন) ১৯৭১।

২. সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই বক্তব্য সবচেয়ে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় ড্যানিয়েল ও এলিস থর্নার-এর *ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড লেবার ইন ইণ্ডিয়া (বোম্বে)*এশিয়া পাবলিশিং হাউস, ১৯৬২, পৃ. ৫১-৫৭। এই বক্তব্যের বিরোধিতার জন্য দ্রষ্টব্য তপন রায় চৌধুরী, 'দি আগ্রারিয়ান সিস্টেম অফ মুঘল ইণ্ডিয়া' *ইন্কয়ারি,*স্প্রিং, ১৯৬৫ ও ধর্মা কুমার, *ল অ্যাণ্ড কাস্ট ইন সাউথ ইণ্ডিয়া : এগ্রিকালচারাল লেবার ইন দি ম্যাড্রাস প্রেসিডেন্সি ডিউরিং দি নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি*(কেম্ব্রিজ, কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস) ১৯৬৫।

৩. বোর্ড অব রেভিনিউকে কালেক্টরদের প্রেরিত সরকারি বিক্রির হিসাবের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া দ্রষ্টব্য এম. এস. ইসলাম, *পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট অ্যাণ্ড দি ল্যাণ্ডেড্ ইন্টারেস্ট ইন বেঙ্গল : ১৭৯৩-১৮১৯,* এস ও এস গবেষণা পত্র, ১৯৭২।

৪. *বেঙ্গল রেভিনিউ প্রসিডিংস,* ৫ জুন, ১৭৯৩, বোর্ড অব রেভিনিউকে বর্ধমানের কালেক্টর ;

ঐ, ১৭ জুন, ১৭৯৩, বোর্ড অব রেভিনিউকে কালেক্টর।

৫. হোম মিসলেনিয়াস, খণ্ড-৫৩০, পৃঃ ৪৯৩-৫৩৭, বিনয় ভূষণ চৌধুরি, 'অ্যাগ্রারিয়ান ইকনমি অ্যাণ্ড অ্যাগ্রারিয়ান রিলেশনস্ ইন বেঙ্গল : ১৮৫৯-১৮৮৫', অক্সফোর্ড গবেষণাপত্র, পৃ ৮৮।

৬. *সেন্সাস অফ ইণ্ডিয়া,* খণ্ড ৬, অংশ ১এ, পৃ ৪৬০,

৭. এটিও আগের গ্রাম সমীক্ষার সাক্ষ্য, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ফরিদপুর জেলা সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে জে. সি. জ্যাক যে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন তাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছে। তিনি লিখেছিলেন, জেলার কৃষি সম্পদ এত ভালোভাবে ভাগ করা হয় যে, কৃষকদের সবচেয়ে বড় অংশ যথাযথ ভাগ পায়। এটা বিশাল খামার ও দরিদ্র শ্রমিকদের নিয়ে তৈরি পুঁজিবাদী কৃষকের দেশ নয়— জে. সি. জ্যাক, *দি ইকনমিক লাইফ অফ এ বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট,* (অক্সফোর্ড, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস) ১৯১৬, পৃ. ৮২।

৮. রামকৃষ্ণ মুখার্জি, *সিক্স ভিলেজেস অব বেঙ্গল,* পৃ ১৯১-১৯২, ২০৮।

৯. হাসিম আমিন আলি, *দেন অ্যাণ্ড নাউ, এ স্টাডি অফ সোশিও ইকনমিক স্ট্রাকচার অ্যাণ্ড চেঞ্জ ইন সাম ভিলেজেস নিয়ার বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি, বেঙ্গল,'* কলকাতা, ১৯৬০ পৃ. ১৯-২০

১০. তদেব।

১১. মন্টগোমারি মার্টিন সম্পাদিত *দি হিস্ট্রি অ্যান্টিকুইটিস, টপোগ্রাফি অ্যাণ্ড স্ট্যাটিস্টিক্স্ অফ ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া*(লণ্ডন), পৃ ৭১০-৭১১।

১২. তদেব, পৃ ৭১০-৭১৩।

১৩. ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিল্টন, *এ জিওগ্রাফিক্যাল, স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাণ্ড হিস্টরিক্যাল ডেসক্রিপশন অফ দি ডিস্ট্রিক্ট, এ জিলা অফ দিনাজপুর ইন দি প্রভিন্স অর সুবা অফ বেঙ্গল,* (কলকাতা, ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস) ১৮৮০, পরিশিষ্টের পরিসংখ্যান দ্রষ্টব্য।

১৪. বি. আর. পি., ৭ এপ্রিল, ১৭৮১, ১৩ নং, বোর্ড অফ রেভিনিউকে নদীয়ার কালেক্টর, ১ এপ্রিল, ১৭৮৯।

১৫. ডব্ল. কে. ফার্মিংগার, সম্পাদিত, *দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ড্স,* প্রথম খণ্ড, ২৯ নং, পৃ ৮৯-৯০, দিনাজপুরের কালেক্টরকে রেসিডেন্ট জর্জ উড্‌লি, ১৯ জানুয়ারী, ১৭৮৮। তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৬৭, পৃ ২৩১, শোরকে দিনাজপুরের কালেক্টর, ১৪ জুন, ১৭৮৮।

১৬. ফ্রান্সিস বুকানন, *দিনাজপুর,* পৃ ২১২-২৭০, ৩০৪।

১৭. এ. কে. জেনসন, *ফাইনাল রিপোর্ট অন দি সার্ভে অ্যাণ্ড সেটেলমেন্ট অপারেশন্স্ ইন দি ডিস্ট্রিক্ট অফ দিনাজপুর,* ১৯১০-১৯১৮, পৃ ২৫-২৬।

১৮. এফ. ও. বেল, *ফাইনাল রিপোর্ট অন দি সার্ভে অ্যাণ্ড সেটেলমেন্ট অপারেশনস্ ইন দি ডিস্ট্রিক্ট অফ দিনাজপুর,* ১৯৩৪, ১৯৪০।

১৯. এইচ. টি. কোলব্রুক, *রিমার্ক্স অন দি হাজবেণ্ড্রি অ্যাণ্ড ইন্টারনাল কমার্স অফ বেঙ্গল,* (লণ্ডন) পুনর্মুদ্রণ, ১৮০৬, পৃ ৬৪।

২০. তদেব, পৃ ১০৩।

২১. ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিল্টন, *দিনাজপুর,* পৃ ২৪১।

২২. বুকানন হ্যামিল্টন, ম্যানাস্ক্রিপ্ট, এম এস এস, ই ডি আর, ডি ৭৫, অ্যাকাউন্ট অফ রংপুর, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১০৩, ১৪৯, ১৫৮।

২৩. ফ্রান্সিস বুকানন, *দিনাজপুর* পৃ. ২৩৫-২৩৬।

২৪. বর্গাদার ভাগচাষী নামেও পরিচিত।

২৫. ফ্রান্সিস বুকানন, হ্যামিল্টন ম্যানসক্রিপ্ট, এম এস এস, ই,ডি আর, ডি ৭৫, অ্যাকাউন্ট অফ রংপুর, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১১০-১১১।

২৬. ফ্রান্সিস বুকানন, *দিনাজপুর,* পৃ. ২৪৫।

২৭. বুকানন হ্যামিল্টন, ম্যানাসক্রিপ্ট এম এস এস, ই ডি আর ডি ৭৫, অ্যাকাউন্ট অফ রংপুর, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১১৩।

২৮. গোপাল চন্দ্র দাস, *রিপোর্ট অন দি স্ট্যাটিস্টিক্স্ অফ রংপুর ফর দি ইয়ার ১৮৭২-৭৩,* (কলকাতা) ১৮৭৪, পৃ. ৮৫।

২৯. রিচার্ড টেম্পেল, কালেকশন, এম এস এস, ই ডি আর, এফ ৮৬, ১৬৫, রাজশাহী ও কুচবিহার ডিভিশনের কমিশনারকে দিনাজপুরের কালেক্টর, ই.ডি. ওয়েস্টম্যাকট্, ১, ২৯ জুন, ১৮৭৬।

৩০. ফাইনাল রিপোর্ট অফ দিনাজপুর, পৃ. ২৪-২৫।

৩১. তদেব, পৃ. ১৬-১৭।

৩২. এস বি সল, *স্টাডিজ ইন ব্রিটিশ ওভারসিজ্ ট্রেড, ১৮৭০-১৯১৪* (লিভারপুল) ১৯৬০, পৃ ৬২-৬৩।

৩৩. কোলব্রুক, *রিমার্ক্স,* পৃ. ১২৮

৩৪. নীল বিদ্রোহের আরও বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য বি বি ক্লিং, *দি ব্লু মিউটিনি : দি ইণ্ডিগো ডিসটারবেন্সেস ইন বেঙ্গল ১৮৫৯-১৮৬২* (ফিলাডেলফিয়া) ১৯৬৬; বিনয় ভূষণ চৌধুরী, *অ্যাগ্রারিয়ান ইকনমি,* ডব্লু এইচ নেলসন, *ফাইনাল রিপোর্ট অন দি সার্ভে অ্যাণ্ড সেটেলমেন্ট অপারেশনস ইন দি ডিস্ট্রিক্ট অফ নদীয়া ১৯১৮-১৯২২।*

৩৫. অমিয় কুমার বাগচী, প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া ১৯০০-১৯৩৯ (কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, কেম্ব্রিজ) ১৯৭২, পৃ. ২৭৬।

৩৬. *রিপোর্ট অফ দি বেঙ্গল জুট ইন্‌কয়ারি কমিটি,* ১৯৩৩, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৯।

৩৭. দ্রষ্টব্য জর্জ ব্লিন, *এগ্রিকালচারাল ট্রেণ্ড্স্ ইন ইণ্ডিয়া ১৮৯১-১৯৪৭, আউটপুট, এভেইল্যাবিলিটি অ্যাণ্ড প্রডাক্টিভিটি* (ফিলাডেলফিয়া) ১৯৬৬; আভ্যন্তরীণ ভোগের হ্রাস ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের পর আরও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

৩৮. এ ভাদুড়ি, 'এ স্টাডি ইন এগ্রিকালচারাল ব্যাকওয়ার্ডনেস আণ্ডার সেমি ফিউডালইজম্', *ইকনমিক জার্নাল*-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ।

৪

বাংলার গ্রামীণ সমাজে ধনী কৃষক : দিনাজপুরের জোতদার ১৮০০-১৯৫০

চিত্তব্রত পালিত

নকশালবাড়ির আন্দোলনে, সবুজ বিপ্লবে ও পঞ্চায়েতি রাজে জোতদার অথবা ধনী কৃষকদের রাজনীতিক এবং আর্থনীতিক ভূমিকা, গ্রামীণ উন্নয়নের আলোচনায় তাদের গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে দিয়েছে। এই শ্রেণীর প্রেক্ষিতে গ্রামীণ ইতিহাস নতুন ভাবে লেখা হচ্ছে। আগে জমিদার এবং কৃষকদের নিয়ে দ্বি-স্তর গ্রামীণ সমাজের আলোচনা হয়েছে। সেই সব আলোচনায় গ্রামীণ স্তর সম্পর্কে সচেতনতা ছিল না। উনিশ শতকের প্রথমভাগে গ্রামীণ সমাজে জোতদারদের ভূমিকা নিয়ে সম্প্রতি কিছু আলোচনা হয়েছে। এই সব আলোচনার প্রবণতা হল বর্তমানকে অতীতের প্রেক্ষাপটে দেখা এবং তথ্য অনুসন্ধান না করেই গ্রামীণ সমাজে জোতদারদের ক্ষমতাশালী ও মর্যাদাবান হিসেবে দেখান।[১] এই লেখায় এক দীর্ঘ সময় কালে একটি জেলার পটভূমিকায় জোতদার শ্রেণীর বিবর্তন আলোচনা করা হয়েছে। দিনাজপুর জেলাকে বেছে নেওয়ার কারণ, এক মাত্র এই জেলাতেই এই বিষয়ে আলোচনার উপযোগী প্রায় এক শতকের বেশি সময়ের তথ্য রয়েছে। দিনাজপুর ও রংপুর জেলা দুটিতে দীর্ঘ দিন ধরে বনাঞ্চল, আবাদী জমির অপ্রতুলতা এবং ম্যালেরিয়ার কারণে স্বল্প জনবসতি ছিল। এখানে জোতদাররা জমি অধিগ্রহণ এবং বন্দোবস্তে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। এই দুই জেলায় তাদের ক্ষমতা এবং অবস্থানের চরিত্র কখনই সমগ্র বাংলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এ সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে দিনাজপুর একটি আলোচ্য বিষয় হতে পারে।

প্রথমেই প্রয়োজন 'জোতদার' শব্দটির সংজ্ঞার্থ স্থির করা। উইলসনের শব্দকোষ অনুসারে যার জোত অর্থাৎ আবাদী জমি আছে সে জোতদার। আইনি দৃষ্টিতে, সে জমিদার অথবা ভূম্যধিকারীর ভাড়াটে কৃষক এবং খাজনার তালিকায় রায়ত অথবা সাধারণ কৃষক হিসাবে নথিবদ্ধ। একটি বড় জোত আবার প্রজাস্বত্বে ভাগ করে দেওয়া হত। সেক্ষেত্রে জোতদার একজন মধ্যস্বত্বভোগী। সে নিজে জমির একাংশ চাষ করতে পারে এবং বাকি অংশ ভাগচাষীদের অথবা কৃষকদের নগদ খাজনায় দিতে পারে। এই ভাবে দেখলে জোতদার নিছক কৃষক নয়, জমিদারেরই মত। কিন্তু সাম্প্রতিককালের ইতিহাস

চর্চাতেও এক বিস্তৃত শ্রেণী বিন্যাসের মধ্যেই তাকে শুধু একটা জায়গা দেওয়া হয়েছে।

ধনী কৃষকদের সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ রয়েছে আঠার শতকের আটের দশকে বোর্ড অব রেভিনিউ-র কাছে পাঠান রংপুর, রাজশাহী, বীরভূম, পূর্ণিয়ার কালেক্টরদের প্রতিবেদনে। কালেক্টররা জানিয়েছেন যে, রায়ত প্রধানরা অনেক সময়ে জোতদারকে রায়তদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে দিত না। এদের অবাধ্য বলা হত।[২] এই উদাহরণগুলি থেকে কিছু গবেষক মনে করেন যে আঠার থেকে বিশ শতক পর্যন্ত জোতদাররা একই রকম ক্ষমতাবান ছিল।[৩] কিন্তু ফার্মিঙ্গার তাঁর *ফিফথ্ রিপোর্ট*-এর ভূমিকায় এবং নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ তার *ইকনমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল* বইতে ১৭৮০-র দশক নিয়ে এই ধরনের ঢালাও অনুমান সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। ফার্মিঙ্গার-এর মতে এই ভাবে পর্যবেক্ষণ আসলে ভুল দিক দিয়ে দেখার যত্ন।[৪] নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ এই বিষয়ে বলেছেন :

> কতকগুলি অঞ্চলে অবাধ্যতা ছিল। কিন্তু রংপুর, রাজশাহী, পূর্ণিয়া অথবা বীরভূমের এই সব নিয়ন্ত্রণ-অসাধ্য কৃষকরা বাংলার কৃষকদের সাধারণ চরিত্র নির্দেশ করে না। এই সব ছোট খাটো কৃষক বিদ্রোহগুলিতে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা উচিত নয়। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এই সব ছোট কৃষক বিদ্রোহগুলিকে একত্রিত করলে হয়ত এক গুরুত্বপূর্ণ তালিকা তৈরি করা যাবে, কিন্তু এগুলির ফলাফল সম্পর্কেও এক ভ্রান্ত ধারণা গড়ে উঠবে। ১৭৮৩-তে দেবী সিংহের নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে রংপুরে যে অভ্যুত্থান হয়েছিল, তা প্রমাণ করে যে, নির্যাতন সীমাহীন হলে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ প্রতিরোধে সামিল হয়। এই অভ্যুত্থানে জমিদাররা কৃষকদের সঙ্গে, ইজারাদার ও তার দালালদের বিরুদ্ধে যুক্ত হয়েছিল। এটি নিছক কৃষক বিদ্রোহ ছিল না।[৫]

দুজনেই মনে করেছেন, এই অবাধ্য আকাঙ্খার জন্ম হতাশা থেকে, ক্ষমতার প্রশ্ন থেকে নয়। উপরন্তু, সিংহ দেখিয়েছেন, প্রতিবাদ ছিল অনুপ্রবেশকারী ইজারাদারদের বিরুদ্ধে, তাদের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত জমিদারদের বিরুদ্ধে নয়। আসলে জমিদারই ছিল বিদ্রোহের নেতা এবং অবাধ্য অংশকে সে-ই গ্রামে জড়ো করেছিল।

একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, ১৭৭০-এর দুর্ভিক্ষের পরে বাংলার এক বড় অংশ জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং আবাদ তৈরির কাজে বহিরাগত মজুর পাওয়া কঠিন ছিল। আঠার শতকের আটের দশকে যে সব জমিদারিতে বিস্তৃত জঙ্গল ছিল, সেখানে জমিদাররা অভিবাসী কৃষক প্রধান ও তার অধীনস্থদের অনুসন্ধান করছিল। এই সব কৃষক প্রধানরা ছিল আধুনিক কালের মজুর সরবরাহকারী ঠিকাদারদের মত। একবার বসতি গড়ার পরে এরা কৃষিকাজে আগ্রহ হারাত এবং জমিদারদের সঙ্গে নিরন্তর দর কষাকষি করত। এই দরকষাকষি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারত না, যদি না সেই এলাকা রংপুর, দিনাজপুর, মেদিনীপুর, বীরভূম বা সুন্দরবনের মত আয়তনে বিশাল ও জনসংখ্যায় অপ্রতুল হত। এই সব জেলাগুলিতে অধিগ্রহণকারী জোতদাররা তাদের প্রয়োজনীয়তা ও সেই সঙ্গে ক্ষমতা উনিশ শতকেও ধরে রাখতে পেরেছিল। ১৭৯৪-এ কোলব্রুক 'খুদকস্ত' ও 'পাইকস্ত' রায়তদের মধ্যে যে পার্থক্য

করেছিল, তা থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। খুদকস্ত রায়তদের বাস্তভিটা, কম হারে খাজনার সুবিধা এবং অন্যান্য সাহায্য দেওয়া হত, প্রধানত দূরের কৃষকদের প্রলোভিত করার উদ্দেশ্যে। কোলব্রুক লক্ষ্য করেছেন যে, এই সব প্রজারা আবার অগনিত কৃষককে জমি ভাগ করে দিত। তিনি বুকানন হ্যামিলটনের আগে জোতদারের এক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন।

দুর্দশাগ্রস্থ ছোট স্বত্বাধিকারী প্রজারা ফসলে দেয় খাজনার জন্য গবাদিপশু ও বীজের জন্য এবং ভরণপোষনের প্রয়োজনে চড়া সুদে টাকা ধার করে কখনই ঋণ থেকে রেহাই পেত না। এই রকম চরম কষ্টকর অবস্থায় তারা কখনই খুশী মনে চাষ করত না, কারণ, কোনরকমে বেঁচে বর্তে থাকার মত তারা আয় করত এবং অবস্থার উন্নতির কোন আশা তাদের কাছে ছিল না। যেখানেই মধ্য প্রজাস্বত্ব ব্যবস্থা টিকেছিল, সেখানে কৃষককুল অভাবি, কৃষিকাজ ছিল অবহেলিত।[৬]

কোলব্রুক আলোচনা করেছেন, কী ভাবে জমিদার বা ইজারাদাররা জোতদারদের পরোক্ষ সহায়তায় অননুমোদিত কর বা 'সেস' চাপাত। তিনি বলেছেন, 'অল্প সংখ্যক সুবিধাভোগী প্রধান কৃষক সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষিজীবীকে পরিচালনা করত।'[৭] উপরন্ত, 'নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে কিছু ক্ষমতাবান কৃষককে সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দিয়ে নতুন কর অনুমোদন ও প্রবর্তন করা হত'...।[৮] এইভাবে উদ্ভব হয়েছিল একশ্রেণীর প্রজার, যারা জমিতে এক চেটিয়া অধিকার পেয়ে, প্রকৃত উৎপাদককে আগাম খাজনা অথবা অর্দ্ধেক ফসলের বিনিময়ে জমি ইজারা দিত। ধনী কৃষকদেরই অন্য একটি অংশ তাদের অধস্তন প্রজা বা ভাড়াটে ক্ষেত মজুরদের চাষের কাজ তদারকি করত। যেমন ব্রাহ্মণ বা অন্যান্যরা, সংস্কার অনুযায়ী নিজেরা জমিতে কাজ করত না ।[৯]

ফলে আঠার শতক থেকে জোতদারদের অধীনে তিন ধরণের কৃষক ছিল : যারা নগদ খাজনা দিত, ভাগচাষী এবং ভাড়াটে মজুর। কয়েকটি মহলে একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, জোতদারদের অধীনে ছিল শুধুই ভাগচাষী ও ভাড়াটে মজুর। আঠার শতকে 'সান্দুতা' ব্যবস্থা বা ফসলের মাধ্যমে খাজনা দেওয়ার পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল এক সার্বজনীন ব্যবস্থা প্রচলনের অভাবে। উনিশ শতকেও এই অবস্থা টিকে থাকা নির্ভর করেছিল ভূমির প্রকৃতি, শ্রমের যোগান এবং সর্বোপরি জোতদারদের কাছে এই ব্যবস্থা কতটা মুনাফাজনক তার উপর। মুনাফার নিরিখেই জোতদার তার জমিকে নগদ খাজনায় অথবা শস্য খাজনায় ভাগ করে দিত।

বাংলা সম্বন্ধে সাধারণভাবে কোলব্রুক যা বলেছেন, তার কিছুটা সংখ্যাতথ্যের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে বুকানন হ্যামিলটনের লেখায়। বুকানন তাঁর পর্যবেক্ষণ সীমিত রেখেছেন রংপুর ও দিনাজপুর জেলায়। এই জেলা দুটি তিনি উনিশ শতকের প্রথম দশকে সমীক্ষা করেছিলেন। তিনিই সমীক্ষালব্ধ তথ্যের প্রথম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষক। এর থেকে উন্নত ও অপেক্ষাকৃত বস্তুনিষ্ঠ সমসাময়িক কোন জেলার বিশ্লেষণ আর নেই। শুধুমাত্র দিনাজপুরের তথ্যই এখানে আলোচিত হবে। বুকানন তাঁর সমকালীন দিনাজপুরের আবাদী জমি বিষয়ে

নিম্ন লিখিত তথ্য রেখেছেন :

৭,১৯৪,০০০ বিঘা — মোট আবাদী জমি।

১,৯৪,০০০ বিঘা — ক্ষুদ্র জমিদার অথবা লাখিরাজদারদের অধীনে, যারা এই জমি ভাড়াটে মজুর অথবা ভাগে চাষ করতে দিয়েছে।

৪০,০০০ বিঘা — দরিদ্র মানুষের অধিকারে, যাদের জমি এক লাঙলে চষের পক্ষে কম অর্থাৎ ১৫ বিঘার কম।

অবশিষ্ট ৬৬,০০০ বিঘা — ৬৬০০জন প্রধান ইজারাদার যাদের প্রত্যেকের রয়েছে ১৬৫ বিঘা।

৮৮,০০ জন বড় ইজারাদার যাদের প্রত্যেকের অধীনে ৭৫ বিঘা;

১১,০০০ জন মধ্য ইজারাদার যাদের প্রত্যেকে ৬০ বিঘা;

১৯,৮০০ জন স্বচ্ছল ইজারাদার যাদের প্রত্যেকের ৪৫ বিঘা;

৫৫,০০০ জন দরিদ্র ইজারাদার, যাদের প্রত্যেকের ৩০ বিঘা;

১,১০,০০০ জন অভাবগ্রস্ত ইজারাদার যাদের প্রত্যেকের ১৫ বিঘা;

অধিয়ার অথবা ভাগচাষী ১,৫০,০০০ টি পরিবার;

কিসান অথবা কৃষিমজুর : ৮০,০০০ টি পরিবার।

শেষের দুই বিভাগে কিছু দরিদ্র এবং অভাবগ্রস্ত ইজারাদারও রয়েছে।[১০] হ্যামিলটন জানিয়েছেন যে, জমিদারদের অধস্তন ধনী কৃষকরা ছিল মুসলমান। তারা কৃষি কাজ থেকে অব্যাহতি পেতে পারত। এই তথ্য থেকে বলা যায় যে, সর্বত্রই মুসলমান সম্প্রদায় বলতেই নিপীড়িত কৃষক বোঝাত না। গ্রামীণ উৎপাদনে মধ্য ইজারাদাররাই ছিল মুখ্য। প্রতি ১৬ জনের মধ্যে একজনের ৩-১০০ একর জমি ছিল। নিজেদের লাঙল অনুযায়ী নিজেরা চাষ করত, বাকিটা ভাগচাষে দিত। হ্যামিল্টন লিখেছেন :

> এদের সাধারণভাবে প্রচুর মূলধন ছিল। তারা, ভাগের জন্য যারা চাষ করত তাদের ও অন্য অভাবাগ্রস্ত প্রতিবেশীদের কৃষি চলাকালীন জীবন ধারণের জন্য, টাকা ও শস্য দুই-ই আগাম দিত। একথাও বলা যায় যে, দেশের সমগ্র কৃষি উৎপাদনের মধ্যে অন্তত: অর্দ্ধেক ছিল তাদের কুক্ষিগত।[১১]

বেশির ভাগ অধিয়ার এবং ক্ষুদ্র ইজারাদাররা তাদের মজুত শস্যের মূল্য দিয়ে দেওয়ার পরও ঋণে আবদ্ধ থাকত এবং যদি অবস্থাপন্ন ইজারাদাররা শস্য অগ্রিম না দিত, তাহলে অনাহারে থাকতে হত। এমনকি কৃষির জন্য বীজ লাঙল, গরু দেওয়া হত। হ্যামিল্টন আরো বলেছেন :

> যখনই এদের মধ্যে কেউ অসন্তুষ্ট হত, তখনই সে তার সমস্ত পোষ্য সহ ঐ ইজারাদারি ছেড়ে অন্য জমিদারি, যেখানে পতিত জমি পরিষ্কার করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল সেখানে চলে যেত। যে গ্রাম সে ছেড়ে গেল, সেখানে জমি কয়েকবছর খালি পড়ে থাকত। যতদিন না জমিদার

অন্য জায়গা থেকে চলে আসা কৃষক পেত, ততদিন। সাধারণভাবে পোষ্য সহ নতুন কৃষককে অনেক অনুরোধ করে বসান হত।[১২]

এই সব অধিগৃহীত এলাকায় বিনিয়োগের জন্য বড় ইজারাদারদের উপর নির্ভর করতে হত। তাদের নিয়ন্ত্রণেই ছিল মূলধন এবং মজুর। তাই দিনাজপুরের মত একটি বিশিষ্ট জেলায় ধনী কৃষকরা দীর্ঘদিন ধরে ভূম্যধিকারীদের সঙ্গে দর কষাকষি চালিয়ে যেতে পেরেছিল। যেখানে জমি বন্দোবস্ত হয়েছিল এবং মজুরদের পক্ষে স্থানান্তর সম্ভব ছিল না, সেখানে এই অবস্থা আশা করা যেত না। বড় ইজারাদাররা তাদের অধমর্ণদের কাছ থেকে প্রচুর মুনাফা পেত। তারাই আবার দরিদ্র কৃষকদের সাধারণ মজুর বা ভিখারি হতে দিত না। বড় ভূম্যধিকারীরা আড়ালে তাদের ঘৃণা করলেও প্রকাশ্যে প্রশংসা করত। এদের সাহায্য নিয়ে দরিদ্র প্রজাকে লুঠ করত। বড় ভূম্যধিকারীরা যদি কোনও উদ্দেশ্যে টাকা তুলতে চাইত, তাহলে ধনী কৃষকদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাদের সমর্থনে দরিদ্রদের উপর সাধারণ কর চাপাত। বুকানন হ্যামিলটন কোলব্রুকের সমীক্ষা প্রসঙ্গে বলেছেন, তাঁর সময়ে জমিদার জোতদার সমন্বয় ছিল। জমিদারি থেকে সমগ্র খাজনার ৩০ শতাংশ জমিদাররা রাখত।[১৩]

প্রধান ইজারাদাররা আবার জেলার শস্য বাণিজ্যের অংশ বিশেষ ছিল। তারা প্রধান উৎপাদককে শস্য, লাঙল, বীজ, গরু অগ্রিম হিসেবে দিত। পরে শস্যের মাধ্যমে এর মূল্য ফেরত দিতে হত। ৫,০০০ টাকা থেকে ২০,০০০ টাকা ছিল তাদের মূলধন। আবার, এই মূলধন ঋণ হিসাবে দিত মুর্শিদাবাদ ও কলকাতার বনিকরা, যারা বাৎসরিক ৪০,০০,০০০ টাকা মূল্যের চাল দিনাজপুর থেকে কিনত। ধনী ইজারাদাররা নিজেদের ও অন্যদের জমির শস্য সুবিধা জনক বাজারের আশায় মজুত রাখত।[১৪] বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন বৈদ্যনাথ মণ্ডল, পাটনার ভোজপুরের ভোজরাজ, বর্ধমানের কালনার ঠাকুরদাস নন্দীরা, মুর্শিদাবাদ ও কলকাতার বাজারের জন্য দিনাজপুরে তাদের প্রতিনিধি পাঠাত। নদী তীরের গুদামে শস্য মজুত করে নৌকায় পাঠান হত।[১৫] বুকানন হ্যামিলটনের সময়ে (১৮০৭-১৮০৮) দিনাজপুরের জোতদাররা ছিল গ্রামীণ অর্থনীতিতে অপরিহার্য। কৃষি উৎপাদন সংগঠনে ও বিপননে সেই ছিল প্রধান। পোষ্যদের প্রায় ভূমিদাসের মত রাখত। জমিদাররাও পতিত জমি অধিগ্রহণ এবং মজুর যোগানের জন্য জোতদারদের সঙ্গে সমঝোতায় আসত। এ সত্ত্বেও তারা তাদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ অতিরিক্ত খাজনায় আদায় করত। দিনাজপুরের রাজার মত বড় জমিদার, অথবা উদিত চৌধুরীর মত ছোট জমিদার খাজনার ১৫-৩০ শতাংশ পর্যন্ত মুনাফা পেত। এই মুনাফা আদায়ের জন্য দিনাজপুর রাজকে তার জমির ৮ টি এলাকার জন্য ৮০০ পাইক ও ২০০ কোতয়াল রাখতে হত।[১৬]

অর্ধশতকেরও বেশি সময় পরে (১৮৫১-৬১-র মধ্যে) এক গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা করেছিলেন মেজর শেরউইল। সমকালীন অবস্থার বিচারে শেরউইল অনুধাবন করেছিলেন যে, বুকানন হ্যামিলটন দিনাজপুরের জনসংখ্যার যে তথ্য দিয়েছিলেন— প্রতিবর্গ মাইলে ৫৫৮ জন— তা যথেষ্ট বেশি। তাঁর মতে, এই সংখ্যা ২২৭ জন হতে পারে। অবশ্য পরবর্তীকালে দিনাজপুরের

সঙ্গে মালদহ ও বগুড়া যুক্ত হয়েছিল এবং ম্যালেরিয়ার জন্য জনসংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছিল। শেরউইল এই অঞ্চলকে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর মনে করেছিলেন। চাষযোগ্য জমির তুলনায় জনসংখ্যা ছিল অপ্রতুল। বিস্তৃত অঞ্চল ছিল জঙ্গলাকীর্ণ এবং নিম্ন জলাভূমি। সেখানে কৃষি কাজ সম্ভব ছিল না। ধনী কৃষকদের দর কষাকষির অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে গিয়েছিল। সামান্যতম কারণে তারা এক গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে চলে যেত। মজুরদের অপ্রতুল সংখ্যা দেখে জমিদাররা বাধ্য হয়ে তাদের সঙ্গে সমঝোতায় আসত। তা না হলে, সরকারকে যথাসময়ে রাজস্ব দেওয়া তাদের পক্ষে কষ্টকর ছিল। কৃষির মূল্য বেড়েছিল। চালের দাম ১৮৪০-এ ছিল এক টাকায় ৭০ সের থেকে ২ মন আর ১৮৬০-এ হয়েছিল ৩৫ থেকে ৪০ সের। শস্যের বাজারও বিস্তৃত হয়েছিল। ধনী কৃষকরা এতে লাভবান হয়েছিল। তাদের মুনাফা বেড়েছিল দ্বিগুণ। জমিদাররাও কৃষি বিস্তারের ফলে লাভবান হয়েছিল, কারণ, জঙ্গলগুলিকে কৃষির জন্য অধিগ্রহণ করা হচ্ছিল।[১৭]

হ্যামিলটনের সময় থেকেই চাল রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ৪০ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ৬৫ লক্ষ টাকা। আত্রেয়ী নদী তীরের গুদামঘর থেকে নিয়ম মাফিক নদীপথে কলকাতা ও চন্দননগরে চাল পাঠন হত। ধনী কৃষকদের কাছে নিম্ন বঙ্গের বণিকরা দালালের মধ্যেমে অগ্রিম টাকা পাঠিয়ে দিত।[১৮]

পাঁচের দশকে জোতদার এবং জমিদার অথবা ঠিক তার উপরওয়ালার তুলনামূলক ক্ষমতা নির্ভর করত বাস্তব পরিস্থিতি ভিত্তিক তাদের আপেক্ষিক শক্তির উপর। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে দিনাজপুর জেলা-আদালতের কয়েকটি মামলা থেকে এই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। ফুল মহম্মদ নামে এক জোতদার দূর্গাকান্ত নামে তার জমিদারের বিরুদ্ধে বকেয়া খাজনা অনাদায়ের অভিযোগে গবাদি পশু এবং শস্য নিয়ে যাওয়ায় তার মূল্য বাবদ ১০৪ টাকা ৩ আনা ৬ পাই আদায়ের জন্য মামলা করেছিল। এটা প্রমাণিত হয়েছিল যে, ৩৩ বিঘা ৬ কাঠার জন্য প্রাথমিক জমা ছিল ৩২ টাকা ৩ আনা। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইজারাদার জমিদার খাজনা নিতে অস্বীকার করে তার ৮ টি ষাড় এবং পুরো শীত কালীন শস্য নিয়ে যায় ও বিক্রি করে দেয়। জোতদার এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে কাজি অথবা নিম্ন আদালতের কর্মচারীর সহায়তায় ক্রোক করার আদেশ হস্তগত করেছিল, যার মারফত ৭৫ টাকা কবুলবেশি অর্থাৎ স্বেচ্ছাকৃত কর বাবদ আরও ১৮ টাকা আদায় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল। এই মামলাটি জোতদারকে দমন করার জমিদারের স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ এবং জোতদারের পক্ষে তার প্রভূর বিরুদ্ধে মামলা করার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু কয়েকজনই মাত্র এইভাবে শেষ পর্যন্ত লড়তে পারত।[১৯]

ওই বছরেই আর একটি মামলা এই জেলার গ্রামীণ সম্পর্কের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। জোতদার আইনুল্লার ৯৬৬ বিঘা ১৩৩/৪ কাঠা জমির জন্য জমা ছিল ৫-৯-৯ টাকা। অভিযোগ করা হয়েছিল যে, ওই জোত ইজারাদার-জমিদারদের পোষ্য বাদুল্লা মণ্ডলের নামে মাসে ৫৫ টাকার বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল। আইনুল্লা চার পুরুষ ধরে ওই জোত

ভোগ করেছিল এবং তা ছেড়ে দেওয়ার কোন কারণ ছিল না। ইজারাদার ২৫ শতাংশ খাজনা বৃদ্ধি করতে চেয়েছিল, আইনুল্লা আপত্তি করাতে ওই পোষ্যকে স্থাপন করা হয়। আইনুল্লা প্রতিবাদ করে তাকে সরিয়ে দেয়। ইজারাদারের সমর্থনে ইজারাদারের লোক মামলা দায়ের করেছিল। মামলাটি খারিজ হয়ে যায়। এই মামলাটি জমিদার ও বিপরীতদিকে তার পুরনো জোতদারের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যের প্রমাণ। এখানে জোতদার শুধু মাত্র বিরোধিতার মোকাবিলাই করেনি, ইজারাদারের বিরুদ্ধে মামলাও জিতেছিল। উৎখাতের পর তাকে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে এবং মামলার খরচ চালাতে হয়েছিল।[২০]

বাংলার কৃষি নিয়ে জি.ডি. ইউলের ২৩ জুন, ১৮৬১-র প্রতিবেদন এবং শের উইল-এর মন্তব্য থেকে সমকালীন জোতদারদের বনিক-কৃষক ভূমিকা এবং প্রজাদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বাণিজ্যের সাথে যুক্ত একজন রায়ত যতটা শোষণ করে, একজন পেশাগত মহাজন ততটা নয়।[২১] সাধারণভাবে জোতদাররা ছয়ের দশকে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল। কারণ, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের খাজনা আইন দখলি স্বত্ব দিয়ে তাদের অবস্থানকে যথেষ্ট সুরক্ষিত করেছিল। তাদের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য আদালতে ঘন ঘন মামলা দায়ের করার কারণ এটা দিয়ে বোঝা যায়। ঔপনিবেশিক শাসনের চাহিদা অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে কৃষি উৎপাদনে ও বিপননে গ্রামীণ পুঁজিপতিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিশেষ স্বীকৃতি ছিল খাজনা আইন।[২২]

সাতের দশকে গ্রামীণ স্তর বিন্যাসে জোতদারদের অবস্থান মূল্যায়ন করার উপযুক্ত তথ্য আমাদের আছে। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে হান্টার *স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ দিনাজপুর*-এ জমিদারদের ক্ষমতার ক্রমবৃদ্ধি এবং জোতদার অথবা মণ্ডলদের আপেক্ষিক ক্ষমতা হ্রাসের ছবি এঁকেছেন। হান্টার-এর মতে, এটা সম্ভব হয়েছিল কেন্দ্রীভূত জমিদারি ব্যবস্থা এবং আদালতে জমিদারদের প্রবেশাধিকারের জন্য। এমন কি কৃষকরা ঘন ঘন চাষ ছেড়ে গেলেও, এই অবস্থা চলেছিল।[২৩] স্বল্প জনবসতির প্রত্যন্ত অঞ্চলে, জোতদাররা তাদের পুরনো ক্ষমতা ধরে রেখেছিল। আর্থনীতিকভাবে তারা আগের মতই বর্ধিষ্ণু ছিল। ১৮৯৩ থেকে কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্-এর অধীনে শ্রীনাথ সান্ডালের জমিদারিতে ধনী কৃষকদের অধীনে ১০ থেকে ২০ শতাংশের বেশি জমি ছিল। সাধারণভাবে তারা সম্পন্ন ছিল। অনেকে বড় জমি থেকে কিছু ইজারা দিত। এদের অনেকেই ছিল যথেষ্ট ধনী, হাতি পুষত এবং অধিকাংশই জোরদার মহাজনী ব্যবসা চালাত।[২৪]

গ্রামীণ অর্থনীতিতে জোতদারদের ক্ষমতা ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে প্রজা ভাগচাষী এবং অন্য অধমর্ন কৃষকদের সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কের প্রেক্ষিতে দেখা দরকার। এই বিষয়ে প্রধান উপাদান হল লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নর টেম্প্‌লের ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের গ্রামীণ ঋণ সংক্রান্ত আধা-সরকারি অনুসন্ধান। সেখানে ই. লোইস-এর উত্তর থেকে ধনী কৃষকদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। দিনাজপুরে সাতের দশকে কৃষকদের প্রতারিত করার জন্য কোনও পেশাদার মহাজন ছিল না, অবস্থাপন্ন গ্রামবাসীরা ঋণ দিত। 'এরা সাধারণত দরকষাকষি

করত না, এবং প্রভাব খাটিয়ে তাদের প্রতিবেশীদের অনুগৃহীত রেখেই সন্তুষ্ট ছিল।' রপ্তানি বাণিজ্য থেকে বর্দ্ধিত লাভ তাদের সমৃদ্ধ করেছিল। জমিদাররা কবুলবেশি বা ইচ্ছাকৃত কর বাড়িয়ে এই লাভের একাংশ হস্তগত করতে চাইত। লোইস আরও জানিয়েছেন:

> জেলায় সর্বত্র সম্মানীয় গ্রামবাসী, সম্পন্ন মানুষ ছিল, যারা ধুতি পরে বাইরে যেতে এবং নিজেদের কৃষিকাজ পরিদর্শন করতে তাচ্ছিল্য বোধ করত না। দুর্দিনে এইসব মানুষদের শক্তির ভিত্তি হিসেবে দেখা হত। তারা ছিল অসম্ভব প্রভাবশালী। প্রতিবেশীদের প্রয়োজনে অর্থ বীজ শস্য ইত্যাদি ঋণ দিয়ে তারা এই প্রভাব অর্জন করেছিল।

শেষ দুর্ভিক্ষের সময় তারা সাড়ে নয় লক্ষেরও বেশি টাকা অগ্রিম দিয়েছিল, যা অধমর্ণরা ফসল তোলার পর শোধ করেছিল।[২৫] উপরের এই বিবরণ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, জোতদাররা ছিল কৃষি জমি এবং বাজারের মধ্যে সংযোগকারী। সে ছিল গ্রামীণ উদ্যোগী। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে খাজনা আইন পাশ হওয়ার পর থেকে সরকারের জমিদার বিরোধিতা ও জোতদারদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের চিত্রটি এখানে আঁকা হয়েছে।

সরকার গ্রামীণ উদ্যোগীদের সন্ধানে অবশেষে ধনী কৃষকদের খুঁজে পেয়েছিল, এবং তাদের দখলিস্বত্ব দিয়েছিল, আইনের[২৬] মাধ্যমে তাদের মূলধন আত্মসাৎ করা থেকে জমিদারদের নিবৃত্ত করেছিল এবং গ্রান্ট থেকে ক্যাম্পবেল পর্যন্ত এদের প্রতি সরকারি মদত অব্যাহত ছিল। সুতরাং দুর্ভিক্ষের সময় দাদন দিয়ে উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য লোইস-এর প্রতিবেদনে তাদের অভিনন্দন জানানটা বিস্ময়কর নয়। কিন্তু অনেক আগে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে বুকানন হ্যামিল্টন দেখিয়েছিলেন, ধনী কৃষকদের অধীন ভাগচাষী ও ঋণ গ্রহণকারীরা ভূমিদাসদের থেকেও খারাপ অবস্থায় ছিল। ১৮৭১-৭২-এর দুর্ভিক্ষে এই জেলার পর্যাপ্ত সরবরাহ এবং রপ্তানি সাতের দশকের প্রবণতাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করে।

দিনাজপুরের কালেক্টর ই.ডি. ওয়েস্টম্যাক্ট একই সময়ের কথা বলতে গিয়ে পরিষ্কার লিখেছেন যে, কার্ষা (সাধারণ কৃষক), আধিয়ার (ভাগচাষী) এবং চুকানিদার (প্রজা)রা জোতদারকে জমিদারের থেকে তিন গুণ বেশি খাজনা দিত। তারা ছিল জমির আসল কৃষক। ওয়েস্টম্যাকট্ লিখেছেন:

> জোতদার হয় অবাধে অথবা কিছু আধিয়ারি শর্ত সাপেক্ষে কৃষি বীজ সরবরাহ, শস্য, ভরণ-পোষণ এবং কখন কখন গবাদি পশু ও লাঙ্গল-এর জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন দিত। খাজনা সুদের সঙ্গে মিলেমিশে যেত এবং জোতদাররা যা পেত তা পাওয়ার অধিকার জমিদারের ছিল না।

জোতদার বাঁধ, রাস্তা, হাট, মন্দির ইত্যাদি নির্মান করত। পুঁজিপতি ভূস্বামী হিসাবে বর্গাদারের থেকে তার ভূমিকা ছিল অন্য ধরণের। এক দিকে বংশানুক্রমিক জোতদার এবং আর এক দিকে সাধারণ জোতদার বা স্বত্বভোগী কৃষক-এর মধ্যে আরও অন্যান্য কৃষকও ছিল। খাজনা বৃদ্ধি করা হলে, সাধারণ কৃষকরা জমি থেকে উৎখাত হত এবং তাদের জমি জোতদারের নিজস্ব চাষের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত।

(বড় কৃষক অথবা জোতদাররা ছিল আদি দখলকারীদের বংশধর, যারা নির্ভরশীল আত্মীয়গোষ্ঠীদের নিয়ে বসতি গড়েছিল এবং জমিদারের পতিত জমিকে কৃষি জমিতে রূপান্তরিত করেছিল।) ওয়েস্টম্যাকট্ জমিদারদের জন্য এই শ্রেণীকে ছোট করে দেখার পক্ষপাতী ছিলেন না। অনেক পতিত জমি উদ্ধার বাকি ছিল, যা মূলধনহীন সাধারণ কৃষকদের প্রয়োজন ছিল না। তাদের ক্ষেত্রে সব রকম বিনিয়োগই ছিল অনিশ্চিত। সুতরাং অর্থনীতিতে জোতদারদের ভূমিকার জন্য তাদের লাভকে উপেক্ষা করতে হবে। জোতদাররা কৃষি উৎপাদনে দায়বদ্ধ ছিল, যা জমিদাররা ছিল না।) উপসংহারে ওয়েস্টম্যাকট্ সরকারি অভিমত পুনরাবৃত্তি করেছেন 'আমি বিশ্বাস করি যে, জোতদারের অবস্থানকে হীন প্রতিপন্ন করলে জমিদার ও কৃষক উভয়েই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।'[২৭]

আটের দশকে গ্রামীণ ঋণের নিয়ামকদের অধীনে বর্গাদার ও অন্য প্রজাদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। সরকারের সচিব পি নোলান ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বলেছে, দিনাজপুরের শ্রেণী বিন্যাসে নিচের দিকে যাদের অবস্থান, তারা প্রায়শই ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ত এবং অনেক ক্ষেত্রেই সারা জীবনের জন্য ঋণদাতার ভৃত্যে পরিনত হত। এই দাসত্ব ছিল অনেক সময়ই বংশানুক্রমিক, পুত্র নিজের থেকেই পিতার দায় বহন করত। বাংলার নিম্নবর্গের অবস্থা অনুসন্ধানের অংশ হিসাবে মালদার জমিদারির একটি গ্রামের কৃষি কাঠামোর অবস্থা বর্ণনা করেছে সংশ্লিষ্ট ভূবাসন আধিকারিক। শিয়াল লশ গ্রামে ৬২ জন অধিবাসী; তার মধ্যে ৩৫ জন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ, ১৯ জন মহিলা ও ৯ জন শিশু। পুরুষদের মধ্যে ৪ জন খুদকস্ত রায়ত, ৯ জন ছোট প্রজা এবং অন্যরা কৃষি মজুর। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'খুদকস্ত রায়তদের পর্যাপ্ত কৃষিজমি ছিল এবং ভূমির আদি দখলকারী ও ভালো জমির অধিকারী বলে স্বচ্ছল অবস্থায় ছিল....।' অন্যদিকে কৃষি মজুররা কিছুটা টাকায় কিছুটা ফসলের মাধ্যমে খাজনা দিত এবং মহাজনের (বেশির ভাগই জোতদার) কাছে ঋণী ছিল। মহাজনরা চড়া সুদে টাকা ঋণ দিত এবং সাধারণতঃ ফসল ওঠার পর সুদসহ টাকায় এবং শস্যে ধার উশুল করে নিত। এইভাবে ঋণগ্রহীতাকে আবার আগের দুর্দশা এবং ঋণের জালে ফিরিয়ে আনত।[২৮]

পুরো উনিশ শতক জুড়ে এই জঙ্গলাকীর্ণ ম্যালেরিয়া আক্রান্ত এবং বিরল জন সংখ্যার জেলায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে আদি দখলকারীদের বংশধর, সঙ্গিত সম্পন্ন জোতদাররা তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ধরে রেখেছিল। শস্য বাণিজ্য এবং টাকা ঋণ দেওয়ার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করে নিজেদের অবস্থাকে আরো সংহত করেছিল। নিজেদের জমি থেকে তারা জমিদারদের তুলনায় তিনগুণ বেশি লাভ করত। জমিদাররা পতিত জমি উদ্ধার করে এবং জোতদারদের সাহায্যে কৃষি জমি বৃদ্ধি করে তাদের ক্ষতিপূরণ করত। এর ফলে মোট খাজনা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

(বিশ শতকের গোড়াতেও জোতদারদের অবস্থান পরিবর্তিত হয়নি, যেহেতু দিনাজপুরের জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বাড়েনি, কিন্তু বঙ্গদেশে জনসংখ্যা ১৮৭২ থেকে ১৯০০-র মধ্যে ৫০ শতাংশ বেড়েছিল।) প্রতি বর্গ মাইলে জনসংখ্যা হয়েছিল ৪৪৫ জন। উনিশ শতকের

নয়ের দশকে সাঁওতালদের ব্যাপকহারে অভিবাসন হয়েছিল এবং যেখানে জমি দখলের প্রয়োজন ছিল, সেখানে জনস্ফীতি হয়েছিল। (নতুন জোতদাররা (বেশির ভাগই উত্তরবঙ্গের স্থানীয় গ্রামীণ অধিবাসী রাজবংশী) তাদের আধিয়ার অথবা ভাগচাষী হিসাবে নিজেদের অধীনে নিয়োগ করত।) হ্যামিলটনের সময় থেকে পুরনো ধনী ইজারাদাররা ছিল মুসলমান। তাদের মধ্যে খুব কমই ছিল জমির মালিক। এই জেলায় তারাই ছিল জোতদার শ্রেণী।) অনেক সময় তাদের অধীনে ৩০০-৪০০ একর জমি ছিল এবং তারা উন্নতিমূলক কাজও করত। জমিতে চিরস্থায়ী অধিকার সহ তারাই ছিল স্থায়ী কৃষক। (সেটলমেন্ট রেকর্ড এর লেখক এফ ও বেল লিখেছেন:)

> এই জেলায় মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও আর্থনীতিক উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায় ইউনিয়ন বোর্ড-এ তাদের আধিপত্যে। জনসংখ্যার তুলনায় তাদের প্রতিনিধিত্ব সব সময় বেশি রয়ে গিয়েছে।[২৯]

মুসলমানরা সবত্রই আর্থনীতিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত সম্প্রদায় ছিল না। একথা প্রমাণের জন্য উত্তরপ্রদেশের দিকে দৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয় না। দিনাজপুরের মত অন্য জেলাতেও জোতদার শ্রেণীকে নিয়ে গবেষণা করলে ধনী মুসলমান কৃষকের অস্তিত্বের আরও প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। ১৮৬০-এর ইণ্ডিগো কমিশন-এ নীলচাষের জেলা নদীয়া, যশোর ও মুর্শিদাবাদ-এ অনেক এরকম নাম পাওয়া যাবে।

(বেল নিচে উল্লেখ করা লেখায় দিনাজপুরের গ্রামীণ জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন:)

> দিনাজপুরের গ্রামীণ জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, বিভিন্ন গ্রাম্য পরিবারগুলির সামাজিক অবস্থান ও জীবন ধারণের মধ্যে অসাম্য। প্রায় প্রতিটি গ্রামেই কয়েকটি বড় সঙ্গতি সম্পন্ন কৃষক পরিবার ছিল। তাদের অধীনে ছিল বহু একর জমি। তারা ছিল গ্রামের নেতা। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানে জোতদার শ্রেণীই গ্রামাঞ্চলে সামাজিক ভাবে উন্নত ছিল। জোতদার পরিবারগুলি নিজেদের অধীনে হাজার একরের বেশি জমি রাখত। বেশির ভাগই জোত অথবা রায়তি অধিকার নিয়ে ছিল, কেউ কেউ জমিদারিতে স্বত্বাধিকার অর্জন করেছিল। কেউ খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে জমিদারের কাছ থেকে একটা পুরো গ্রামের পত্তনি ইজারা নিয়ে ছিল। বেশিরভাগ ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্টরাই ছিল জোতদার শ্রেণীভুক্ত, যাদের ৩০ থেকে ৩০০ একর জমি ছিল। যে সব পরিবার উন্নতি করেছিল, যাদের হাজার একর জমি ছিল এবং যারা জমির মালিক হয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিল গোবিন্দপুরের চৌধুরীরা, বংশীহারির মোল্লাহ'র পরিবার, হেমতাবাদের কাছে ধোহারার রমজান আলি তালুকদার এবং সর্বোপরি পোর্সার শাহ চৌধুরীরা।[৩০]

(অনুপস্থিত জমিদারদের এই জেলায়, এই সব জোতদাররাই ছিল গ্রামীণ অভিজাত শ্রেণী।) অভিজাত্যের চিহ্ন হিসাবে তারা হাতি পুষত। তাদের পুত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে আইনজীবী হত। তাদের নিজেদের পাকাবাড়ি ছিল এবং অসংখ্য গোলায় ধান মজুত থাকত। গবাদি পশুর ছাউনি আর গৃহভৃত্যদের জন্য পৃথক আবাস ছিল। পোর্সার শাহ চৌধুরীদের

দোতলা বাড়ি ছিল এবং ৬০ হাজার মন ধান গোলায় মজুত থাকত। এই সব জোতদাররা কৃষি মজুর অথবা ভাগচাষীদের সাহায্যে বড় আকারে জমি চাষ করত। তারা গ্রামাঞ্চলে ঋণ দিত আর জেলার অধিকাংশ রপ্তানিযোগ্য শস্য বিপণন করত। এই ধানুয়া বা ধানি জমিদারির অনেকগুলিই ৬ মন থেকে ৬ লক্ষ মন পর্যন্ত ধান মজুত করত। তারা খুব কমই নগদ খাজনার জন্য জমি ইজারা দিত। কোনও প্রজা তার জমি ছেড়ে দিলে খুশি হত। এই জেলায় ছোট জোতদাররাও ছিল, যাদের ১০০ বা ততোধিক একর জমি, ২/৩ টি মহিষ ও একটি গরুর গাড়ি ছিল। তাদের পুত্ররা ভালোভাবে ধানের ব্যবসা শিখেছিল। এদের তলায় যারা ছিল তারা কোনও রকমে ভাগচাষ করে উপার্জন করত। সব শেষে ছিল এক বিশাল সংখ্যক আধিয়ার।[৩১]

হ্যামিলটনের সময় থেকে দিনাজপুরের আধি ব্যবস্থা ছিল প্রাচীন এবং বহুল প্রচলিত। আধিয়ারদের আর্থনীতিক অবস্থা কৃষি মজুরদের থেকে সামান্য ভাল ছিল। ১৯৩৫-এ কৃষির মজুত-তালিকা থেকে বোঝা যায় যে, আধিয়ারদের অধিকাংশের লাঙল ছিল, অনেকের গরু মহিষ ও শস্য বীজ ছিল। সবারই অন্তত এক থেকে দশ একর পর্যন্ত জমি নিয়ে বসতবাড়ি ছিল। এদের অনেকেরই ছিল আবাসিক কৃষক। অন্যরা প্রতি মরশুমেই তাদের ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য এক জমি থেকে অন্য জমিতে যেত। খুব অল্প সংখ্যক আধিয়ারকে দীর্ঘদিন তাদের আধি অধিকার করে থাকতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু এটা সব সময় সত্যি নয়, কারণ, জোতদাররা আধিয়ারদের দীর্ঘ দিনের মধ্যস্বত্ব গোপন রাখত, যাতে তাদের মধ্যস্বত্ব সরকারি স্বীকৃতি না পেতে পারে। ঋণ বন্দোবস্ত বোর্ড-এর ঋণ নথি ভিত্তিক এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, ঋণ গ্রহণকারী ১৫৬-টি পরিবারের মধ্যে আধিয়াররাই ছিল সংখ্যাধিক। ১৫৬-টি পরিবার ৯৯ জন পাওনাদারের কাছে ঋণবদ্ধ ছিল এবং ঋণদাতাদের মধ্যে ৩ জন ছাড়া সবাই ছিল জোতদার। ফসল কাটার আগে অসুবিধার সময় দিন যাপনের জন্য বিশাল শস্য ঋণ ছিল গ্রামীন ঋণের সাধারণ প্রকৃতি। সুদের হার ছিল আসলের উপর ৫০ শতাংশ। যতটা শস্য ঋণ দেওয়া হত, তার 'দেড়হি' অর্থাৎ ১১/২গুণ ফেরত দিয়ে ঋণ শোধ হত। ঋণ আদায় শক্ত হাতে হত না এবং প্রায়শই তা বছর বছর গড়াত। এই ঋণ জমতে থাকত এবং আধিয়াররা ভূমিদাসে পরিণত হত। জোতদার ভিন্ন গ্রামীন মহাজন বা বানিয়া প্রায় ছিলই না। বেল মন্তব্য করেছেন, "যদি কোনও ধরণের শোষণ চলত, তা হত কৃষকের দ্বারাই।" বন্ধক থেকে মুক্তির বিষয়ে অনুসন্ধানে জানা যায় যে, জোতদাররাই ছিল একমাত্র লাভবান। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় থেকে উৎপাদন পদ্ধতি ছিল এক ধরণের। বেল লক্ষ্য করেছেন যে, "গ্রামীণ সমাজে জোতদার এবং আধিয়ার সংগঠনে কোন পরিবর্তন হয় নি।" যে সব জোতদার নিজের জমি (সাধারণত ৩০ একরের বেশি) পরিবারের শ্রম দিয়ে চাষ করাতে পারত না, আধিতে দিত। তাদের সব জমিতে কৃষির সব কাজ তদারকির মত সময় এবং কর্মচারী ছিল না। কিছু বড় মুসলমান এবং রাজবংশী জোতদার প্রায় একশ' বিঘা জমি নিজেদের লাঙ্গল এবং ভাড়াটে মজুরদের দিয়ে চাষ করাত। একজন মাহিষ্য জোতদারের

১৩৩-টি লাঙল ছিল। কিন্তু অনুর্বর মাটি এবং অনিশ্চিত ফসলের কারণে মনে করা হত যে, ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগের তুলনায় অর্দ্ধেক ফসল পাওয়াই ভাল। জোতদারই আধিয়ার নিয়োগ করত, এই ব্যবস্থায় তাদের বেশি ভাল হত বলে। নিস্ফলা সময়ে শস্য ঋণ এবং অন্যান্য উপাদানের জন্য তারা ইচ্ছামত বাজারি শস্য চাষ করতে বাধ্য করত এবং টাকা ও শস্য বাবদ দেয় ঋণে ৫০ শতাংশ সুদে ফেরত পেত। তারা জমি, বীজ ও গবাদি পশু ইত্যাদি সম্পদ প্রয়োজন মত কাজে লাগাত এবং রপ্তানির জন্য যথেষ্ট ফসল পেত। ঋণ দেওয়ার ক্ষমতার দরুণ তারা অল্প মজুরিতে নিয়মিত মজুর নিয়োগ করতে পারত। যে কোনও পদ্ধতিতে মূলধন যোগানের কারণে, ৫০ শতাংশ হারের সুদে জোতদারের ভাগ শেষ পর্যন্ত দুই-তৃতীয়াংশ' কিংবা তার বেশি হত। যে জেলায় মজুরের যোগান অনিশ্চিত, সেখানে এই ব্যবস্থায়ই সুবিধাজনক।

জোতদার ছাড়া অনাবাসী জমির মালিক, যারা কৃষক নয় (ব্রাহ্মণ) ও যাদের লাখে-রাজ ও অন্য জমি ছিল, তারাও তাদের জমি আধিতে চাষ করাত। একটা প্রচলিত কথা ছিল 'আধি ভদ্রলোকদের পক্ষে বেশি উপযুক্ত।'[৩২]

বেল লক্ষ্য করেছেন, প্রজাস্বত্ব অধিকারের কাঠামোতে ভবিষ্যতে যান্ত্রিকীকরণ এবং যৌথ খামারের সম্ভাবনার কোনও সুযোগই ছিল না।[৩৩]

১৯৩৯ সালের ভ্রমণ দিনপঞ্জীতে বেল বিশ শতকের কয়েকটি বিশিষ্ট জোতদারের চিত্র এঁকেছেন। বিশেষ করে একজন বৃদ্ধ মুসলমান জোতদারের কথা বলা হয়েছে, যে গ্রামাঞ্চলের একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি, তার ১০০০ বিঘা জমি ছিল এবং সে মহকুমা শহরে কর্মরত একজন আইনজীবী। সে তার আমানত মহাজনি কারবারে বিনিয়োগ করেছিল। প্রথাগত জোতদার-মহাজন পদ্ধতিতে উন্নতি করে, সে অন্যদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ৭৫,০০০ টাকা মূলধন নিয়ে এক ব্যাঙ্ক গড়ে তোলে। এই টাকা অংশত আখ পেশাই যন্ত্র কিনতে ব্যয়িত হয়। সেই যন্ত্র আবার প্রতিবেশীদের কাছে ভাড়া দিয়ে লাভ করা হয়। এই তথ্য, ঐ সময়ের গ্রামাঞ্চলে কিছু ব্যক্তির হাতে মূলধন কেন্দ্রীভূত হওয়ার এক উদাহরণ। কিন্তু কৃষিতে কোন সাধারণ উন্নতি হয় নি। এই জোতদারকে খান সাহেব করা হয়েছিল। বেল বর্ণিত দ্বিতীয় মুসলমান জোতদার ছিল ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি। সে নিজে স্নাতক এবং একজন বড় জোতদারের পুত্র। সে মহকুমা শহরে আইনজীবী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল। ৪০-টি ঋণ বন্দোবস্ত মামলায় সে ঋণদানকারী হিসাবে নিজেকে নথিভুক্ত করেছিল। সে টাকা ঋণ দিত এবং ধান অগ্রিম দিত যা ফসল কাটার সময় টাকায় শোধ করতে হত।[৩৪]

বেল তাঁর সেটেলমেন্ট রিপোর্টে লিখেছেন, জমিতে স্থায়ী স্বার্থ নেই এমন বিশাল সংখ্যক মানুষের গ্রামাঞ্চলে প্রয়োজন নেই। যদিও তখন পর্যন্ত কোন বিদ্রোহ হয়নি। প্রতিবেশী জেলা পাবনা ও জলপাইগুড়িতে ধূমায়িত অসন্তোষের কথা বলা হয়েছে। দিনাজপুর জেলায় ১৯৪০ সালে আটওয়ারি এবং ঠাকুরগাঁও-এ জোতদার ও আধিয়ারদের মধ্যে গোলযোগ শুরু হয়।[৩৫]

১৯৪৬-৪৭ সালে ঠাকুরগাঁও জোতদারদের বিরুদ্ধে আধিয়ারদের বিদ্রোহের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল যা বাংলায় তে-ভাগা আন্দোলন বলে বিখ্যাত। এই আন্দোলনের মূল দাবি ছিল, আধিয়ার অথবা বর্গাদাররা ফসল কাটার পর দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ পাবে। আগের মত অর্দ্ধাংশ নয়। যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ দিনাজপুর এবং অন্য জায়গায় খাদ্যাভাবে মৃতপ্রায় আধিয়ারদের জীবন দুর্দশাগ্রস্ত করে তুলেছিল। তাদের কোন প্রজাস্বত্ব অধিকার ছিল না। কৃষির যাবতীয় ব্যয় তাদের উপর চাপান হয়েছিল। উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা মালিকানা থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন ছিল। কৃষির ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ায় আধিয়াররা অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছিল না। কৃষি ছিল আদিম স্তরে। ফসল না হলে উৎপাদনের ব্যয় ফিরে পাবার কোনও উপায় ছিল না। এই অসহনীয় অবস্থাই প্রত্যক্ষভাবে বিদ্রোহের কারণ। এটিকে কম্যুনিষ্টদের প্রচারের ফল হিসেবে দাবি করা অতি সরলীকরণ হয়ে যায়। যদিও তারাই আন্দোলনের জন্য গ্রামীণ কর্মী তৈরি করেছিল।[৩৬]

এই আন্দোলনের তাৎক্ষণিক ফলাফল হল ১৯৪৭ সালের ২২ জানুয়ারির 'বেঙ্গল বর্গাদারস্ টেম্পোরারি রেগুলেশন বিল,' যার সাহায্যে উভয় পক্ষের বিনিয়োগের ভিত্তিতে ভাগের বিধান দেওয়া হয়। জমি অবাঞ্ছিত ব্যবহারের কারণে উৎখাতের অধিকারও জোতদারকে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৫০ সালের বর্গাদার আইনে এই ব্যবস্থাকে বিধিবদ্ধ করা হয়। ভাগচাষীকে ক্রীতদাস করে রাখার জন্য জোতদারদের কাছে এই উৎখাতের অধিকারই ছিল জোতদারদের প্রধান হাতিয়ার।

সূত্র নির্দেশ

১. রত্নলেখা রায়, 'চেঞ্জ ইন বেঙ্গল অ্যাগ্রারিয়ান সোসাইটি: এ স্টাডি অফ সিলেক্ট ডিস্ট্রিক্টস্ (১৭৬০-১৮৫০)', অপ্রকাশিত পি এইচ ডি থিসিস, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪।

২. এন কে সিংহ, *দা ইকনমিক হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল*, ২য় খণ্ড (কলকাতা) পৃ. ১৯৮-১৯৯।

৩. আর. রায়, 'চেঞ্জ ইন বেঙ্গল অ্যাগ্রারিয়ান সোসাইটি', শেষ অধ্যায়।

৪. ডব্লু কে ফর্মিঙ্গার, *ইনট্রোডাকশন টু দা ফিফথ রিপোর্ট অফ দা সিলেক্ট কমিটি টু দা হাউস অফ কমনস্*, ১৮১২।

৫. এন কে সিংহ, *দা ইকনমিক হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৯।

৬. এইচ টি কোলব্রুক, *রিমার্কস্ অন দা হাসব্যান্ড্রি অ্যাণ্ড ইন্টারনাল কমার্স অফ বেঙ্গল* (কলকাতা) ১৮০৬ [মূল ১৭৯৪], পৃ. ৬৪।

৭. ঐ, পৃ. ৫৭।

৮. ঐ, পৃ. ৮৫।

৯. ঐ, পৃ. ৯৬।

১০. ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিলটন, *এ জিওগ্রাফিক্যাল, স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাণ্ড হিস্টরিক্যাল ডেস্ক্রিপশন অফ দা ডিস্ট্রিক্ট অফ দিনাজপুর ইন দা প্রভিন্স অব সুবাহ্ অফ বেঙ্গল* (কলকাতা) ১৮৩৩ [মূল ১৮০৭-০৮] পৃ. ২৩৬-২৩৭।

১১. ঐ, পৃ. ২৩৫।

১২. ঐ।

১৩. ঐ, পৃ. ২৪৭।

১৪. ঐ, পৃ. ৩০০।

১৫. ঐ, পৃ. ৩১৭।

১৬. ঐ, পৃ. ২৪৭।

১৭. মেজর জে এল শেরউইল, *এ জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাণ্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিপোর্ট অফ দা দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট* (কলকাতা) ১৮৬৫, পৃ. ৭-১০।

১৮. ঐ পৃ. ১৬-৩৮

১৯. *ডিসিশন্স অফ জিলা কোর্টস্* (কলকাতা) ১৮৫৩, পৃ. ৪৫-৪৬।

২০. ঐ পৃ ৮৪।

২১. এম এস এস ইউর ফাইল ৭৮/৭৯; স্যার চার্লস উড কালেকশন: গ্রান্ট উড: ১৭ জুলাই, ১৮৬১-র চিঠির সঙ্গে সংযুক্ত।

২২. সি. পালিত, *টেনশনস্ ইন বেঙ্গল রুরাল সোসাইটি*(কলকাতা) ১৯৭৫, পৃষ্ঠা ১৭৬-১৮৬।

২৩. ডব্লু ডব্লু হান্টার, *স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউন্টস্ অফ বেঙ্গল*, সপ্তম খণ্ড (লণ্ডন) ১৮৭৬, পৃ. ৩৮৮।

২৪. *রিপোর্ট অন ওয়ার্ডস অ্যাণ্ড অ্যাটাচড্ এস্টেট্স ইন দা লোয়ার প্রভিন্সেস*, ১৮৭৪-৭৫(কলকাতা) ১৮৭৬, পৃ. ২৫।

২৫. এম এস এস ইউর ফাইল ৮৬/১৬১: টেম্পল কালেকশন চতুর্থ পরিচ্ছেদ, ই.ই লেইস, ১ অক্টোবর ১৮৭৫, রেফারেন্স দিনাজপুর।

২৬. সি. পালিত, *টেনশনস*, পৃ. ১৭৬-৮৬, বিশেষত।

২৭. এম এস এস ইউ-র ফাইল ৮৬/১৬৫: টেম্পল কালেকশন, সাবস্ট্যান্টিভ ল ফর ডিটারমিনেশন অফ রেন্ট, ১৮৭৬ রিপ্লাই অফ ওয়েস্টম্যাকট্।

২৮. *ডাফরিন এনকোয়ারি ইন দা কণ্ডিশন অফ দা লোয়ার ক্লাসেস ইন বেঙ্গল*, ১৮৮৮, নং ৮৭, টি আর নোলান-এর তরফে এবং ৮৪ জি মালদার এসেট-এর তরফে।

২৯. এফ ও বেল, *ফাইনাল রিপোর্ট অন দা সার্ভে অ্যাণ্ড সেটলমেন্ট অফ দা ডিস্ট্রিক্ট অফ দিনাজপুর*, ১৯৩৪-৪০, (কলকাতা) ১৯৪১।

৩০. ঐ, পৃ. ১৬।

৩১. ঐ, পৃ. ১৬-১৮।

৩২. ঐ, পৃ. ২০-২৫।

৩৩. ঐ, পৃ. ৪৭।

৩৪. এম এস এস ইউ-র ফাইল, ডি ৭৩৩: এফ ও বেল, দিনাজপুর, ট্যুর ডাইরি, ২৭ নভেম্বর, ১৯৩৯, পৃ ২-৪।

৩৫. এফ ও বেল, *দিনাজপুর সেটলমেন্ট রিপোর্ট*, পৃ-২২, (কলকাতা) ১৯৭২, পৃ. ১৩-১৫।

৩৬. সুনীল সেন, অ্যাগ্রারিয়ান স্ট্রাগল্ ইন বেঙ্গল (কলকাতা) ১৯৭২, পৃ. ১৩-১৫।

আই সি বি এস

বেঙ্গল ষ্টাডিজের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও সীমিত। ইদানিং গবেষণামূলক কাজে দেখা যাচ্ছে নানান সমস্যা। এর একটা মূল কারণ গবেষণার জন্য যে আর্থিক ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সাহায্যের প্রয়োজন তার বিশেষ অভাব। দক্ষিণ এশিয়ার বাইরে বেঙ্গল ষ্টাডিজের নানা দিক নিয়ে কাজ হচ্ছে অনেক কম। তুলনামূলকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার চেয়ে পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের উপর গবেষণামূলক কাজ হচ্ছে বেশী।

আরও একটা সমস্যা হচ্ছে এ বিষয়ে যারা কাজ করছেন তারা প্রয়োজনীয় তথ্য পান না। অনেক মূল্যবান কাজ বিদেশে প্রকাশিত হয়, বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় যা অনেকের কাছে অধিগম্য নয়। এছাড়া ইংরাজী ভাষাতেও যা প্রকাশিত হচ্ছে তা ব্যয়বহুল বলে গ্রন্থাগারগুলির পক্ষেও এসব সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন। বেঙ্গল ষ্টাডিজের বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখাপত্র এবং গ্রন্থাদির বাংলা অনুবাদ করা জরুরী। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এ সংক্রান্ত লেখাপত্র ও গ্রন্থাদির ইংরাজী ভাষায় অনুবাদও দরকার।

আই সি বি এস গবেষণামূলক কাজের ফল ব্যাপকভাবে ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় প্রচার করতে চেষ্টা চালাচ্ছে। এই প্রচেষ্টার অন্তর্গত ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি, কালচারাল স্টাডিজের বিভিন্ন দিক। ভবিষ্যতে আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী মৌলিক গবেষণা প্রকাশনার আশাও এই কেন্দ্র পোষণ করে।

International Centre for Bengal Studies
(ICBS Series)

Publications by the International Centre for Bengal Studies

1. Anisuzzaman, *Creativity, Reality and Identity* (Dhaka: International Centre for Bengal Studies, 1993), 133 pp.
   ISBN 984-30-0047-1
   Price: TK. 250

2. Burhanuddin Khan Jahangir, *The Quest of Zainul Abedin*
   Translated from Bengali by Meghna Guhathakurta
   (Dhaka: International Centre for Bengal Studies, 1993), 77 pp.
   ISBN 984-8127-01-1
   Price: TK. 170

3. বৃগিতে এরলার, সাহায্য না মারণাস্ত্র ? উন্নয়নমূলক সাহায্য বিষয়ক একটি রিপোর্ট
   [Brigitte Erler, *Aid or Weapon of Destruction ? A Report on Development Aid*
   Translated from German by Baren Bhattacharya and Ashim Chattopadhyay
   (Delhi: International Centre for Bengal Studies, 1994), 112 pp.
   ISBN 81-900471-0-8 (hardback), 81-900471-1-6 (paperback)
   Price: Rs. 50 (hardback), Rs. 40 (paperback)

4. Salahuddin Ahmed, *Bengali Nationalism and the Emergence of Bangladesh: an Introductory Outline*
   Translated from Bengali
   (Dhaka: International Centre for Bengal Studies, 1994)
   ISBN 984-8127-02-X
   Price: TK. 200

5. দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুখানন (১৭৯৮) : কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামে তাঁর ভ্রমণ, ভেলাম সেন্দেল সম্পাদিত।
   [*Francis Buchanan in Southeast Bengal (1798): His Journey to Comilla, Noakhali, Chittagong, Chittagong Hill Tracts,* ed. by Willem Van Schendel]
   Translated from English by Salahuddin Ayub
   (Dhaka: International Centre for Bengal Studies, 1994), 224 pp.
   ISBN 984-8127-03-8
   Price: TK. 175

6. Prabodhchandra Sen, *Bengal: A Historiographical Quest*
   Translated from Bengali by Ranjan Chakrabarty
   (Calcutta: International Centre for Bengal Studies, 1995), 123 pp.
   ISBN 81-7074-163-3
   Price: Rs. 120

7. ব্লেয়ার বি. ক্লিং, নীল বিদ্রোহ: বাংলায় নীল আন্দোলন, ১৮৫৯-১৮৬২
   [Blair B. Kling, *The Blue Mutiny: The Indigo Disturbances in Bengal, 1859-1862*]
   Translated from English by Farhad Khan and Zalfiqar Ali
   (Dhaka: International Centre for Bengal Studies, 1995), 190 pp.
   ISBN 984-8127-05-4
   Price: TK. 120

8. সুগত বসু, আন্দ্রে বেতেই ও বিনয় ভূষণ চৌধুরী, বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন-১
   [Sugata Bose, Andre Beteille and Binay Bhusan Chaudhuri, *Agrarian Social Structure of Bengal* - Part I]
   Translated from English by Shubhra Chakrabarti and Abhijit Dasgupta
   (Delhi: International Centre for Bengal Studies, 1995), 108 pp.
   ISBN 81-7074-169-6 (Vol.I); 81-7074-170-X (Set)
   Price: Rs.60

9. বিনয় ভূষণ চৌধুরী, রজত কান্ত রায়, রত্নলেখা রায়, চিত্তব্রত পালিত, বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন-২
   [Binay Bhusan Chaudhuri, Rajat Kanta Ray, Ratnalekha Ray, Chittabrata Palit, *Agrarian Social Structure of Bengal* - Part II]
   Translated from English by Shubhra Chakrabarti, Sambudha Chakrabarti, Ruma Chakrabarti
   (Delhi: International Centre for Bengal Studies, 1995)
   ISBN 81-7074-170-X (Set); 81-7074-171-8 (Vol.2)

10. Monique Selim, *The Experience of a Multinational Company in Bangladesh*
Translated from French by S.M.Imamul Huq
(Dhaka : International Centre for Bengal Studies, 1995), 168 pp.
ISBN 984-8127-04-8.
Price : TK.180

11. মিসবাহউদ্দিন খান, চট্টগ্রাম বন্দরের ইতিহাস (১৮৮৮-১৯০০)
[Misbahuddin Khan, *The History of the Port of Chittagong (1888-1900)*]
Translated from English by the author
(Dhaka : International Centre for Bengal Studies, 1995), 90 pp.
ISBN 984-8127-06-2
Price : TK. 100

12. Tarafdar, Technology and Innovation
Translated from Bengali (Dhaka : ICBS)

13. Independent Sultans
Translated from Bengali (Dhaka : ICBS)

14. জয়ন্তকুমার রায়, গণতন্ত্র এবং জাতীয়তার অগ্নিপরীক্ষা, বাংলাদেশ ১৯৪৭-৭১
Translated from English by Jibendranath Siddhanta and Sabiha Salek
ISBN 81-7023-503-0
Calcutta : International Centre for Bengal Studies, 1996
Price : Rs. 180

15. Dineshchandra Sen, Bengali Language and Literature, Volume I
Translated from Bengali By Jibendranath Siddhanta
ISBN 81-7023-504-9
Calcutta : International Centre for Bengal Studies, 1996

16. বিনয় ভূষণ চৌধুরী, ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার কৃষি ইতিহাস, প্রথম খণ্ড
Translated from English by Arun Bandopadhyay
ISBN 81-7023-505-7
Calcutta : International Centre for Bengal Studies, 1996

গ্রাম বাংলার কৃষি ব্যবস্থার বিশেষ কতগুলি সমস্যা আলোচনা করা হয়েছে এই বইটিতে, যেমন জোতদার এবং বর্গাদারদের সম্পর্ক, গ্রাম বাংলার অর্থনীতিতে জমিদারদের প্রভাব, উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে শ্রেণী সম্পর্কের যোগ ইত্যাদি। জোতদারী প্রথা এবং উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে নানান বিতর্ক এখানে পাওয়া যাবে। এই প্রবন্ধগুলি লিখেছেন বিনয় ভূষণ চৌধুরী, রজত কান্ত রায়, রত্নলেখা রায় ও চিত্তব্রত পালিত।

ISBN 81-7074-170-X